ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য

শিপ্রা লাহিড়ী

কবি ও কবিতা প্রকাশন
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৩ আগস্ট ১৯৬৩
১৫ শ্রাবণ ১৩৭০

মুদ্রক
সীতানাথ কুণ্ডু
জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৪ এ, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা ৬

প্রকাশক
মিহির ভট্টাচার্য
কবি ও কবিতা প্রকাশন
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

পরমপূজনীয়

ডাক্তার ভূপেশচন্দ্র লাহিড়ী

শ্রীচরণকমলেষু

নিবেদন

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ ঘটে তার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন ও তার পুনরভ্যুত্থান। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই পুনরভ্যুত্থানের কালে অন্যতম পথপ্রদর্শকরূপে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এখানেই ঘটেছে একটি দুরপনেয় ভ্রান্তি। তারই ফলে ভূদেব একজন রক্ষণশীল হিন্দুরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। শুধু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক হিসাবেই নয়, তিনি যে সে-যুগের জাতীয় জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে একজন অগ্রগণ্য নেতৃপুরুষ ছিলেন, এ সত্য আজ উপেক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সে-যুগে জাতির অন্যতম শিক্ষাগুরু। ভারতের, বিশেষ করে পূর্বভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তারই ফলে সম্ভব হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষাসমূহের ব্যাপক উন্নতি। সমাজ ও স্বদেশ-চেতনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক। সে যুগে ভারতের মুসলমান-সমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিই ছিল সর্বাপেক্ষা উদার। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর দান ও প্রভাব সামান্য নয়। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সমকালীন সমাজের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের মানুষ যে তাঁকে প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছেন এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের গ্রন্থে আমরা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত স্থান কোথায়—এ সত্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি। জাতীয় শিক্ষার প্রসার এবং প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর দান সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য নেই। তাই বর্তমান গ্রন্থে সে বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের যথার্থ স্থান নির্ণয় করা। আর সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত। তাই সাহিত্যের আলোচনায় সমাজের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই এসেছে। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি ভূদেবের সমাজ- ও সাহিত্যচিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, স্বদেশ, সমাজ, সমূহ প্রভৃতি গ্রন্থে, এবং কোনো কোনো স্মরণীয় গান ও কবিতায়, ভূদেবের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে অনতিবিস্তৃত আলোচনা

করা হয়েছে। ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে ভূদেব রক্ষণশীল ছিলেন না, ছিলেন মুক্তমনা যুক্তিবাদী মনীষী। তাঁর স্বদেশ-চিন্তায় এক অখণ্ড ও সম্মিলিত ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত ছিল। সর্বোপরি 'উনবিংশ পুরাণ' যে ভূদেবেরই কল্পনা এবং তাঁর লেখনীস্পর্শেই বাঙ্ময়, এই সত্যও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' বাংলা সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, পরবর্তী চিন্তা ও পরিকল্পনায় সুগভীর প্রভাবও বিস্তার করেছে, আর তারই ফলে বাংলা সাহিত্যজগতে ভূদেবের স্থান চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার সামান্য প্রয়াস এই গ্রন্থ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক' হিসাবে আমি এই গবেষণাকর্মে ব্রতী হই। আমার নির্দেশক ছিলেন প্রখ্যাতনামা কবি-সমালোচক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের তৎকালীন প্রধান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। তাঁর নিরন্তর সহায়তা এবং উৎসাহ আমার গবেষণাকর্মকে সহজতর করেছে। তাঁর সম্পাদিত 'ভূদেব-রচনাসম্ভারে'র ভূমিকা আমাকে পথ দেখিয়েছে। আমার গবেষণার অপর পরীক্ষকদ্বয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গ্রন্থকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. উপাধির যোগ্যরূপে বিবেচনা করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। তাঁদের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞচিত্তের প্রণাম নিবেদন করি।

আমার গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা রচনায় এবং রূপায়ণে আমি সর্বাধিক সহায়তা এবং প্রেরণা পেয়েছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অমূল্য উপদেশ, নিত্যসতর্ক নির্দেশনা এবং সস্নেহ দৃষ্টি না থাকলে আমার পক্ষে এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। একযুগেরও বেশি সময় ধরে তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হয়েছে আমার সারস্বত জীবন। আমার জীবনের যাত্রাপথে তিনিই হলেন আলোর দিশারী। এই গবেষণা-গ্রন্থের প্রকাশের সমগ্র দায়িত্বভারও তিনি একাকীই বহন করেছেন। তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

এই গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে যাঁর কথা আজ আমার বারেবারে মনে পড়ছে তিনি আমার সম্প্রতি-লোকান্তরিত, পরম পূজনীয় পিতৃদেব অমিয়লাল গোস্বামী। আমার গবেষণাকর্মটিকে গ্রন্থাকারে দেখবার সাধ তাঁর পূর্ণ হলো না, এজন্য আমার আক্ষেপের শেষ নেই। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার অশ্রুসিক্ত অন্তরের প্রণাম নিবেদন করি।

এই গবেষণাকর্মে নানাভাবে নানাজনের কাছে সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছি। তার মধ্যে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত অনন্ত গোস্বামী মহাশয়ের অনুপ্রেরণা ও আগ্রহের কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। আমার জীবনে তাঁব সস্নেহ-ভূমিকা এক পরম আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁর উদ্দেশে জানাই আমার প্রণাম।

আমার জীবনের এক চরম সংকটলগ্নে যিনি তাঁর সুবিপুল স্নেহচ্ছায়ায় আমাকে পরম আশ্রয় দান করে আমার জীবনকে সার্থকতাব আলোকতীর্থে উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছেন তিনি আমার পবম শ্রদ্ধেয শ্বশুর মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র লাহিড়ী। এই গ্রন্থ তাঁবই নামে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক এবং কর্মিবৃন্দেব কাছে। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ভূদেব-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের সন্ধানসূত্র দিয়েছেন উত্তবপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের শ্রীযুক্ত তরুণকুমার মিত্র মহাশয়। চুঁচুড়ার 'ভূদেবভবনে' রক্ষিত এডুকেশন গেজেটের সংখ্যাগুলি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ভূদেবের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত ভৃগুদেব মুখোপাধ্যায মহাশয়। তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

ইচ্ছা ছিল গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনা বিস্তৃততর করব। কিন্তু নানাকারণে বর্তমানে সে ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল। আমার রচনাতে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা যে বয়ে গেছে সে-বিষয়ে আমি সচেতন। তা সত্ত্বেও ভূদেবের পুনর্মূল্যায়নের এই প্রয়াস যদি বিদ্বজ্জনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তাহলেই নিজের সমস্ত শ্রমকে সার্থক বিবেচনা করব।

উইমেনস কলেজ
কলিকাতা

শিপ্রা লাহিড়ী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্র স্তা ব না

১

খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান যুগের স্থিতপ্রজ্ঞ পথপ্রদর্শক এবং শুচিশীলিত জীবনচর্যার আদর্শ পুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর তিরোধানের পরে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, "আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে দেখিয়াছি।"[১]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমুন্নত চারিত্রধর্ম, আদর্শনিষ্ঠ জীবনচর্যা, দূরদর্শী প্রজ্ঞা এবং যুক্তিবাদী ও কল্পনাভূয়িষ্ঠ সারস্বতসাধনা সমকালীন বাঙালী মনীষিবৃন্দের পরম শ্রদ্ধার বস্তু ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি-প্রতিনিধি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার গান'-এ ভূদেবকে কলকাতার দিক্‌পালগণের অন্যতম বলে বন্দনা করেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার গান' ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে 'নবজীবন' পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে রসিকমোল্লা ছদ্মনামে পুস্তিকাকারেও কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, "'হুতোম প্যাঁচার গান' সাধারণ রসের ভাষায় কলিকাতার পৃষ্ঠে কষাঘাত বটে, কিন্তু উহাতে মেকির তিরস্কার অপেক্ষা, খাঁটির পুরস্কারই অধিক আছে।"[২] হেমচন্দ্র এই ব্যঙ্গকবিতায় প্রথমে 'কলকাতায় কল্কাপরার দলে'র বর্ণনা করে দ্বিতীয়ভাগে গোটাকতক আসল দিক্‌পালকে আসরে আহ্বান করেছেন। বলাই বাহুল্য, এই দিক্‌পাল-সপ্তকের প্রথমে আছেন বিদ্যাসাগর। তারপর তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও দানবীর তারকনাথ প্রামাণিক। ভূদেব সম্পর্কে হেমচন্দ্র বলেছেন :

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর,
গালজোড়া ফ্যাস্‌সা গোঁপ—বুড়ো প্যাগম্বর।
চুঁচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি—আকারে পাঠান।

হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে !
ইংরিজি শিক্ষাব ফুল বাঙালি-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে !
তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা !
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে,
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে।
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা-তাল
সেকেলেব মাঝে এক সুন্দর প্রবাল !
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ,
দেখো হে পুতুলরাজা—বাঙালীর বাঘ ![৩]

এই ষোড়শপদী সরস স্তবকটি নানাকারণেই বিশেষ উল্লেখের দাবী করে। হাস্যপরিহাসেব ভঙ্গিতে লেখা হলেও কবির অন্তর্দৃষ্টিতে ভূদেব-চরিত্র ওতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কয়েকটি পংক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় :

১. হৃদয় ক্ষীরের খনি—আকারে পাঠান।
২. নিরেট বেউড বাঁশ—ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
৩. ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে !
৪. তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা !
৫. সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল !
৬. দেখো হে পুতুলরাজা—বাঙালীর বাঘ।

এই উক্তি-ষট্‌ক ভূদেব-চরিত্র বিশ্লেষণের মূলসূত্র হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তন্মধ্যে পঞ্চম উক্তিটি (সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল) হেমচন্দ্রের সমুচ্চ কবিকল্পনা-প্রসূত। সংরক্ষণশীল জীবনচর্যার উদ্গাতা বলে যাঁরা ভূদেব-প্রসঙ্গে নাসিকাকুঞ্চন করেন তাঁদের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য হেমচন্দ্রের এই প্রাজ্ঞোক্তিটি সুপ্রযুক্ত। ভূদেব-প্রশস্তির অন্তিম বাক্যে হেমচন্দ্র তাঁকে বলেছেন 'বাঙালীর বাঘ'। ভূদেব-চরিত্রের অকুতোভয় বিক্রমশালিতার প্রতীক

হিসাবে এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারটি শুধু অনবদ্যই নয়, বিস্মৃতপ্রায় এই পুরুষ-প্রবরের প্রতি সে-যুগের কবিপ্রতিনিধির বিস্ময়-বিমুগ্ধ অন্তিম শ্রদ্ধার্ঘ্যও বটে।

২

ভূদেবের সারস্বতসাধনাও সমকালীন সারস্বতবৃন্দের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করেছে। মধুসূদন তাঁর 'হেকটর-বধ' গ্রন্থখানি ভূদেবের নামে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গপত্রে তিনি বলেছেন, 'এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই, কেননা তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে।……যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।'

১৮৭১ সালে রচিত এই উৎসর্গপত্রে মধুসূদন বলেছেন 'তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে।' সতীর্থ বাল্যবন্ধুর এই সংযমসুন্দর উক্তি নিরুচ্ছ্বসিত। কিন্তু এই বৎসরই Calcutta Review পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র Bengali Literature প্রবন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষাতেই ভূদেবের কথা বলেছেন। তিনি ভূদেবকে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলা গদ্যরীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা দিয়ে বলেছেন "One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterized by the some-what pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutam—one of the best masters—we say, of Bengali style is Babu Bhubed Mukerji."[৪]

১৮৭১ সালে ভূদেবের সামান্য রচনাই প্রকাশিত হয়েছে। তার মাত্র তিন বৎসর আগে তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদনভার গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মন্তব্যের ভিত্তি করেছেন মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাসকে। ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল এই প্রসঙ্গে সেকথা মনে রাখা প্রয়োজন।

ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রথমে গ্রন্থাকারে নাম না দিয়েই প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—There is only one hand which could have produced the work; and the whole public is probably aware whose it is.[৫]

'পারিবারিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে বঙ্কিমের দুটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"The whole book is one grand hymn to the holiest of human affections, and is best sung by an invisible chorister".[৬]

'The highest poetry is also the highest practical wisdom—the poetry of Real Life".[৭]

ভূদেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে শ্রদ্ধান্বিত উক্তি উচ্চারিত হয়েছে 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রসঙ্গে। জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিট্যুশানের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডব্লিউ হেস্টির সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে স্টেটসম্যান পত্রে (১৮৮২) বঙ্কিমের যে বিতর্ক হয় তার তৃতীয় কিস্তিতে (অক্টোবর ২৮, ১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্র বলেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় দর্শন পুরাণের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞান নগণ্যমাত্র। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন—"The legends of the Hindu faith, which are to the European inexpressively silly, he has hitherto honoured with his laughter; to the loving study of the auther of Pushpanjali (also a Bengali writer, Baboo Bhudeb Mukerji) they have yielded results not surpassed in loftiness and splendour by anything in European literature".[৮]

হিন্দু বিশ্বাসের উপাখ্যান নিয়ে ভূদেবের মননশীলতা পুষ্পাঞ্জলিতে যে মহনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে ভাবের সমুন্নতি ও ভাস্বরতায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের কোনো কিছুই তাকে অতিক্রম করতে পারেনি,—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ উক্তি ভূদেবের সৃজনী-প্রতিভার স্বীকৃতি।

'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবকে আমাদের সামাজিক জীবন নিয়ে গ্রন্থরচনার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। এই সম্পর্কে, উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। মনীষী ভূদেবের সর্বাত্মক মনর্নশীলতার শ্রেষ্ঠদান তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' তাঁর জীবনের সর্বশেষ কীর্তি। 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে ভূদেবের সতীর্থ রাজনারায়ণ বলেছিলেন, "ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্যপাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি এবং সম্মিলন ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।"[৯]

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে, এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সার চার্লস ইলিয়ট এই অসামান্য গ্রন্থখানি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে ভূদেব সম্পর্কে বিদেশী পণ্ডিত-সমাজের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন—"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share।"[১০]

৩

ভাবতে বিস্ময় লাগে সমকালীন দেশী ও বিদেশী মনীষিবৃন্দের কাছে যাঁর জীবন ও সাহিত্যসাধনা শ্রদ্ধা ও সমাদরের বস্তু ছিল পরবর্তীকালে তিনি বিস্মৃতির প্রায়ান্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এর হেতুনির্ণয় করতে গিয়ে 'ভূদেব-রচনা-সম্ভারে'র সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' এবং 'আচার প্রবন্ধ', বই দুখানা তাঁহাকে ভুলিবার কারণ না হইলেও একালের বিচারে তাঁহার যশের অন্তরায় হইয়াছে সন্দেহ নাই।"[১১] কেননা এই গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ ভূদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে "একালের চিন্তাধারার কোথাও এতটুকু মিল নাই।"[১২] "প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মতিগতি ও ঝোঁক ভূদেবের আদর্শের বিপরীত দিকে।"[১৩] বিশী মহাশয়ের মতে, "আচার প্রবন্ধে'র পরিণাম আরও বিচিত্র। ভূদেবের আদর্শ হইতে যে আমরা কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি (আচার প্রবন্ধের) সূচীপত্রখানার দিকে একবার তাকাইলে বুঝিতে পারা যাইবে।...তিনি কোথায় আর আমরা কোথায় আছি। তাঁহাকে বিস্মৃত না হওয়াটাই যে বিস্ময়কর।"..."তিনি (ভূদেব) হিন্দু বাঙালীর গৃহস্থত্র রচনা করিয়াছিলেন। যে-যুগে তিনি এসব লিখিতেছিলেন তখনো হিন্দু বাঙালীর গৃহ ছিল, কাজেই গৃহস্থত্রের সার্থকতাও ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ হিন্দু বাঙালী কায়িক অর্থে ও আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহহীন, কাজেই ভূদেবের গৃহস্থত্র তাহার মনে রাখিবার কারণ থাকিতে পারে না।"[১৪]

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে অধ্যাপক বিশী বলেছেন, "সেকালের প্রবল পবিত্র জীবন-জাহ্নবী-তীরে ভূদেব অমূল্য স্ফটিকের ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু

এখন সেখানে স্নানার্থী নাই, পানার্থী নাই, পূজার্থী নাই, নির্মলপুণ্যবায়ুসেবীর দল নাই, সমস্ত জনশূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে। কেন এমন হইল? জীবনজাহ্নবী-স্রোত এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে নিরর্থক শুষ্ক আচারের মরুবালুরাশি আর সেই সঙ্গে অমূল্য শিলায় রচিত অপূর্ব কারুকার্যখচিত সোপানশ্রেণী। সে-সব এখন ঐতিহাসিক ও কৌতূহলীর আশ্রয়, জীবনের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন।"[১৫]

৪

কিন্তু 'পরিবারিক প্রবন্ধ' কিংবা 'আচার প্রবন্ধ' গ্রন্থদ্বয় ভূদেব একান্ত আত্মগত-ভাবেই রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি হিন্দুর পরিবারিক জীবন এবং আচার-বিচার সম্পর্কে যে-মত বা আদর্শ প্রচার করেছেন তদনুযায়ীই তিনি তাঁর নিজের জীবন পরিচালিত করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর আচার এবং প্রচারের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে,

যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

এই উক্তির সারবত্তা স্থিতপ্রজ্ঞ ভূদেব অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ 'সামাজিক প্রবন্ধে'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে সর্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্তব্যসূত্র অনির্দিষ্ট এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।"[১৬]

এই আদর্শচ্যুত, আচারভ্রষ্ট যুগে ভূদেব আদর্শ জীবনচর্যার একটি অভ্রান্ত নিদর্শন নিজের জীবনে স্থাপন করে গেছেন। যুগের প্রভাব একদা তাঁর তরুণ মনকেও বিচলিত করেছিল। ভূদেব হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। যখন তাঁর সতীর্থ মধুসূদন খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেন প্রায় সেই সময় ভূদেবের চিত্ত মিশনারীদের প্রভাবে খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিতৃদেব তর্কভূষণ মহাশয়ের সতর্ক ও সস্নেহ প্রযত্নে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই মোহ থেকে মুক্ত হন।[১৭] তারপর থেকে আজীবন ভূদেব আদর্শ ব্রাহ্মণের জীবন পরম নিষ্ঠায় যাপন করে গিয়েছেন।

কিন্তু প্রতিদিনের আচার-আচরণে নিজের ধর্মাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা কি নিন্দার বিষয়? নিজের ধর্মের প্রতি অনুরক্তি যদি মানুষকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায়

অবনমিত করে তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু ভূদেবের চারিত্রধর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি নিজের ধর্ম অবিচল নিষ্ঠায় অনুসরণ করেই পরমতসহিষ্ণু উদার অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাই 'ভূদেব-রচনাসম্ভারে'র সম্পাদক সত্যই বলেছেন "হিন্দু আচারের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় তাঁহাকে 'গোঁড়া ও ধর্মান্ধ করিয়া তোলে নাই, তাঁহাকে উদার পরমত-সহিষ্ণু করিয়াছে।"[১৮]

"ভূদেব হিন্দু আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলিয়াই ভারতের বৃহৎ হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।"[১৯]

"ঊনবিংশ শতকে রামমোহন ব্যতীত মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে এমন উদারতা বোধ করি আর কোনো বাংলা সাহিত্যিকে দেখা যায় নাই।"[২০]

"প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, প্রদেশ নির্বিশেষে সমবর্ণের হিন্দুর মধ্যে এবং সর্বোপরি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। ভূদেবচরিত্রের এই দিকটি এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। উনিশ শতকে যেসব মনীষী বাঙালী কল্পনায় অখণ্ড ভারতভূমি দর্শন করিয়াছিলেন, কল্পনার সত্যকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার দুশ্চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভূদেব নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম।"[২১]

বস্তুত ভূদেবের কথায় ও কাজে, আচারে ও প্রচারে কোনো গরমিল ছিল না বলেই তিনি তাঁর যুগে হিন্দু অহিন্দু নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান যুগে হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধ ইতিহাসের সত্য। শশধর তর্কচূড়ামণির উগ্রতার কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আদিব্রাহ্মসমাজের যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তাও কম তিক্ততার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ভূদেব নিজের আদর্শে অচলপ্রতিষ্ঠ থেকেই এই কলহের ঊর্ধ্বে ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯০ সালের সতেরোই জানুয়ারী এক পত্রে ভূদেবকে লিখছেন, "সেদিন পঞ্চায়েৎ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত আমি সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম এমন সময়ে দেখিলাম যে আপনি নাই। ইহাতে নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইলাম, ঐ সভা সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আমি অতিশয় ব্যগ্র, যেহেতু আপনার দুই-এক-কথা একশো লোকের একশো কথা অপেক্ষা মূল্য হিসাবে বড়ো।"[২২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধা অহেতুক ছিল না। হিন্দু-ব্রাহ্মবিদ্বেষ ভূদেবচিত্তকে কলুষিত করেনি। তাই দেখি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র সেন উদ্যোগী হয়ে একটি সভা আহ্বান করলে সেই সভায় জনসমাগম না হওয়ায় ভূদেব আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন,—

"যে ব্যক্তি আমাদের জাতির প্রধান গৌরবস্থল, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা জগতের সমক্ষে স্পর্ধা করিতে পারি, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাঁহার সম্মানার্থ আমাদের অনেকে উপস্থিত হন নাই। স্বজাতীয় মহৎ ব্যক্তির প্রতি স্বজাতির এইরূপ তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন একটি প্রধান কলঙ্কের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বাঙালী সমাজ এইরূপ কলঙ্কিত হইতেছে দেখিয়া আমরা হৃদয়ে যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি।"[২৩]

এই নিবন্ধেই ভূদেব রামমোহন সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন, "ধর্মজগতে রাজা রামমোহন রায় কিরূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার একটি অক্ষয় ও অনন্ত কীর্তিস্তম্ভ। রাজা রামমোহন রায়ের পবিত্র জীবন কেবল পবিত্র কার্য সম্পাদনার্থই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।"[২৪]

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও ভূদেবের মনে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল না। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয়ভাগে 'ব্রাহ্মধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"আমি কখনই ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই। ব্রাহ্মদিগের জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মেরা জন্মিয়াছেন আমার চিরকালই এই বোধ আছে। ব্রাহ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি তখনই পৌরাণিক বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় এবং রিপুদমনশীল বশিষ্ঠ মহর্ষির একটি কামধেনু ছিল। রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়সন্তান বিশ্বামিত্র রাজা সেই কামধেনুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং কিছুই করিলেন না, কিন্তু নন্দিনী (কামধেনু) আপন শৃঙ্গ খুর পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপরায়ণ বিবিধ ম্লেচ্ছজাতীয়ের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়া কামধেনুকে উদ্ধার করিয়া দিল। আমার মতে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেনু হিন্দুধর্ম, বিশ্বামিত্র প্রবলপ্রতাপ রাজধর্ম এবং কামধেনু-শরীর-নিঃসৃত ম্লেচ্ছগণ ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাহ্মদিগের রূপ ধারণ করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম আপন প্রভাব প্রকাশপূর্বক খ্রীস্টধর্মকে সুদূরপরাহত করিলেন। কামধেনু প্রসূত বিদ্বেষ বিবর্জিত ঐ ব্রাহ্মধর্মের জয় হউক।"

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু উদার বললেই যথেষ্ট হয় না, ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে তাঁর চিন্তাই ছিল সবচেয়ে প্রাগ্রসর। 'সামাজিক প্রবন্ধে'র প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষে মুসলমান সম্পর্কে তাঁর আলোচনা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। এই আলোচনায় তিনি বলেছেন "হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার সূত্রপাত অনেক দিন হইতেই হইয়া আসিতেছে।"[২৫] কিন্তু এই মিলনের পথে সবচেয়ে অন্তরায় যে ইংরেজরাই সৃষ্টি করছে একথা বলতেও ভূদেব কুণ্ঠিত হননি।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে শুধু 'সামাজিক প্রবন্ধে'ই নয়, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থেও ভূদেবের মিলনাকাঙ্ক্ষী কল্যাণ-চিন্তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'স্বপ্নলব্ধ ভাবতবর্ষের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিবকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।"

"ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান।"

"এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।[২৬]

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' অবশ্য ভূদেবের স্বপ্নকল্পনামাত্র। কিন্তু 'পুষ্পাঞ্জলি'তেও দেখা যাচ্ছে, ভূদেব একথা বিশ্বাস করতেন, দেশভেদের ফলেই ধর্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ও ভাষাভেদ। জাতীয়ভাবের উজ্জীবনে দেশভেদ-চেতনা তিরোহিত হলে অন্যান্য বিভেদও ক্রমে ক্রমে আপ্লুত হয়। তাই দেখা যাচ্ছে পুষ্পাঞ্জলির সপ্তম অধ্যায়ে 'দ্বারাবতী—সৃষ্টির উপাদান—সম্মিলনোপায় প্রীতি' প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাপ্রতিম ঋষি মার্কণ্ডেয় বলছেন,

"নানাজাতীয় মনুষ্যগণের একত্র সমাগম দর্শনে অতি গভীরতর আনন্দের অনুভব হয়। অনেকত্বের মধ্যে একত্বের প্রতীতি হইতে থাকে। এই বিভিন্ন

দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন বেশধারী, বিভিন্ন কার্যব্যাপৃত নরগণ পর পর এত পৃথক্‌ভূত হইয়াও এক প্রাকৃতিক জীব। সকলেরই তলভাগ, ভিত্তিমূল, গঠনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলত দেশভেদেই সকল ভেদের কারণ। ধর্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাভেদ একমাত্র দেশভেদ হইতেই জন্মে। সুতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া গেলে কালে আবার একতা জন্মিবে সন্দেহ নাই।"[২৭]

৫

শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিচারেই নয়, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও স্বদেশ-চেতনার ক্ষেত্রেও ভূদেব তার যুগে পথপ্রদর্শক ছিলেন। ভূদেব মুখ্যত ছিলেন শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে চাকরিজীবন শুরু করে তিনি প্রথম শ্রেণীর স্কুল-ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম এই উচ্চপদ লাভ করেন। হেমচন্দ্র শিক্ষাব্রতী ভূদেব সম্পর্কে বলেছিলেন :

ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।

বস্তুত ভূদেব আধুনিক ভারতের শিক্ষাগুরু। পূর্বভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ও কর্ম চিরস্মরণীয়। শিক্ষাক্ষত্রে প্রথমেই আসে ভাষাশিক্ষার প্রশ্ন। এ বিষয়ে ভূদেবের মত অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি শিক্ষার্থীকে ত্রিভাষা শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাতৃভাষা, রাজভাষা ও ধর্মের ভাষা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।[২৮]

ভূদেব যখন বিহার অঞ্চলেরও শিক্ষাপরিদর্শক ছিলেন তখন তিনি বিহারীদের মাতৃভাষা হিন্দীকেই আদালত ও শিক্ষার ভাষারূপে প্রবর্তনের জন্য সার্থক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বঙ্গদেশে ফারসী ভাষার বদলে বাংলা ভাষার প্রবর্তন হয়। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ভূদেব বুঝেছিলেন বিহারে হিন্দী ভাষা প্রচলিত হলে সেখানকার সাহিত্যও দ্রুত

উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীভাষায় গ্রন্থাদি রচনাও সহজসাধ্য হবে।

ভূদেবের সুপারিশক্রমে বিহারে ফারসীর পরিবর্তে আদালতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীভাষার প্রচলন হয়। এ বিষয়ে প্রথম প্রথম বিহারী মুসলমানেরা আপত্তি করেছিলেন। কোরাণের অক্ষর উর্দুর বদলে বেদের অক্ষর দেবনাগরী প্রচলনের বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভূদেব দেখিয়ে দেন যে মুসলমানদেরই ঘরে ঘরে জমিদারী সেরেস্তার অক্ষর কায়থী প্রচলিত আছে। কাজেই সমস্ত ওজর আপত্তির অবসান ঘটলো এবং বিহারের আদালতে হিন্দীভাষা ও কায়থী অক্ষর প্রচলিত হলো। ভূদেব তাঁর আত্মচিন্তায় বলেছেন—"আমার ক্ষুদ্রজীবনের ক্ষুদ্র কর্মগুলির মধ্যে এই কর্মটির সংশ্রব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য বলিয়া মনে করিতে পারি।"[২৯]

কিন্তু এই মহৎ কৃতিত্ব ভূদেবের মনে অহংকারের সৃষ্টি করতে পারেনি। ধর্মপ্রাণ মনীষী গীতার শিক্ষা ভোলেননি—'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'। অহংকারবিমূঢ় ব্যক্তিই নিজেকে 'কর্তা' বলে মনে করে। ভূদেব বলছেন, 'প্রকৃত দৃষ্টিতে আমি কিছুই করি নাই। যে সকল শক্তিতে মনুষ্যসমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইগুলি কালসহকারে এই দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তঃকরণে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় আমি সেইদিকে চেষ্টা করিতে থাকি। অতএব ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।"[৩০]

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তনের জন্য সরকার শিক্ষাকর প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। তখন ভূদেব তার বিরোধিতা করে ছোটলাট ইডেনকে এক পত্রে বলেন: "বঙ্গদেশে শিক্ষাকর নাই। এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূরণ করিতেছে। এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষাকর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত।"[৩১]

এই ব্যাপারে সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেই ভূদেব ক্ষান্ত হননি, তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের একটি প্রস্তাবও ছোটলাটের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে "গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটি করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের যেরূপভাবে নিয়োগ ও বেতনপ্রাপ্তি হয়, সেই ভাবে উক্ত পাঠশালার গুরু-মহাশয়ের

নিয়োগ এবং বেতনপ্রাপ্তি চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত দিয়া হইবে। এই আইন প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিদারী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে।

"এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সুচারুরূপে অনেক দূর পর্যন্ত হইতে পারে। কোনরূপ শিক্ষাকরের অধীনে তাহা হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয়।

"পূর্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন—এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা সেই অবস্থার নিকটবর্তী আনিয়া দেওয়ায় সেইরূপ শুভফল প্রসূত করা সম্ভব।"

ভূদেব কোনো দিক দিয়েই গতানুগতিক ছিলেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনোদিনই পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি মূঢ়দের দলে ছিলেন না। নিজের পরিশীলিত প্রজ্ঞায় যে সংস্কার সুফলপ্রসূ হবে বলে মনে করতেন, অকপটে এবং নিন্দা-প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সেকথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে কোনোদিনই কুণ্ঠিত হননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সরকার 'সহবাসসম্মতি আইন' প্রবর্তনের উদ্যোগী হন। স্বভাবতই রক্ষণশীল সমাজে তার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত ওঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই আইন সমর্থন করেননি। আক্ষেপ করে ভূদেব বলছেন—"শুনিতেছি বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আইনটির বিরোধী। তিনি 'সমাজ সংস্কার' চেষ্টার চূড়ান্ত করিয়া এক্ষণে সে কার্যে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"৩২

ভূদেব ৫।২।৯১ তারিখে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারিকে সহবাসসম্মতি আইন সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিয়ে এক পত্রে লেখেন, "বয়সের উপর কড়াকড়ি না করিয়া রজোদ্গমের পূর্বে সহবাস দণ্ডনীয় এইরূপ আইন করা হউক। তাহাতে যাহাদের বারো বৎসরের পরও রজোদর্শন হয় তাহারাও সংরক্ষিতা থাকিবে এবং হিন্দুমুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী হইবে।"৩৩

ভূদেব সি আই ই উপাধিধারী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করার স্বপ্ন কোনোদিনই দেখেননি। কিন্তু তাঁর স্বদেশচিন্তা সমকালীন নেতৃবৃন্দের কারো পশ্চাতে ছিল না। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তিনি স্বাধীন ভারত সম্পর্কে তাঁর মানস-কল্পনাকেই ভাষা দিয়েছিলেন। তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠেরও পূর্বে রচিত স্বদেশভক্তির মহিম্নস্তোত্র।

তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন—'ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি, সম্মিলন ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।' এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় কেউ কেউ বলেছিলেন—'উহাতে গবর্নমেণ্টের বিরোধী কথা আছে—পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া কাজ নাই।''[৩৪] কিন্তু ভূদেব সে কথায় কর্ণপাত করেননি।

ভূদেব আজীবন এক অখণ্ড মিলিত ভারতের ধ্যান করেছেন। কিভাবে সেই অখণ্ডতা রক্ষিত হয়, কিভাবে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ এক মহামিলনে উদার সূত্রে সম্মিলিত হয়ে মহাভারত রচনার স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে পারে, তার জন্য অনুক্ষণ চিন্তা ও পরিকল্পনা করেছেন। কেবলমাত্র একজন জাতীয় নেতার অধীনে ভারতে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান কিভাবে সম্ভব হতে পারে তারও পথনির্দেশ তিনি করেছেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে যখন কংগ্রেসের অভ্যুদয় হলো তখন তিনি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ত্রুটির সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে ('অপর পক্ষের কথা') তার জনৈক বন্ধুর লেখা থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে ভূদেবের নিম্নলিখিত বক্তব্য উদ্ধার করেছেন

''স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রীতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। দুই তিনবার কংগ্রেস সম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ, এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের যত্নে যদি সমস্ত দেশ মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে এই মহাজাতির অভ্যুত্থান কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসওয়ালাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না, তাহা নিশ্চয় বলা যায়। ইহাদের উদ্যম, আলোচনা আন্দোলনের ফলে চাই কি আমাদের অনেক অভাব অবিচার দূর হইতে পারে, কিন্তু রাজার নিকট সুবিচার প্রাপ্তি কিংবা দুই একস্থলে রাজার সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তিই যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যে অতি সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী তাহা বলিতে বাধ্য হইব। কংগ্রেসওয়ালারা যদি সুসজ্জিত পট্টবাসের পরিবর্তে হোগলার চালা, চেয়ারের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাদুর, পেণ্টলুনের পরিবর্তে ধুতি এবং ইংরেজীর পরিবর্তে ভারতবর্ষীয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয়েন তাহা হইলে বর্তমান কংগ্রেসদ্বারা দেশের কোনো স্থায়ী উপকার সম্ভবপর নহে।''[৩৫]

নিজের প্রবন্ধে এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মুখে মুখে কথা বিকৃত হয় এবং ভূদেববাবু ঠিক কি কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা জানি না।

কিন্তু জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু যে-সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও আমাদের ভাবিবার কথা" ।৩৬

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশচিন্তামূলক প্রবন্ধে নিজের সমর্থনে ভূদেবের অভিমত উদ্ধার করেছেন এতে কি প্রমাণিত হয় না যে স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রেও ভূদেব নেতৃস্থানীয় পুরুষ ছিলেন ?

তবু ইতিহাসসচেতন মানুষকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পরবর্তীকালে ভূদেবকে বাংলাদেশ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাঁর মহত্তম রচনা 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে রাজনারায়ণ বলেছিলেন, 'ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্যপাঠ্য।" কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো লেখকই রাজনারায়ণের এই উপদেশ-বাক্যে কর্ণপাত করেননি।

ভূদেবকে যে এইভাবে বাঙালী জাতি বিস্মৃত হয়েছে তার হেতুনির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন, অতএব পরবর্তী প্রগতিশীল যুগ তাঁর চিন্তা ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিল, এই যুক্তি যে অচল, আশা করি আমাদের এই আলোচনায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো একটি যুগে যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তানায়কের আসনে বৃত হন তাঁকে এক কথায় রক্ষণশীল বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না।

আমাদের মনে হয়, ভূদেবকে যে বাঙালী জাতি বিস্মৃত হয়েছে তার প্রধান হেতু রয়েছে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। আবেগপ্রবণতাই বাঙালী চরিত্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সে হৃদয় দিয়েই জীবনকে গ্রহণ করে, বুদ্ধি দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে নয়। আমরা জানি রঘুনন্দন-রঘুনাথের দেশে একদা নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সূক্ষ্ম তর্কের ক্ষেত্রে বাঙলার মনীষীরা কারো পশ্চাতে ছিলেন না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে 'শান্তিপুর ডুবডুবু, নদে ভেসে যায়' অবস্থা হয়েছিল তিনি প্রেমের বন্যাতেই দেশকে ভাসিয়েছিলেন। জ্ঞানের বীজ এদেশের কোমল পলিমাটিতে অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু পরিবর্ধিত হয় না। ভাবের বীজই এই নদীমাতৃক দেশে সুফলপ্রসূ হয়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রথম দিকে বাঙলার মনীষিগণ যে-জ্ঞানের সাধনা শুরু করেছিলেন এই শতাব্দীর শেষ পাদে তা ভাবের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। বাঙালীর এই দ্বিতীয় জন্মের সারস্বত সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল

মুখ্যত জ্ঞানভিত্তিক। ধীরে ধীরে এই জ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যের বদলে রসভিত্তিক সাহিত্যেরই প্রাধান্য দেখা দিল। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, এবং পরে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা আবেগপ্রবণ বাঙালী-চিত্তের পরম রসায়ন হয়ে উঠল। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রসরচনার মধ্যেই বাঙালী খুঁজে পেলো তার জীবনপিপাসার পানীয়। কেননা রসের তীর্থেই বাঙালীর অমৃতপ্রাশন। তাই দেখি 'পুষ্পাঞ্জলি'র ভূদেব যা পারলেন না, 'আনন্দমঠে'র বঙ্কিমচন্দ্র অনায়াসেই তা সম্পন্ন করলেন। শিক্ষাগুরু ভূদেবের প্রভুসম্মিত বাণী যেখানে ব্যর্থ হলো কবি রবীন্দ্রনাথের কান্তাসম্মিত বাণী সেখানে পেলো পরম সার্থকতা।

সংস্কৃতের একটি প্রকীর্ণ কবিতায় বলা হয়েছে 'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং'। ভূদেব জীবনচর্যার যে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই শাস্ত্রকে পরাভূত করল। মূলত এই কারণেই ভূদেব পরবর্তী যুগে বিস্মৃত হলেন।

কিন্তু তবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালসদৃশ এক বরণীয় পুরুষ। তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'পুষ্পাঞ্জলি', সর্বোপরি তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' বাংলা সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাবও বিস্তার করেছে। ভূদেব-সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ণ, এডুকেশন গেজেটে তাঁর রচনাবলীর সন্ধান এবং পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব কিভাবে কতটা সম্ভব ও সার্থক হয়েছে, এই আলোচনাই আমাদের বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য।

উল্লেখপঞ্জী

১ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত ভূদেব-রচনাসম্ভার-এর ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ ।০

২ দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডের ভূমিকা—পৃ ।০

৩ হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী—বিবিধ খণ্ড, পৃ ৬৬

৪ পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর, **Essays and Letters** খণ্ড, পৃ ৩৪

৫ তদেব পৃ ২০২

৬ তদেব পৃ ২০২

৭ তদেব পৃ ২০৩

৮ তদেব পৃ ১০১

৯ ভূদেব চরিত-৩, পৃ ৩৭৪
১০ ভূদেব চরিত, তৃতীয়খণ্ডে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য : পৃ ৩৭৪
১১ ভূদেব রচনাসম্ভার—ভূমিকা, পৃ /০
১২ তদেব
১৩ তদেব পৃ ৵০
১৪ তদেব পৃ।০
১৫ তদেব পৃ।০
১৬ গ্রন্থের আভাস, সামাজিক প্রবন্ধ
১৭ দ্রষ্টব্য, ভূদেব চরিত-১, সপ্তম অধ্যায়, পৃ ৮৮-১০৫
১৮ ভূদেব রচনাসম্ভার, ভূমিকা পৃ।০
১৯ তদেব পৃ।/০
২০ তদেব পৃ।৵০
২১ তদেব পৃ।৶০ ।।০
২২ ভূদেব চরিত ৩, পৃ ২৮১
২৩ এডুকেশন গেজেট, ২৩শে পৌষ ১২৮৬
২৪ বিবিধ প্রবন্ধ ২, পৃ ১৫৩
২৫ ভূদেব রচনাসম্ভার, পৃ ১২
২৬ তদেব পৃ ৩৪৫-৪৬
২৭ তদেব পৃ ৪০৭
২৮ ভূদেব চরিত ২, পৃ ১২৫
২৯ তদেব পৃ ১৩২
৩০ তদেব পৃ ১৩২-৩৩
৩১ তদেব পৃ ২৮০
৩২ ভূদেব চরিত-৩, পৃ ৩৩৩
৩৩ তদেব পৃ ৩৩৬
৩৪ তদেব পৃ ৩৪৬
৩৫ রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী সং), দশম খণ্ড, পৃ ৫৮৫
৩৬ তদেব

দ্বিতীয় অধ্যায

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মসন ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

ভূদেবের জন্মসন। ১৮২৫ না ১৮২৭?

ভূদেব মুখোপাধ্যাযের জন্মসন নিয়ে সম্প্রতি একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। ভূদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'ভূদেব চরিতে' বলা হয়েছে ১৭৪৬ শকাব্দে (১২৩১ বঙ্গাব্দ) ৩রা ফাল্গুন (১২ই ফেব্রুযারি ১৮২৫ খ্রীঃ) রবিবার কলিকাতার ৩৭নং হরীতকী বাগান লেনে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন।[১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' পুস্তিকায এই সন-তারিখ সম্পর্কে সংশয প্রকাশ করে বলেছেন "এই ইংরেজি বাংলা তারিখে মিল নাই, ৩রা ফাল্গুন না হইযা ২রা ফাল্গুন হওয়া উচিত ছিল। সালেও ভুল আছে।"[২]

ব্রজেন্দ্রনাথ এখানেই থামেননি। তাঁর বিবরণ অনুসারে জানতে পারা যায় যে, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য চুঁচুড়ায বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর একটি পুঁথির মধ্যে ভূদেবের কোষ্ঠী আবিষ্কার করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই আবিষ্কৃত কোষ্ঠীর যে অংশ তাঁর পুস্তিকায উদ্ধৃত করেছেন তা হলো—

"শক০ ১৭৪৮।১০।১০ নক্তং দুই প্রহর ১টার পর ১ দণ্ড কিঞ্চিৎ অধিক বা এই সময় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র হয় বুধবার পঞ্চম যামার্ধগু তস্য চতুর্থ দণ্ডে শনেঃ পূর্বাষাঢ়ায়াং"।[৩] এই উদ্ধৃতির সঙ্গে একটি ছকও দেওযা আছে। তারপর ব্রজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'কোষ্ঠীর উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে এবং এই চক্রানুসারেও ভূদেবের জন্মতারিখ ১৭৪৮ শক ১১ই ফাল্গুন, ইংরেজি মতে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭, পাওয়া যাইতেছে।"[৪]

অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই 'আবিষ্কার' অনুসারে ভূদেবের জন্ম 'ভূদেব চরিতে' প্রদত্ত সন-তারিখ থেকেও দু'বৎসর দশদিন পিছিয়ে যাচ্ছে। ১৮২৫-এর ১২ ফেব্রুয়ারির বদলে হচ্ছে ১৮২৭-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ভূদেবের জন্ম ১৮২৫-এর পরে হতে পারে কিনা তা বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

১। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পাওয়া কোষ্ঠীর যে অংশ

ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্ধার করেছেন তার দিকেই প্রথম লক্ষ্য করা যেতে পারে। ওতে আছে "শক° ১৭৪৭/৮"। বলাই বাহুল্য, বাংলা দেশে কোষ্ঠী রচনায় শকাব্দ অনুসারেই সন-তারিখ নির্ধারিত হয়। তা থেকে বঙ্গাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দ বের করে নিতে হয়। কিন্তু '১৭৪৭-৮' দেখে সন্দেহ হচ্ছে আগে খ্রীষ্টাব্দ বিচার করে তদনুযায়ী শকাব্দ বের করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভূদেবের পিতৃদেব বিশ্বনাথ তর্কভূষণ জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্রের কোষ্ঠীরচনায় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অদ্ভুত ও অবিশুদ্ধ মিশ্রণ ঘটবে এ কল্পনাও করা যায় না। ভূদেব-চরিতে যে জন্মচক্র মুদ্রিত আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় মুদ্রিত জন্মচক্রটি যে অ-বিশেষজ্ঞের হাতে প্রস্তুত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই, প্রথমেই বলতে হয়, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর একটি পুঁথির মধ্যে যা পেয়েছিলেন তা ভূদেবের আসল কোষ্ঠী নয়।

২। ১৮২৭ সালের সমর্থনে ব্রজেন্দ্রনাথ যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন সেই যুক্তিই তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, "এই তারিখই যে ঠিক, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। ভূদেব তাঁহার দিনলিপির একস্থলে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :

1st January '80 Thursday.

Early in the morning I had very strong reminiscences of my past years.

How old am I ? '56 as in the returns I make to the Acct. General or 54 as my children reckon ?

I remember to have been 13 years old when I entered the Hindu College and that was the year of the first Chinese war. If it was in 1839 I am now 54 years of age."[৫]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে লিখিত ভূদেবের ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত এই অংশে ভূদেব বলেছেন, চাকুরিতে দেওয়া সন-তারিখ অনুসারে তাঁর বয়স হলো ৫৬ বৎসর। কিন্তু তাঁর পুত্রদের হিসাব অনুসারে ৫৪। ভূদেব বলছেন তিনি ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। যদি তা ১৮৩৯ হয় তবে পুত্রদের হিসাবই ঠিক, অর্থাৎ তাঁর বয়স ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ৫৪ বৎসর।[৬]

ভূদেবের জন্ম যদি ১৮২৭-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি হয়ে থাকে তাহলে ১৮৮০-র ১লা জানুয়ারি তাঁর বয়স হতো ৫২ বৎসর ১০ মাস ৮ দিন। কাজেই ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের সমর্থনে যে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন তা-ই তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

৩। ১৮৮৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভূদেব তাঁর তৃতীয় পুত্রকে লেখেন :—

"গত ১৪ ফেব্রুয়ারি (৩রা ফাল্গুন) আমার ৬৪ বৎসর বয়স আরম্ভ হয়েছে। আমার ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ১৮৫১ অব্দে গোবির জন্ম হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি। ৩২ বৎসর বয়সে আমার মুকুন্দকে পাই। ৪৮ বৎসর বয়সে উহাদের মাতাকে হারাই।"[৭]

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, ভূদেব ৩রা ফাল্গুনকেই তাঁর জন্মদিন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৭ অব্দে ৩রা ফাল্গুন ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি। তিনি বলছেন সেদিন তার বয়স ৬৪ বৎসর আরম্ভ হয়েছে। এই উক্তি অনুসারে তাঁর জন্ম ১৮২৪ খ্রীঃ। এই হিসাবে জন্ম এক বৎসর এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু দিনটি যে ৩রা ফাল্গুন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকছে না।

ভূদেব বলছেন ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, আর ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়।

১৮৪১ অব্দে ভূদেব যখন হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখনই তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ১৬ হলে তার জন্ম ১৮২৪।২৫ অব্দে। ভূদেবের পত্নীবিয়োগ হয় ১৮৭২ অব্দের ৫ই জুলাই।[৮] ভূদেব বলছেন তখন তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর। এই হিসাব মতেও তাঁর জন্মসন ১৮২৪।২৫।

৪। ১৮৮০ অব্দের ১লা জানুয়ারি ভূদেব তাঁর দিনলিপিতে ছাত্রজীবনের কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—তাঁর যখন ৯ বৎসর বয়স তখন তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়, সেখানে তিনি কম/বেশি দু' বৎসর ছিলেন। তারপর ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি, নবীনমাধবের ইস্কুল, ও ভোলানাথের ইস্কুলে এক বৎসরের কম/কম করে মোট দু'বৎসর ছিলেন।[৯] তাঁর স্মৃতি অনুসারে তিনি যে ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন উপরের হিসাবে তা মিলে যাচ্ছে।

ভূদেব চরিতে বলা হয়েছে (ক) "পঞ্চমবর্ষ বয়সের পূর্বে ভূদেব বাবুর অক্ষর পরিচয় হয় নাই।[১০] (খ) নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভূদেববাবু সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন।"[১১] (গ) "সংস্কৃত কলেজ ছাড়ার পর কিঞ্চিন্ন্যূন তিন বৎসর কালের মধ্যে…তিনটি

স্কুলে তাঁহার কিছু কিছু ইংরাজী পড়া হইয়াছিল।"১২ (ঘ) ভূদেববাবু হিন্দু কলেজে আসিয়া অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর।"১৩

এই হিসাব অনুসাবে সংস্কৃত কলেজে 'কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর' এবং বাকি তিনটি ইস্কুলে 'কিঞ্চিন্ন্যূন তিন বৎসর' যোগ করলে প্রায় পাচ বৎসর পাওয়া যাচ্ছে। 'নবম' বৎসবে সংস্কৃত পড়া শুরু হয়ে থাকলে চতুর্দশ বৎসবে ভূদেব হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ধবা যেতে পাবে। চতুর্দশ বৎসব যদি ১৩ পূর্ণ কয়েক মাস হয় তাহলেও জন্মসন দাঁড়াচ্ছে ১৮২৫।

৫। হিন্দু কলেজে ভূদেবের সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ও গৌবদাস বসাক। মধুসূদনেব জন্ম ১৮২৪, রাজনারায়ণেব ১৮২৬। ভূদেব বয়সে রাজনাবাযণেরও ছোট ছিলেন একথা মনে কবার কোনো সংগত হেতু নেই। গৌরদাস তো সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও ভূদেবকে তাঁর শিক্ষকের মতো মনে করতেন। এক ইংবেজি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "ভূদেবকে কিন্তু আমি একরকম আমার শিক্ষকস্বরূপই মনে করিতাম। সে যেন একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই আমাব মনে হইত।"১৪ সহপাঠীর প্রতি গৌরদাসেব এই সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা থেকে অনুমান কবা অস্বাভাবিক হবে না যে, ভূদেব শুধু পাণ্ডিত্যেই বডো ছিলেন না, বয়সেও বড়ো ছিলেন।

ভূদেব যে রাজনাবাযণেব চেযেও বডো ছিলেন তারও একটি পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। একবার কানপুরে থাকাকালে ভূদেব ও রাজনারায়ণ 'কৌলীন্যের আদিস্থান' দেখার জন্য একসঙ্গে কনৌজ গমন করেন। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখলেন "একদিন কথোপকথনেব সময 'পিতৃভূমি' অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনৌজ) দর্শনেব প্রস্তাব উঠে। কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসেন। এই জন্য আমরা উহাকে 'পিতৃভূমি' সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনৌজ যাইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব কৌতুক করিয়া আমাকে বলিলেন—'যাইবে তো গাড়ু গামছা হাতে কর।' আমি বললাম 'এই উনবিংশ শতাব্দীতে!' আর এক কথা বলিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেকথা এই যে 'আমরা যে গাড়ু গামছা বহা জাত আগে তাহা প্রমাণ কর।"১৫

এই প্রীতিপূর্ণ সরস বর্ণনা থেকেও কি অনুমান করা চলে না যে ভূদেব রাজনারায়ণের সহপাঠী হলেও বয়সে তাঁর চেয়ে বড়োই ছিলেন? ব্রাহ্মণ ভূদেব কায়স্থ রাজনারায়ণকে যে অনায়াসভঙ্গিতে 'যাইবে তো গাড়ু গামছা হাতে

কর' বলে উপাদেয় রসিকতায় অপ্রস্তুত করলেন তা কি সম্ভব হতো যদি ভূদেব বয়সে রাজনারায়ণের ছোট হতেন?

কিন্তু এহো বাহ্য। গৌরদাস ও রাজনারায়ণের প্রসঙ্গ দুটিকে বাদ দিয়েও বলা যায় ভূদেবের জন্মসন কিছুতেই ১৮২৭ হতে পারে না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তিনি যা বলেছেন তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে সরকারী খাতা-পত্রে তাঁর জন্মসন ১৮২৩ এবং পুত্রদের হিসাব মতে ১৮২৫। তাহলেই ৫৬ আর ৫৪ বৎসরের হিসাব ঠিক হয়। ভূদেব নিজেই স্বীকার করেছেন পুত্রদের হিসাবই ঠিক।

ভূদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশের সন্তান। পিতামহ হরিনারায়ণ সার্বভৌম। সার্বভৌমের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ভূদেবের পিতৃদেব। পিতৃদেব সম্পর্কে ভূদেব তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "যদি আমার জীবনচরিত লেখাও তাহা হইলে যেন তাহাতে দেখানো হয় যে আমাতে যাহা কিছু ভালো সে সমস্তই আমার পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব হইতেই প্রাপ্ত। তাহা না করিতে পারিলে ঠিক লেখা হইবে না।"[১৬]

ভূদেবের জননী ব্রহ্মময়ী। পিতৃনির্দেশে ভূদেব জননীর কাছেই দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। ভূদেব চরিতে বলা হয়েছে "প্রত্যহ স্নানের পর মাতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে আহার করিতেন ও স্কুলে যাইতেন।...ভূদেববাবু দীক্ষা-দাত্রী স্নেহময়ী গর্ভধারিণী মাতা ব্রহ্মময়ী দেবীতে জীবের প্রতি অপার করুণাপূর্ণা জগজ্জননীকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেন।"[১৭]

ছাত্রজীবন

১৮৩৫ খ্রী—সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।

১৮৩৭ খ্রী—ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। কিছুদিন পর চন্দ্রমাধব দেব ও ভোলানাথের স্কুলে ভর্তি হন। এই সব স্কুলে সব মিলে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন।

১৮৩৯ খ্রী—হিন্দু কলেজে জুনিয়র স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানেই তিনি মধুসূদন দত্তকে সহাধ্যায়ীরূপে পান। তাঁর অন্যান্য সহা-

ধ্যায়ীরা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, বঙ্কুবিহারী দত্ত, শ্যামাচরণ লাহা প্রমুখ।

১৮৪১ খ্রী—হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত। ওই বৎসরেই ৮ টাকা জুনিয়র বৃত্তি লাভ।

১৮৪২ খ্রী—বৃত্তি পেয়ে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত। সহপাঠী মধুসূদন ও শ্যামাচরণ লাহাও ভূদেবের মতো বৃত্তি পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করে ভূদেব রামগোপাল ঘোষ প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। ভূদেব দ্বিতীয় হয়ে পান রৌপ্যপদক এবং মধুসূদন পান প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক।

এই বৎসরেই ভূদেব সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বর্ধমান রাজ-বৃত্তি ৪০ টাকা লাভ করেন। হিন্দু কলেজে শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

১৮৪৩ খ্রী—প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই বৎসরই মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন।

১৮৪৫ খ্রী—হিন্দু কলেজ ত্যাগ।

হিন্দু কলেজে ভূদেব সর্বমোট ৬ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কলেজে সিনিয়র বিভাগে অধ্যয়নকালে ১৮৪১ খ্রী-এ ভূদেবের বিবাহ হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় পারিবারিক প্রবন্ধের 'উৎসর্গ' পত্রে ভূদেবের সুখী দাম্পত্য জীবনের 'স্মৃতিচারণ'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭২ খ্রী-এর ৫ই জুলাই ভূদেবের পত্নীবিয়োগ হয়।

চাকুরি জীবন

১৮৪৬ খ্রী—হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান। তিনি কিছুদিন পরে এই কাজ ছেড়ে দেন এবং স্বাধীনভাবে শিক্ষাদান শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে—

১৮৪৭ খ্রী-এ 'চন্দননগর সেমিনারী' নামে ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে তাঁকে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে চাকরি গ্রহণ করতে হয়। সরকারী শিক্ষাবিভাগে সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর ৭ মাস কর্মজীবনে তিনি সর্বোচ্চ পদ অধিকার করেন।

১৮৪৮, ২০শে ডিসেম্বর—কলকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ।

১৮৪৯, ১৮ই অক্টোবর—হাওড়া স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ ২১৬) হাওড়ায় নিয়োগের তারিখ ২৩শে আগস্ট ১৮৪৯ দেওয়া আছে।)

১৮৫৬, ২২শে জুন—হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের পদ গ্রহণ।

১৮৬২, ১৫ই জুলাই—সরকারী স্কুল ইনসপেক্টর (অস্থায়ী) সেন্ট্রাল ডিভিশন।

১৮৬৪, ১লা এপ্রিল—বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে (৪র্থ) শ্রেণী—

১৮৬৯, ১৩ই মে—নর্থ সেন্টাল বিভাগে স্কুল ইনসপেক্টর ছয়মাস ছুটির পরে—

১৮৭৩, ২৭শে মে—ঐ বিভাগে পুনরায় কর্মগ্রহণ।

১৮৭৪, ৪ঠা মে—বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে তৃতীয় শ্রেণী লাভ।

১৮৭৫, ৬ই এপ্রিল—পশ্চিমবিভাগে স্কুল ইনসপেক্টর।

১৮৭৫, ১০ই মে—শিক্ষাবিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণী (অস্থায়ী)।

১৮৭৬, ২১শে ফেব্রুয়ারি—একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমবিভাগে স্কুল ইনসপেক্টরের কর্মগ্রহণ।

১৮৭৬, ২রা মে—পশ্চিমবিভাগের স্কুল ইনসপেক্টর।

১৮৭৬, ১৫ই নভেম্বর—বিহার অঞ্চলের স্কুল ইনসপেক্টর।

১৮৭৭, ২১শে মার্চ—শিক্ষাবিভাগে প্রথম শ্রেণী (অস্থায়ী)।

১৮৭৭, ২৩শে জুলাই—পশ্চিমবিভাগে স্কুল ইনসপেক্টর। একই সঙ্গে বিহার অঞ্চলের দায়িত্ব পালন।

১৮৭৮, ২৬শে জানুয়ারি—শিক্ষাবিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণী। একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতেও কাজ করেন।

১৮৭৯, ৬ই ডিসেম্বর—শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে অস্থায়ীপদে নিযুক্ত।

১৮৮২, ২৫শে জানুয়ারি—লেঃ গভর্ণরের কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ। এই বৎসরেই স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বাধীন শিক্ষাকমিশনের সদস্য হন।

১৮৮৩, ২৩শে জুলাই—সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ।

(এসব তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত)

শিক্ষাবিভাগে কাজ করার সময় তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিহারে শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহায়তা করা। বিহারে ফার্সীর পরিবর্তে হিন্দির

প্রবর্তন এবং হিন্দিতে পাঠ্যপুস্তক রচনায সাহায্য করে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। হান্টার কমিশনের মূল রিপোর্ট রচনা তার আর একটি কীর্তি। শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নর্মাল স্কুলগুলির উন্নতিতেও তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন।

সা ম য়ি ক প ত্র প রি চা ল না

মে ১৮৬৪ খ্রী বঙ্গাব্দ ১২৭১, বৈশাখ) 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' প্রকাশ। 'শিক্ষাদর্পণ' পাঁচ বছর চলে বন্ধ হয়।

১৮৬৮ খ্রী—'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ। ১৮৯৪-এর মে মাসে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এটি পরিচালনা করেন।

সা হি ত্য র চ না

রচনাকাল হিসাবে—

১৮৫১ খ্রী—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

১৮৫৬ খ্রী—শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব।

১৮৫৮ খ্রী—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—১ম ভাগ, পুরাবৃত্তসার।

১৮৫৯ খ্রী—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—২য ভাগ

১৮৬২ খ্রী—ক্ষেত্রতত্ত্ব, রোমের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

১৮৬৬ খ্রী—বাঙ্গালার ইতিহাস (৩য ভাগ)।

১৮৬৯ খ্রী—উনবিংশ পুরাণ।

১৮৭৫ খ্রী—স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

১৮৭৬ খ্রী—পারিবারিক প্রবন্ধ (১ম পর্যায), পুষ্পাঞ্জলি,

১৮৮২-৮৩ খ্রী—বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ)।

১৮৮৫ খ্রী—পারিবারিক প্রবন্ধ (২য় পর্যায)।

১৮৮৭-৮৯ খ্রী—সামাজিক প্রবন্ধ।

১৮৯৩-৯৪ খ্রী—আচার প্রবন্ধ।

ভূদেবের মৃত্যুর পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীযভাগ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। বিবিধপ্রবন্ধ দ্বিতীয়ভাগে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। এছাড়া আরো অনেক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটের পাতায় রয়ে গেছে।

জী ব নে র অ ন্যা ন্য কা জ

১৮৮৯ খ্রী-এর ১৭ই এপ্রিল, বঙ্গাব্দ ১২৯৬, ৫ই বৈশাখ, চুঁচুড়ায় বিশ্বনাথ

চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার। ২১শে সেপ্টেম্বর, ৬ই আশ্বিন মাতার নামে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন করেন।

১৮৯৪ খ্রী, ৬ই জানুয়ারি দলিল রেজেস্ট্রী করে ভূদেব এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দান করে বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফণ্ড গঠন করেন। এই ফণ্ডের টাকায় অনেকগুলি বৃত্তি দান করা হয়। এই সবকিছুর উদ্দেশ্যই ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার। বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী, ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় এবং বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফণ্ড এখনও সক্রিয়।

মৃত্যু

১৮৯৪ খ্রী-এর ১৫ই মে চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে ভূদেব শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. ভূদেব চরিত, প্রথম খণ্ড, পৃ ২০
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৪৩। পৃ ৫ ৬
৩. তদেব, পৃ ৬
৪ তদেব, পৃ ৬
৫. তদেব, পৃ ৬-৭
৬. তদেব, পৃ ৬-৭
৭. ভূদেব চরিত-৩, পৃ ১৩২
৮. ভূদেব চরিত ২, পৃ ১ ২
৯. চরিতমালা ৪৩, পৃ ১০
১০. ভূদেব চরিত-১, পৃ ৩১
১১. তদেব, পৃ ৩১
১২. তদেব, পৃ ৪৫
১৩. তদেব, পৃ ৪৫
১৪. তদেব, পৃ ৮৯
১৫. তদেব, পৃ ৩৪৭
১৬. ভূদেব চরিত ৩, পৃ ৪৪৭
১৭ ভূদেব চরিত-১, পৃ ১০৬

তৃতীয় অধ্যায়

সাময়িকপত্র সম্পাদনা

সাময়িকপত্র পরিচালনায় ভূদেবের হাতেখড়ি হয় পাঠ্যজীবনে। ১৮৪১ খ্রীঃ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি সহপাঠীদের জন্য ইংরেজী ভাষায় একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন—নাম "প্রাইভেট অবজার্ভার"।

প্রকৃত সম্পাদক হিসাবে ভূদেব আত্মপ্রকাশ করেন ১৮৬৪ খ্রীঃ-এ (বঙ্গাব্দ ১২৭১, বৈশাখ)। প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম—

"শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার"। মাসিক পত্র।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে 'বর্দ্ধমান' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এটির নাম হয়—"শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা"। এটি ৫ম ভাগ ও ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১২৭৫ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার'-এর কোনো সংখ্যা আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই সংবাদপত্রটি সম্বন্ধে যা কিছু জানা গেছে তা ভূদেব চরিত ১ম ভাগ সপ্তদশ অধ্যায় এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' নামক পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত হলো।

লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ভূদেব এবং শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, যশোদানন্দন সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ। ভূদেবের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র কিছু অংশ এবং তাঁর পিতার লিখিত বাল্মীকি রামায়ণের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা প্রথম এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রচারিত হয়, পরে বিশ্বনাথ সম্পাদিত রামায়ণ 'বিশ্বনাথ রামায়ণ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

শিক্ষাদর্পণের উদ্দেশ্য ছিল 'শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক এবং তৎসম্বীয় সম্বাদ প্রদায়ক সম্বাদপত্র' প্রকাশ করা। আরো উদ্দেশ্য ছিল—'পল্লী গ্রামের লোকেদের মধ্যে 'ভালোকথা'র প্রচার করা। কারণ তাঁরা 'কোনো ভালো বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলির [illegible] নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সম্বাদপত্রসমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি করিয়া সম্বাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার

দর্শিতে পারে, সংবাদগুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে।"১

পাঠশালার পণ্ডিতদের এই পত্রিকা অর্ধমূল্যে দেওয়া হতো।

'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' প্রচলিত থাকতে থাকতেই ভূদেব সুবিখ্যাত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ)। শিক্ষাদর্পণের বার্ষিক মূল্য যাঁরা আগেই দিয়েছিলেন ১২৭৫ সনের চৈত্র মাস পর্যন্ত হিসাব করে উদ্বৃত্ত অর্থ ডাকটিকিটে ফেরত দেওয়া হয় এবং ফাল্গুন মাস থেকে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

এডুকেশন গেজেট

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। এডুকেশন গেজেটের শিরোনাম ছিল—'এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্তাবহ'। ভূদেবের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হয় ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৬৮ খ্রীঃ এ। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৯৪, মে ১৫) তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এডুকেশন গেজেটের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৫৬ খ্রীঃ-এর ৪ঠা জুলাই। এই প্রকাশের মূলেও ছিল ভূদেবের অনুপ্রেরণা। ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, একাদশ অধ্যায় থেকে জানা যায়—একবার 'ভাস্কর' নামে একটি সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কোনো সৎকার্য সম্পর্কে অযথোচিত উক্তি প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের দক্ষিণবিভাগীয় ইনসপেক্টর হজসন প্র্যাটের সঙ্গে ভূদেবের আলোচনা হলে ভূদেব বলেন, "গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণে ঠিক বুঝিতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দ্বারা সর্বদা সকল কথাই সরলভাবে জানান উচিত।"২

ভূদেবের প্রস্তাব প্র্যাট সাহেবের মনঃপূত হলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। প্র্যাট সাহেব ভূদেবকে সম্পাদক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোনো দেশীয় ব্যক্তিকে সম্পাদকের দায়িত্ব দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই রেভারেণ্ড ও' ব্রায়ান স্মিথ এডুকেশন গেজেটের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সহকারী করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেট' পরিচালনা করে স্মিথ সাহেব স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক

অল্পদিনের জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তারপর ১৮৬৬ খ্রীঃ-এর মার্চ মাসে প্যারীচরণ সরকার মাসিক ৩০০্ টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় আড়াই বৎসর দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালনা করে পদত্যাগ করলে ভূদেবকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বত্ব দান করে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। (১৮৬৮)।

সম্পাদক হিসেবে গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বত্ব লাভের পিছনে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্র্যাট সাহেবের ইচ্ছা সত্ত্বেও ভূদেবকে সম্পাদক না করে প্রথমে স্মিথ সাহেব ও পরে প্যারীচরণ সরকারকে সম্পাদক করা হয়। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে প্যারীচরণ পদত্যাগ করলে ভূদেবকে সম্পাদকের পদ গ্রহণে আহ্বান জানানো হয়। ভূদেব তাতে অসম্মত হন ও জানান—"দুইবার উপেক্ষিত হওয়ায় আর উহার ভার লইতে ইচ্ছা নাই।" তা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ এলে ভূদেব জানান—"জিনিসটী আমাকে 'অগ্নিসংস্কার' করিয়া দিবেন। বাবু প্যারীচরণ সরকার যে পাত্র উচ্ছিষ্ট করিয়া ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিলেন, তাহা ঠিক সে অবস্থায় আমি কুড়াইয়া লইব না, আমাকে দিতে হইলে উহার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করিয়া এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব দিতে এবং সম্পাদকের বেতন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে মাসিক তিনশত টাকা দিতেছেন অতঃপর তাহা গ্র্যাণ্ট-ইন এড (সাহায্য) স্বরূপে দিতে হইবে। এইরূপে সম্পূর্ণ সংস্কার হইলে আমার উহা লইতে আপত্তি থাকিবে না।"[৩] ভূদেবের এই দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত ভূদেবের শর্তেই তাঁকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বত্ব দান করা হলো এবং এও নির্দেশ দেওয়া হলো যে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন এডুকেশন গেজেটের জন্য দেয় মাসিক সাহায্যের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

আগেই বলা হয়েছে ভূদেবের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীঃ-এর ৪ঠা ডিসেম্বর। ভূদেব চরিত থেকে জানা যায়—এডুকেশন গেজেট প্রথমে ইংরেজী বর্ষ হিসেবে প্রকাশিত হতো। কিন্তু 'ভূদেববাবুর হস্তে আসার পর প্রথম বৈশাখ আসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে "নূতন সন্দর্ভ—১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা" অভিহিত করিয়া দেশীয় বর্ষ গণনার মধ্যে আনিয়া দিলেন।"[৪] আরো জানা যায়—"এডুকেশন গেজেট সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্বাদপত্র এবং মাসিকপত্র এবং ত্রৈমাসিকপত্রেরও কাজ কতকটা করিবে—তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল।"[৫]

নূতন সন্দর্ভ এডুকেশন গেজেট সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির রেজিস্টার্ড নম্বর ছিল—৩৫১৮১৫, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ছিল ৫৲ টাকা। পত্রিকাটির সামনের মলাট এবং পেছনের মলাটের চার পৃষ্ঠাতেই থাকতো বিজ্ঞাপন। পত্রিকাটি মোট বারো পৃষ্ঠার ছিল। প্রথম পাতায় উল্লিখিত এজেন্টদের তালিকা থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটি ছিল বহুলপ্রচারিত। অবশ্য সরকারী পৃষ্ঠাপোষকতাও প্রচারের একটি প্রধান সহায়ক ছিল। যে সব জায়গায় পত্রিকার এজেন্ট ছিল তা হলো—

কলকাতা, ২৪ পরগণা, আলিপুর, ব্যারাকপুর, হাবড়া, চট্টগ্রাম, হুগলী, চন্দননগর, বর্ধমান, যশোহর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, বাঁকিপুর, বারাণসী, রঙ্গপুর, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, সাঁওতাল পরগণা, খুলনা, দিনাজপুর, মালদহ, কোচবিহার, ফরিদপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা।

ভূদেব যখন এডুকেশন গেজেটের ভার প্রাপ্ত হন, তখন সরকারী হিসাবমতে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮৫০। পরবর্তী কালের হিসাব জানা যায়নি। প্রতি বছর এডুকেশন গেজেটের পঞ্চাশটি সংখ্যা প্রকাশিত হতো। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দু'সপ্তাহ বন্ধ থাকতো।

ভূদেব-ভবন গ্রন্থাগারে (চুঁচুড়া) এডুকেশন গেজেটের অধিকাংশ সংখ্যা সংরক্ষিত হয়েছে। ১৮৬৮ খ্রীঃ-এর ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৮৭১ খ্রীঃ-এর ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটের কোনো সংখ্যা পাওয়া যায়নি। ভূদেব-ভবন-পাঠাগারে রক্ষিত ভূদেব সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট পত্রিকার তালিকা নিম্নরূপ :

১. ১২৭৮ সন (৩য় খণ্ড) ১৮৭১-৭২ খ্রী দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সম্পূর্ণ।
২. ১২৭৯ সন (৪র্থ খণ্ড) ১৮৭২-৭৩ খ্রী সম্পূর্ণ
৩. ১২৮০ সন (৫ম খণ্ড) ১৮৭৩-৭৪ খ্রী সম্পূর্ণ
৪. ১২৮১ সন (৬ষ্ঠ খণ্ড) ১৮৭৪-৭৫ খ্রী সম্পূর্ণ
৫. ১২৮২ সন (৭ম খণ্ড) ১৮৭৫-৭৬ খ্রী সম্পূর্ণ
৬. ১২৮৩ সন (৮ম খণ্ড) ১৮৭৬-৭৭ খ্রী সম্পূর্ণ
৭. ১২৮৪ সন (৯ম খণ্ড) ১৮৭৭-৭৮ খ্রী সম্পূর্ণ
৮. ১২৮৫ সন (১০ম খণ্ড) ১৮৭৮-৭৯ খ্রী সম্পূর্ণ

[২৭শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারি থেকে এক ফর্মা ইংরেজী প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে]

৯. ১২৮৬ সন (১১শ খণ্ড) ১৮৭৯-৮০ খ্রী সম্পূর্ণ
১০. ১২৮৮ সন (১৩শ খণ্ড) ১৮৮১-৮২ খ্রী সম্পূর্ণ
১১. ১২৮৯ সন (১৪শ খণ্ড) ১৮৮২-৮৩ খ্রী সম্পূর্ণ
১২. ১২৯০ সন (১৫শ খণ্ড) ১৮৮৩-৮৪ খ্রী সম্পূর্ণ
১৩. ১২৯১ সন (১৬শ খণ্ড) ১৮৮৪-৮৫ খ্রী সম্পূর্ণ
১৪. ১২৯২ সন (১৭শ খণ্ড) ১৮৮৫-৮৬ খ্রী সম্পূর্ণ
১৫. ১২৯৩ সন (১৮শ খণ্ড) ১৮৮৬ ৮৭ খ্রী সম্পূর্ণ
১৬. ১২৯৪ সন (১৯শ খণ্ড) ১৮৮৭ ৮৮ খ্রী সম্পূর্ণ
১৭. ১২৯৫ সন (২ শ খণ্ড) ১৮৮৮ ৮৯ খ্রী সম্পূর্ণ
১৮ ১২৯৬ সন (২১শ খণ্ড) ১৮৮৯-৯০ খ্রী সম্পূর্ণ
১৯. ১২৯৭ সন (২২শ খণ্ড) ১৮৯০ ৯১ খ্রী সম্পূর্ণ
২০. ১২৯৮ সন (২৩শ খণ্ড) ১৮৯১-৯২ খ্রী সম্পূর্ণ

[১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২২শ, ২৩শ, ২৪শ, সংখ্যা নেই]

২১. ১২৯৯ সন (২৪শ খণ্ড) ১৮৯২-৯৩ খ্রী সম্পূর্ণ

১৩০০ সন (২৫শ খণ্ড) ১৮৯৩-৯৪ খ্রী সম্পূর্ণ এডুকেশন গেজেট কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে।

পঁচিশ বছরের কিছু বেশি সময় ভূদেব এডুকেশন গেজেট সম্পাদনা করেন। তার মধ্যে ইংরেজী বর্ষ হিসাবে প্রকাশিত একটিও সংখ্যা পাওয়া যায়নি। নূতন সন্দর্ভের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ খণ্ড, বিংশ খণ্ড এবং ১৩০১ সনের বৈশাখ সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৩০১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের সূচনায় ভূদেবের মৃত্যু হয়। ভূদেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র এবং পৌত্রগণ বেশ কিছুদিন এডুকেশন গেজেট সম্পাদনা করেন।

সম্পাদক ভূদেব

পুরাতন এডুকেশন গেজেটকে 'অগ্নিসংস্কার' করে নেবার কথা বলেছিলেন ভূদেব। তাই তিনি সম্পাদক হয়ে প্রথমেই পুরাতন এডুকেশন গেজেটের সমস্ত হিসাবপত্র ২৫।১২।১৮৬৮ তারিখের পত্রিকায় গ্রাহকদের নাম-সমেত ছাপিয়ে দেন। হিসাবমতে এডুকেশন গেজেটের গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৮৫০। এর মধ্যে মাত্র ২৩৮ জনের অগ্রিম মূল্য কিছু কিছু দেওয়া ছিল। আর সকলকে বিনামূল্যেই

দীর্ঘকাল কাগজ পাঠানো হচ্ছিল। নামের তালিকা ও অগ্রিম মূল্য প্রকাশ করে দেবার পরে যাঁদের দেয় মূল্য বাকী ছিল তাঁদের কাগজ পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয় ও আফিসে সুশৃংখলা স্থাপন করা হয়। গ্রাহকসংখ্যা কম থাকায় ভূদেব প্রথম সংখ্যা থেকেই এডুকেশন গেজেটের আকার এক ফর্মা কম করে দেন। ২২শে আশ্বিন ১২৭৮ থেকে আবার তাকে পূর্ব আকার দান করেন।

ভূদেব চরিত থেকে জানা যায় ৪।১২।১৮৬৮ সংখ্যা এডুকেশন গেজেটে ভূদেব পত্রিকার লক্ষ্য সম্পর্কে লেখেন—

"কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে—কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব— অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না—কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাবাক্যে বিশ্বাস আছে সত্যমেব জয়তে।"[৬]

পরবর্তীকালে (১৮৮৭) স্টেটসম্যান মন্তব্য করেন 'গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিলে সাধারণে সংবাদপত্র সকল পড়িতে ইচ্ছা করে না। এডুকেশন গেজেট একখানি গবর্ণমেন্টের ছন্দানুবর্তী কাগজ। সুতরাং সাধারণ্যে উহার পাঠক নাই।' ভূদেব এই মন্তব্যের উত্তরে যা লেখেন তা থেকেও এডুকেশন গেজেটে প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত প্রতিশ্রুতি পালনের কথাই পুনরায় উচ্চারিত হয়। ভূদেব লেখেন—"যে কোন প্রকারেই হউক গবর্ণমেন্টের দোষ উদঘোষণ করাই যাহাদের একমাত্র নীতি তাহাদের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। যেস্থলে গবর্ণমেন্টের হঠকারিতা বা অঙ্গহীনতা লক্ষিত হইবে সেস্থলে বিশিষ্ট ধীরতার সহিতই তাহা প্রদর্শন করা কর্তব্য।

"আমরা স্টেটসম্যানকে জানাইতেছি, যে সমস্ত সংবাদপত্র নিরন্তর গবর্ণমেন্টের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, উচ্চশ্রেণীর পাঠকসমাজে তাহার কিছুমাত্র আদর নাই। এই সকল সংবাদপত্র প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতির সংস্কার না করিয়া গবর্ণমেন্টের কোন কোন সৎকার্যের প্রতিও সাধারণের বিরাগ জন্মাইতে পারে। আপনাদের অভাব, আপনাদের অসুবিধা, ও আপনাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন করাই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুরবস্থা জ্ঞাপনের সময় ধীরতা বা বিবেকের সীমার বহিশ্চর হওয়া বিধেয় নহে, এবং তাহা হইতে গেলে বিবেচক পাঠক ও গবর্ণমেন্ট উভয়েরই বিরাগভাজন হইতে হয়।"[৭]

এই মন্তব্যের আট বৎসর পরে "নব বিভাকর সাধারণী" পত্রিকায় যে কোনো

বিষয়ে 'চুটিযা' লেখার পক্ষে সমর্থন জানানো হয়। তার উত্তরে ভূদেব যে মন্তব্য করেন তা থেকেও এই একই মনোভাব প্রকাশ পায়। ভূদেব লেখেন—'আমরা একমাত্র সত্যকেই সারবান বলিযা মনে করি, সত্যই স্থায়ী, আরোপিত কোন বস্তুই স্থায়ী বা সারবান হয না। সহযোগী ভাবিযা দেখুন, চুটিযা লেখাটা এখানকার ইংরাজী সংবাদপত্রের অনুকরণজাত। ওটা ভাল জিনিস নয়।"[৮]

বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত এই তিনটি উক্তি থেকে জানা যায়,—যা প্রকৃত সত্য একমাত্র তাকেই অবলম্বন ও সমর্থন করা ছিল এডুকেশন গেজেটের লক্ষ্য। গবর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনাও করা হতো বটে, তবে তা সংযত মৃদুভাবে—ভূদেবের ভাষায় "বিশিষ্ট ধীরতার সহিত।" জাতীয় জীবনের সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহও ছিল এই পত্রিকার অঙ্গীভূত। বলা বাহুল্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকার সম্পাদনাভার ভূদেব গ্রহণ করেন সে উদ্দেশ্য তিনি সফল করেছিলেন।

এডুকেশন গেজেটের নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল:

১. সম্পাদকীয়
২. সম্পাদকের লেখা প্রবন্ধ
৩. সাপ্তাহিক সংবাদ (নূতন ও সংকলিত। যেসব বিষয়ে সংবাদ থাকতো: আদালত, পীড়া, কৃষি, দুর্ঘটনা, অদ্ভুত ঘটনা, লোককীর্তি, বার্তাবহ, বাণিজ্য বার্তা, প্রাকৃতিক বিবরণ ইত্যাদি।)
৪. রাজকার্যে নিয়োগ
৫. পত্রপ্রেরকের প্রতি, (সম্পাদকের মন্তব্য)
৬. প্রাপ্তপত্র (পাঠকদের কাছ থেকে। অনেক সময় অনেক প্রবন্ধ, বিভিন্ন সংবাদ, ইত্যাদিও থাকতো।)
৭. কবিতা
৮. বিবিধ
৯. বিভিন্ন বিজ্ঞাপন
১০. শিক্ষাসংক্রান্ত।

মাঝে মাঝে প্রকাশিত বিষয়

১. বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা
২. জীবনী

৩. নানাবিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগবিধি

৪. ঐতিহাসিক আলোচনা

১৮৭৯ খ্রীঃ-এর ৩রা জানুয়ারি, ২০শে পৌষ ১৮৮৫, থেকে এডুকেশন গেজেটের চেহারার কিছু পরিবর্তন করা হয়, প্রথমে প্রাপ্তপত্র, তারপর সম্পাদকীয়।

ওই বৎসরেরই ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২৮শে মাঘ থেকে আর একটি নূতন বিষয় সংযোজিত হয়—'সার সংগ্রহ।' বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তার উপর এডুকেশন গেজেটে সম্পাদকের মন্তব্যই হলো সারসংগ্রহ। সম্পাদকের মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য।

এছাড়া—বিবিধ চাটনী—ঢাকাই আমদানী এই নামে কিছু হাস্যকৌতুকও পরিবেশিত হতো।

'সাহিত্য বিষয়ক সংবাদ' শীর্ষক স্তম্ভে থাকতো বাংলায় প্রকাশিত পুস্তকের হিসাব। এ বিভাগটি ছিল অনিয়মিত।

১২৯৮ সনের ২৬শে বৈশাখ (ইং ৮।৫।১৮৯১) থেকে প্রতি সংখ্যায় একটি করে উদ্ভট কবিতা ছাপা হতে থাকে। এই বিভাগটি বরাবর ছিল। পাঠকদের কাছ থেকে সংগৃহীত উদ্ভট কবিতাও ছাপা হতো।

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে সাধারণত লেখকদের নাম থাকতো না। সম্পাদকের লেখাগুলি থাকতো পরপর—পুস্তক সমালোচনা পর্যন্ত। তারপর সাপ্তাহিক সংবাদ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ—পারিবারিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ—প্রাপ্তপত্র স্তম্ভে ছাপা হয়েছিল। এ সম্পর্কে অবশ্য সম্পাদকীয় স্তম্ভে পূর্বেই জানানো হয়েছিল। আনন্দরাম শর্মা ছদ্মনামে পৌত্রদের উপর রচিত ভূদেবের কিছু সংস্কৃত শ্লোক 'প্রাপ্তপত্র' স্তম্ভে ছাপা হয়।

এডুকেশন গেজেটে অনুল্লেখিত নিয়মিত লেখকদের কিছু নাম 'ভূদেব চরিত ১ম খণ্ড' থেকে জানা গেছে। যেমন—গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়—বৈজ্ঞানিক বিবরণ, পুলিনবিহারী ভাদুড়ী—বাণিজ্য বার্তা, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী—হাইকোর্টের নজীর লিখে পাঠাতেন। এছাড়া শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যও নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন। ক্ষেত্রনাথের লেখাগুলি এই পত্রিকাতেই ছাপা হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ভারত বিলাপ' ও 'ভারত সঙ্গীত' এবং 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রথম সর্গ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, আর যাঁরা অনিয়মিত

লিখেছেন—তাঁরা হলেন দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। 'ছোয়ানপক্ষী' ছদ্মনামে শিবদাস ভট্টাচার্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও সমালোচনা লিখতেন।

"ধর্মোন্নতি'—বৈজ্ঞানিক সমালোচনা" নামে অক্ষয়কুমার চৌধুরী রচিত একটি প্রবন্ধ (ছয় কিস্তি) এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বোম্বাই রায়ত'—'ভারতী' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা— 'দুর্গোৎসব'।

এডুকেশন গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত যেসব লেখকের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে ছিলেন—

গোপালচন্দ্র বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, রাজকৃষ্ণ মিশ্র, গৌরীপ্রসাদ মজুমদার, গোবিন্দ চক্রবর্তী, উমেশচন্দ্র বৈতালিক, বিরজাপ্রসাদ মজুমদার, রমেশচন্দ্র রায়, রাধানাথ রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

যে সব পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হতোঃ

সোমপ্রকাশ, বান্ধব, অমৃতবাজার, স্টেটসম্যান, সঞ্জীবনী, নববিভাকর, সহচর, বঙ্গবাসী, তত্ত্ববোধিনী, নীহার, সুরভি, পতাকা, ভারত বণিক, ভারতী, পাক্ষিক, সমালোচক, বৈষয়িকতত্ত্ব, দৈনিক, সময়, কৃষিগেজেট, বেঙ্গলী।

এডুকেশন গেজেটের যে কোনো একটি সপ্তাহের সূচীপত্র থেকে এই পত্রিকাটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। তাই আমাদের সংগৃহীত ভূদেব সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যার সূচীপত্রটি এখানে উল্লিখিত হলো।

॥ এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্তাবহ ॥

৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৮ই বৈশাখ ১২৭৮ সন, শুক্রবার, ২১শে এপ্রিল ১৮৭১ খ্রী

সম্পাদকের লেখা :

১।	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	পৃঃ ১৫
২।	গতবর্ষের বৃত্তান্ত	পৃঃ ১৫
৩।	শান্তিরক্ষা	পৃঃ ১৫
৪।	ভূম্যধিকার	পৃঃ ১৬
৫।	নূতন রাজপুরুষ নিয়োগ	পৃঃ ১৬
৬।	নূতন শাসনব্যবস্থার প্রণালী	পৃঃ ১৬
৭।	নির্মাণ কীর্তি	পৃঃ ১৬

৮। সর্বসাধারণের মধ্যে বিদ্যা প্রচার পৃঃ ১৭
৯। সামাজিক ব্যবস্থা পৃঃ ১৭
১০। নূতন পুস্তক ও পত্রিকা পৃঃ ১৮
১১। (বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে)
সাপ্তাহিক সংবাদ পৃঃ ১৯,২০,২১
১২। রাজকার্যে নিয়োগ পৃঃ ২১
১৩। পত্রপ্রেরকের প্রতি পৃঃ ২১
(সম্পাদক)
১৪। প্রাপ্ত পত্র : (পাঠকদের কাছ থেকে)

(ক) বহু বিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী কোরহাটী জ্ঞান বিকাশিনী সভার মত। কোরহাটী জ্ঞান জ্যোতির্বিকাশিনী সভা বিক্রমপুর—১২৭৭—পৃঃ ২২

খ) দমদমের কাছে নিমতা গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পত্র, সম্পাদক মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২২

গ) কিছু কারিগরী আবিষ্কার সম্পর্কে পত্র—প্রেরকের নাম নেই—শান্তিপুর ১৯শে চৈত্র ১২৭৮—পৃঃ ২২

ঘ) কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য অনুরোধপত্র—প্রেরকের নাম নেই—জেলা নদীয়া, ১৩ই এপ্রিল ১৮৭১—পৃঃ ২২-২৩

ঙ) রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—পত্রপ্রেরক শ্রীচন্দ্রনাথ রায় বর্ধমান, পূর্বস্থলী, ১লা বৈশাখ (নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত রামনাথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা)। পৃঃ ২৩

১৫। বিবিধ—পৃঃ ২৩

১৬। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন। তার মধ্যে উত্তর মধ্য স্কুল ইনেসপেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত শিক্ষাবিভাগীয় বিজ্ঞাপন। পৃঃ ২৩

১৭। শিক্ষা সংক্রান্ত—বিবিধ সংবাদ।
মলাটের পৃষ্ঠায় সামনে পেছনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন।

সাময়িকপত্র হিসাবে এডুকেশন গেজেটের বিচার

প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্রের বৈশিষ্ট্য হলো: ১। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক সকল বিষয় সম্পর্কেই আগ্রহ, ২। সেই সব বিষয়ের প্রকৃত

সত্য বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ, ৩। সেই সব বিষযেব নিবপেক্ষ বিচার, ৪। দেশ এবং দশের পক্ষে যা মঙ্গলজনক তার সমর্থন, ৫। ভাষা ব্যবহার ও মতপ্রকাশে রুচি ও সংযম বজায় রাখা, ৬। সামযিকপত্রেব নীতি ও আদর্শ রক্ষা কবে চলা।

ভূদেব-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট সামযিকপত্রেব এই সব কযটি শর্তই পূরণ করতে পেরেছিল। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত এবং আলোচিত বিষযবস্তুর বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে ভূদেব যথেষ্ট পবিমাণেই যুগসচেতন পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ ও শিক্ষা—এডুকেশন গেজেটের আলোচনাকে এই চাব-ভাগে ভাগ কবলে ভূদেবেব এই কালসচেতন মনোভাবটি পবিস্ফুট হবে।

সাহিত্য : বচনা ও সমালোচনা।

সমাজ হিন্দুসমাজ, সমাজ সংস্কাব ও ইংবেজ, সমাজেব আত্মশক্তি জাগবণের গুরুত্ব এব হিন্দু মুসলমান।

স্বদেশ ইংবেজ শাসন, ইংবেজ শাসনেব প্রভাব ও পরিণাম, ইংবেজ ও ভাবতবাসী, স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীযসভা।

শিক্ষা · বিদ্যালযেব শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ইংবেজী শিক্ষা, স্বদেশীভাষা শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থায সবকাবী সাহায্য ও হিন্দু-মুসলমান।

সা হি ত্য

সাহিত্য—রচনা এবং সমালোচনা—এডুকেশন গেজেটে একটা বড়ো অংশ নিয়েছিল। স্বযং সম্পাদকই সব্যসাচীব মতো একই সঙ্গে এই দুটি দাযিত্ব বহন করেছেন।

স্বপ্নলব্ধ ভাবতবর্ষের ইতিহাস, পাবিবাবিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ এবং বাংলার ইতিহাসের কিছু অংশ পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রচাবিত ভূদেবেব এই সব গ্রন্থ প্রথমে এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত হযেছিল। এগুলি ছাড়া আবো কিছু প্রবন্ধ পববর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয ভাগে' সংকলিত হযেছিল। এগুলিব বাইরে আরো অনেক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হযেছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হবার যোগ্য।

এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধেবই একাধিপত্য। আর এসব প্রবন্ধের রচযিতা প্রধানতই সম্পাদক স্বয়ং। অন্য ধবনের বচনা যে কিছু কিছু প্রকাশিত না হযেছে এমন নয়। উদাহরণ হিসাবে ভূদেবেব নিজের পৌত্র দৌহিত্রদেব উপর রচিত

কিছু সংস্কৃত শ্লোক, এবং কালী বিষয়ক একটি কবিতার উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া অন্যান্য কবিদের কবিতা প্রায়ই থাকতো। নানাবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতো, তার মধ্যে বেশির ভাগই স্বাক্ষর-বিহীন। সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। দুটি স্বাক্ষরহীন রচনা দীর্ঘদিন ধরে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বিষয়ক, আর একটি বিশ্বনাথ রামায়ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'বিশ্বনাথ রামায়ণ' ভূদেবের পিতৃদেবের রচনা।

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত, কিন্তু এ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, ভূদেবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম নিম্নে সংকলিত হলো,

১। বাঙ্গালা সাহিত্য

২। বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর একটি ব্যবসায় হওয়া উচিত—১৮ই আষাঢ় ১২৮৮ সন, ১লা জুলাই ১৮৮১ খ্রী

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি—১৬ই আশ্বিন ১২৮২, ১লা অক্টোবর ১৮৭৫

৪। বঙ্গীয় গ্রন্থকার—২৫শে অগ্রহায়ণ ১২৮২ সন, ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭৫

৫। সাহিত্যজীবী—২৭শে ফাল্গুন ১২৮৮ সন, ১০ই মার্চ ১৮৮২ খ্রী

সাহিত্য পর্যায়ের আলোচনাগুলিতে সমালোচনা এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংখ্যাই ছিল বেশি। প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা ছিল একটি নিয়মিত সূচী। এইসব সমালোচনা দেখে বোঝা যায় রসের বিচারই ছিল ভূদেবের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড। যেসব রচনা এই বিচারে উত্তীর্ণ হতো সেগুলি যত সামান্যই হোক ভূদেব তাদের উপযুক্ত মূল্য দিয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে রসসৃষ্টির ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে ভূদেব সেসব রচনার দৃঢ় অথচ সংযত ভাষায় সমালোচনা করেছেন। ভূদেবের সাহিত্য-সমালোচনায় যেটা লক্ষণীয় তা হলো প্রকাশভঙ্গির সংযম। তাছাড়া ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা তাঁর সমালোচক সত্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে আধুনিক সাহিত্যে তিনি একটি নূতন দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করেছেন,—তা হলো 'আর্যদৃষ্টি'। এই আর্যদৃষ্টি তিনি খুঁজে পেয়েছেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও।

ভূদেবের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা-শক্তির আর একটি উদাহরণ—বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত রচনা উপলক্ষে রচিত প্রাচীন সাহিত্যে 'প্রক্ষিপ্ত' অংশের অবস্থানের কারণ নির্ণায়ক একটি প্রবন্ধ। তিনি রচনাটির নাম দিয়েছেন 'সমালোচন'।

অন্যত্র 'বিবিধ প্রবন্ধ'—প্রথম ভাগের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা সমালোচক ভূদেবের আর একটি সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছি। তাই এখানে যে সম্পর্কে আরো

আলোচনা বাহুল্যবোধেই বর্জন করা হলো। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনায় ভূদেবের আর একটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

সমালোচক হিসাবে ভূদেব অনেক সময় প্রাপ্ত পুস্তকের ভুল সংশোধন করে দিতেন, কখনো বা ছন্দের ত্রুটিও দেখিয়ে দিয়ে তারও সংশোধন করতেন। সাহিত্য যেন তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়, তিনি তাই চেয়েছেন। তাঁর মতে রসসৃষ্টিই সাহিত্যের স্বভাবধর্ম।

আমাদের সাহিত্যশাস্ত্রে নাটক রচনাকে সব থেকে কঠিন শিল্পকর্ম বলা হয়েছে। ভূদেবও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগুলিতে নাটককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নানা প্রসঙ্গে তিনি নাটক রচনার আদর্শ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

সমালোচনার ক্ষেত্রে ভূদেব আর একটি দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। সেটি ভাষার ক্ষেত্র। মুসলমানী বাংলা আর খ্রীষ্টানী বাংলা বলে যে কিছু থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়—ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই একই বাংলাভাষা থাকা উচিত—এই বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। এ ধরনের বাংলা-ভাষাকে তিনি বলেছেন 'জারজ বাংলা'।

বাংলাভাষা এবং তার অন্যান্য ভগিনী ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন।

এক কথায় বলতে গেলে, সাহিত্য ও ভাষার মোটামুটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনাই তিনি করেছেন। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবেও তাঁর পরিচয়টি এসব রচনার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন।

এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের তালিকা

১। অভেদী—টেকচাঁদ ঠাকুর—৩রা আষাঢ় ১২৭৮ সন ১৬।৬।১৮৭১

২। জামাইবারিক—দীনবন্ধু মিত্র—১৫ই বৈশাখ, ১২৭৯ সন ২৬।৪।১৮৭২

৩। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ)

যথাক্রমে—২২শে ভাদ্র ১২৭৯ সন ও ৭ই ভাদ্র ১২৮০ সন।

৪। রামায়ণ—১৯শে অগ্রহায়ণ ১২৮১, ৪।১২।১৮৭৪

৫। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু—৪ঠা পৌষ ১২৮১ সন, ১৮।১২। ১৮৭৪

৬। বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১লা ফাল্গুন ১২৮১ সন, ১২।২। ১৮৭৫

৭। ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ—রাজনারায়ণ বসু—১৮ই বৈশাখ ১৮৮২ সন ৩০।৪।১৮৭৫

৮। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—১লা মাঘ ১২৮২ সন, ১৪।১। ১৮৭৬

৯। পুষ্পমালা—শিবনাথ শাস্ত্রী—১০ই বৈশাখ ১২৮৩ সন, ২১।৪।১৮৭৬

১০। আশাকানন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ সন, ১২।৫। ১৮৭৬

১১। অবকাশরঞ্জিনী—নবীনচন্দ্র সেন—১২ই আশ্বিন ১২৮৫, ২৭।৯।১৮৭৮

১২। বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতীয় মহিলা—১লা শ্রাবণ ১২৮৮, ১৫।৭।১৮৮১

১৩। বিবিধ প্রবন্ধ—রাজনারায়ণ বসু—২৮শে মাঘ ১২৮৯, ৯।২।১৮৮৩

১৪। প্রদীপ—অক্ষয়কুমার বড়াল—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, ১৬।৫।১৮৮৪

১৫। বিষাদসিন্ধু—মীর মশাররফ হোসেন—৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, ১২।৬। ১৮৮৫

১৬। কবিতা সংগ্রহ—ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা—বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত—২৯শে কার্তিক ১২৯২, ১৩।১২।১৮৮৫

১৭। কনকাঞ্জলি—অক্ষয়কুমার বড়াল—১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩, ২৮।৫।১৮৮৬

১৮। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী—২য় ভাগ—২২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩, ৪।৬।১৮৮৬

১৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত—৭ই আশ্বিন ১৩০০, ২২।৯।১৮৯৩

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের চারটি গ্রন্থের সমালোচনা করা হয়।

১। কবিকাহিনী—৩০শে কার্তিক ১২৮৪, ১৫।১১।১৮৭৭

২। প্রভাত সংগীত—২রা আষাঢ় ১২৯০, ১৫।৬।১৮৮৩

৩। বিবিধপ্রসঙ্গ—১৯শে আশ্বিন ১২৯০, ৫।১০।১৮৮৩

৪। প্রকৃতির প্রতিশোধ—২১শে আষাঢ় ১২৯১, ৩।৭।১৮৮৪

বঙ্কিমচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরের কোনো রচনা সম্বন্ধেই প্রায় কিছু পাওয়া যায়নি।

একমাত্র বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে সামান্য মন্তব্য করা হয়েছে। আর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সম্পাদক তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

স্বদেশ ও সমাজ

এডুকেশন গেজেটের আলোচনার প্রধান বিষয়ই ছিল সেযুগের সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনারাজি। আর এই আলোচনারই সূত্র ধরে এসেছে স্বদেশ ও সমাজের কথা। স্বদেশ ও সমাজের আলোচনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ছিল—ইংরেজ জাতি বিদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) ও স্বদেশে (অর্থাৎ ব্রিটেনে), শাসক ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্ক ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান ও ইংরেজ, হিন্দুজাতি, হিন্দুর সমাজসংস্কার আন্দোলন ও ইংরেজ শাসক এবং হিন্দুসমাজের আত্মশক্তি জাগরণের গুরুত্ব।

সুদীর্ঘকালের সম্পাদক জীবনে ভূদেব এসব বিষয় নিয়ে যা চিন্তা করেছেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা-ই প্রকাশিত হয়েছে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধে'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই দুই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি প্রথমে এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যত্র এই দুটি গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনায় ভূদেবের স্বদেশ ও সমাজ চিন্তার স্বরূপটি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে। এই পর্যায়ে তার মূল সূত্রগুলি উল্লেখিত হতে পারে।

সেযুগের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনকে এদেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করতেন, ভূদেবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইংরেজ জাতির প্রধান গুণ-গুলিকে প্রশংসা করে তিনি আমাদের জীবনেও সেইসব গুণের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ জাতির উদ্যম, উৎসাহ, সুশৃংখলাবোধ এবং আত্মগৌরব আমাদের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। স্বদেশে ইংরেজ জাতি এবং বিদেশে শাসক ইংরেজ—ইংরেজের চরিত্রের এই দুটি সত্তার পার্থক্য ভূদেবের চোখে ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যার নাম দিয়েছিলেন 'বড়ো ইংরেজ' ও 'ছোট ইংরেজ'।

ভূদেব রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেননি। সরকারী পদগুলিতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ এবং বিচারালয়ে দেশীয় বিচারক নিয়োগের উপর তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশবাসীর পক্ষে যা কিছু হিতকর তার ন্যায়-সংগত প্রার্থনা সরকারের আনুকূল্য পাবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেছেন। তিনি মনে করতেন, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর একটি মিলন প্রতিষ্ঠান

এই জাতীয় কংগ্রেস। সেদিক থেকে এর মূল্য অসীম। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ইংরেজের অনুসৃত রীতিকে তিনি পরিহার করতেই চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না নেমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান কাম্য। স্বদেশে জাতীয় কংগ্রেস একাজের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। বিদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি রাখা এবং একটি সংবাদপত্র প্রচারের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর মতে ইংরেজ হলেই তার সবকিছু ভালো এ মনোভাব পরিত্যাজ্য। তিনি মনে করতেন দেশীয় নেতার অধীনেই এদেশের প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব।

ভূদেবের মতে ইংরেজের সঙ্গে ব্যবহারে সহজভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে চলাই কর্তব্য। তাদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা কাম্য নয়।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই ভারতবাসী এবং ইংরেজ বিদেশী ভারতশাসক। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মিলিতভাবে নিজেদের দেশের উন্নতির বিষয় চিন্তা করা উচিত এবং সরকার কর্তৃক এই-দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া উচিত বলেই তিনি জোর দিয়েছেন।

হিন্দু-সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সরকারী বা বেসরকারী কোনো ইংরেজেরই সাহায্য নেওয়া অনুচিত। সমাজের আভ্যন্তরিক শক্তিবলেই তার ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভব। ভূদেবের এই অভিমতের সঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মতের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। (স্বদেশীসমাজ)।

বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ এই দুই বিষয় নিয়েই সে-সময় সমাজে প্রবল আন্দোলন হয়। ভূদেব বহুবিবাহের একান্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আইন করে তা রোধ করা সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করতেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। কিন্তু তবু তার বিচারে তার সুফলটাই বেশি বলে অনুভূত হয়েছে। আইন দ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করার ফল হিসাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনিবার্যতা দেখা যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী বিবাহবন্ধনের অমোঘতাকেই স্বীকার করতেন।

স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক আলোচনাগুলিতে তিনি সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন জাতীয় গৌরব রক্ষা করার উপর। তাঁর মতে স্বদেশীয় সাহিত্য এবং স্বদেশের ইতিহাসই যথার্থ জাতীয় গৌরব। সুতরাং এ-দুয়ের প্রতি অবজ্ঞা পরিহার

করে তার উন্নতিসাধনে ব্রতী হওয়াকেই তিনি সব থেকে বড়ো কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন।

শি ক্ষা

কর্মসূত্রে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভূদেবকে ভারতের নানা অঞ্চলে শিক্ষা-বিভাগের নানা কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তাই শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁর অভিমতগুলি বিশেষ মূল্যবান।

এদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁর যেসব আলোচনা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিকে এভাবে ভাগ করা যায়: বিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা, স্বদেশীভাষা শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য এবং হিন্দু-মুসলমান।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত বলে ভূদেবের দৃঢ় ধারণা ছিল। অধীত বিষয়ের মূল বক্তব্যটুকু ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়াই যথেষ্ট। অযথা তাদের স্মৃতিশক্তির উপর পীড়ন করা অবাঞ্ছনীয়।[৯]

ছাত্রদের যাতে বহু বিষয়জ্ঞতা বাড়ে সেজন্য শুধু সাহিত্য না পড়িয়ে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শেখানোও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞানালোচনাই যে উন্নতিসাধন ও সভ্যতার একমাত্র মূলাধার ও বীজমন্ত্রস্বরূপ ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"[১০]

বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া আধুনিক শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ শিক্ষাবিদ্ ভূদেব একথা বুঝতে ভুল করেন নি। প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান যাতে অর্জিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক রচনার উপর তিনি জোর দিতেন। তিনি নিজেও এই উদ্দেশ্যে পুস্তক রচনা করেছেন। (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১ম ও ২য় ভাগ)।

উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ছাড়া কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হতে পারে না। যাঁরা শিক্ষাজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাঁদের পক্ষেই সম্ভব উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন করা। ভূদেবের মতে এই উপযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন দেশের শিক্ষক সম্প্রদায়। শিক্ষকগণ নির্বাচক হলে গ্রন্থকাররাও গ্রন্থরচনায় যত্নবান হবেন ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের উন্নতি হবে।[১১] কিন্তু কোন্ ধরনের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকগণ নির্বাচন করবেন সে বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। গণিতবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি নির্বাচন করবেন শিক্ষকগণ কিন্তু সাহিত্যগ্রন্থ নির্বাচন করবেন

যাঁরা প্রকৃত সাহিত্যবেত্তা তাঁরা।[১২] তিনি মনে করতেন—নীরস বাক্যরচনা কখনো ছাত্রদের পড়ানো উচিত নয়।

ভালো ছাত্র তৈরী করার জন্য প্রয়োজন ভালো শিক্ষকের। এই উপযুক্ত শিক্ষক তৈরীর জন্যই নর্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূদেব এই নর্ম্যাল স্কুল-গুলিকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল নর্ম্যাল স্কুলে দেশীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা যেন শেখানো না হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলা ভাষা। বেহার দেশে হিন্দি ভাষা, উড়িষ্যা দেশে উড়িয়া ভাষা, আসাম দেশে আসামী ভাষা, সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালী ভাষা ইত্যাদি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে যাতে শিক্ষকগণ উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত হন সেজন্যই তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকে অবশ্যপাঠ্য করার প্রয়োজনীয়তার উপরও ভূদেব জোর দিতেন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শুধু যে বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার এদেশবাসীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হতো তা নয়—এর অন্যদিকও ছিল। সেযুগে বিদেশী শাসকের সঙ্গে প্রজাদের যোগাযোগের সেতু ছিলেন এই ইংরেজী শিক্ষিত স্বদেশবাসীগণ। রাজদরবারে প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য এঁরা সহায়তা করতে পারতেন। "উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৩] এছাড়া এডুকেশন গেজেটের নানাস্থানে নানা প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। আসামে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলাভাষা। (১৮৭২খ্রী)। সে সময় নূতন লেঃ গবর্ণর নিযুক্ত হলে আসামে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভূদেব আসামবাসীকে এই সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষার মাধ্যম আসামী ভাষা করার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। এমনকি আবেদনপত্র কিভাবে রচিত হবে তিনি তাও তৈরী করে দেন। এর ফলে তাঁকে অনেক অপ্রিয় আলোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি অবিচলিত থাকেন।[১৪]

বিহারে ফারসী ভাষা উঠিয়ে হিন্দী ভাষার প্রতিষ্ঠা করে ভূদেব তাঁর এই আন্তরিকতার পরিচয় দেন।[১৫]

তিনি আর একটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তা হলো সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক করার জন্য তিনি জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন দেশীয় ভাষাসমূহের প্রকৃত

উন্নতির জন্য এবং ইংরেজী ভাষার যথার্থ সহভাষারূপে সংস্কৃতের চর্চা রাখা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া পাশ্চাত্য ভাব ও আচারের যে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল তাকে উপযুক্তভাবে প্রতিরোধ করতে হলে সংস্কৃত শেখানো অবশ্য কর্তব্য।

সে সময় আমাদের দেশে মুসলমান সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষায় হিন্দুদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টা ভূদেব সমর্থন করতেন। মুসলমানদের তিনি ভারত সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করতেন। তিনি তাই বিশ্বাস করতেন মুসলমানরা যদি শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকেন তাহলে ভারতসমাজই দুর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য আলাদা বিদ্যালয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তিনি তার কঠোর প্রতিবাদ জানান। তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু-মুসলমান কারো জন্যই আলাদা বিদ্যালয় থাকা অবাঞ্ছনীয়। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলিই শুধু বৃদ্ধি পায়—শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে জাতিবৈর দূর করা ও পরস্পরের মনোভাব অনুধাবন করা তা ব্যর্থ হয়।[১৬]

কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য গবর্নমেণ্ট যখন প্রকৃত কার্যকরী অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন—ভূদেব তখন তার পূর্ণ সমর্থন করেছেন। এমনকি তাঁরা যাতে ইংলণ্ডে গিয়ে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে পারেন সেজন্যও গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৭] সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের যাতে নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষিত হয়, ভূদেব সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিচারবুদ্ধিতে তিনি যে মানসিক স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। শিক্ষাসম্বন্ধীয় তাঁর বিভিন্ন মতামতের মধ্য দিয়ে তাঁর এই মানসরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত ভূদেবের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো—'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি'—এই রচনাটি। ১৮৮২ খ্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ যে ভাষণ দেন তারই উপর এই রচনা। এতে ভূদেব যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন আজ তা নির্মম সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গবর্ণর-জেনারেলের বক্তব্য ছিল তিনটি :

১। আত্মোন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতি করা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

২। পল্লবগ্রাহিতা-দোষ পরিহার করে গাঢ়তা ও চিন্তাশীলতা প্রভৃতি গুণ উপার্জন করা হলো দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

৩। স্বদেশীয় বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনসাধনই ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকারের স্কুল-কলেজ স্থাপনের লক্ষ্য।

ভূদেব এই তিনটি অভিমতের সমর্থনে তাঁর নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন।

ভূদেবের মতে এই সব দোষ থেকে মুক্ত করে এদেশে শিক্ষাপ্রসারের প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন সাধন।

পল্লবগ্রাহিতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

১। নিজেদের শিক্ষকই যখন পরীক্ষক হন তখন ছাত্রগণ পুস্তকের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শিক্ষকের টিপ্পনীর প্রতিই বেশী মনোযোগী হয়। এতে ছাত্রদের শিক্ষা প্রগাঢ় হয় না এবং তাদের সর্বদেশদর্শিতা জন্মায় না।

২। সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপরে রচিত বিভিন্ন টীকা ও উপটীকার সমষ্টি। ভূদেবের ভাষায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রচিত এই সব টীকা-টিপ্পনী 'ছারপোকার বংশের ন্যায়' দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

ভূদেব এই সব টীকা প্রচারের বিরোধিতা করেছেন। এই সব টীকাওয়ালা লোক পরীক্ষক হলে কি কি ক্ষতি হতে পারে তার আলোচনায় ভূদেব লিখেছেন :—

১। এসব টীকা কণ্ঠস্থ করে ছাত্রগণ ক্রমে অকর্মণ্য ও অলস হয়ে যায়।

২। নিজের চেষ্টায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আর তাদের প্রবৃত্তি হয় না।

৩। তারা পরের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে নিজেরা পার পাবার চেষ্টা করে।

৪। এই সব টীকা যে সর্বত্র বিশুদ্ধ হয়, তা নয়। অবিশুদ্ধ টীকা কণ্ঠস্থ করে ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই তাঁর দৃঢ় অভিমত—'শিক্ষার্থীদের পল্লবগ্রাহিতা দোষের উচ্ছেদ করিতে হইলে সর্বাগ্রে এই সকল টীকার মুণ্ডচ্ছেদ করা কর্তব্য হইতেছে। যাহাতে এইসকল টীকা-প্রণেতারা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইতে না পারেন, তাহার উপায় করা একান্ত উচিত হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে কোনরূপ উপায় অবলম্বিত না হইলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকিবে না।"[১৮]

সর্বশেষে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনসাধনই যে আধুনিক

শিক্ষার উদ্দেশ্য বড়লাটের এই উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করে ভূদেব আশা প্রকাশ করেছেন যে, দেশের প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হবেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভূদেব

এডুকেশন গেজেটে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই তিনটি গ্রন্থ হলো: প্রভাতসংগীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ও প্রকৃতির প্রতিশোধ। আর একটি গ্রন্থ—'কবিকাহিনী'রও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা হয়। সমালোচনাগুলি—প্রকাশের তারিখ যথাক্রমে প্রভাতসংগীত—২রা আষাঢ়, ১২৯০ সন, ১৫ই জুন ১৮৮৩ খ্রী, বিবিধ প্রসঙ্গ—১৯শে আশ্বিন ১২৯০ সন, ৫ই অক্টোবর ১৮৮৩ খ্রী, প্রকৃতির প্রতিশোধ—২১শে আষাঢ় ১২৯১ সন, ৪ঠা জুলাই ১৮৮৪ খ্রী এবং কবিকাহিনী—৩০শে কার্তিক ১২৮৪ সন ৫ই অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রী।

প্রভাতসংগীতের সমালোচনায় ভূদেব রবীন্দ্রনাথকে 'একজন প্রকৃত আর্যকবি' বলেছেন। তাঁর ভাষায়—"আযকবি বলিলাম এই জন্য যে তাঁহার হৃদয় প্রকৃতি-শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে যাহা প্রাচীন আর্যকবিদিগেরই করিত। আর্যকবির ভাব 'আমি প্রকৃতির'। ইউরোপীয় কবির ভাব, আজি-কালি যদিও একটু পরিবর্তিত হইতেছে কিন্তু আদৌ 'প্রকৃতি আমার'।"[১৯] ভূদেব তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রকৃতি আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ অনূদিত ভিক্টর হুগোর 'কবি' নামক কবিতাটি এবং 'আমি প্রকৃতির' সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের 'ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন।

ইউরোপীয় দৃষ্টিতে—"কবি ফুলবধূর বল্লভ, বনস্পতিদিগের গুরু" আর আমাদের কবি ফুলকুমারীর হাসি দেখিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্মসমর্পণ করিলেন।"

আর্যদৃষ্টি ও ইউরোপীয় দৃষ্টির পার্থক্য বোঝাতে ভূদেব আরো বলেছেন—জগতের একটি রমণীয় বস্তু থেকে আর্যকবির দৃষ্টি সারা জগৎশোভার প্রতি আকৃষ্ট হয়, মন তাতেই বিলীন হয়ে যায়। ইউরোপীয় নাহংকে অহং করতে চান, আর্য অহংকে নাহং মনে করেন। ইউরোপীয় কবিগণ তাই যা কিছু সুন্দর দেখেন সব কিছুকেই সেই 'অহং'-এর কেন্দ্রে আকর্ষণ করেন। 'একজনের ধর্ম আত্মসাৎ করা, অপরের ধর্ম আত্মবিসর্জন করা।' দুয়েরই উদ্দেশ্য এক হওয়া কিন্তু পথ

পরস্পর বিপরীত। তাঁর মতে—'অনেক নব্য বাঙ্গালী কবিদিগের ন্যায় রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রকৃত পথ ভুলেন নাই।'[২০]

আরো একটি কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙ্গা দিন
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধ-সত্য হয়ে যাবে লীন!

(মহাস্বপ্ন)

ভূদেবের মন্তব্য—বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ এই 'আধসত্য' কথাটির মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আধসত্যই 'মায়া'। 'এই মায়া লইয়া কতই তর্কবিতর্ক কতই গোলমাল, কত রূপক রচনার ছড়াছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে ইউরোপীয় দার্শনিক বর্কলি হইতে উহার টিপ্পনী বাহির হইতেছে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদায় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন—আর ইংরাজিনবিশের কাছে বর্কলির গ্রন্থ হইতে মায়াবাদ শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। মায়ার অর্থ—খণ্ডজ্ঞান বা আধসত্য।"[২১]

বিবিধ প্রসঙ্গ

"যিনি প্রকৃত কবি তিনি পদ্যই লিখুন আর গদ্যই লিখুন তাঁহার রচনা কবিত্বের উৎকৃষ্ট অলংকার দ্বারা অবশ্যই ভূষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভাসম্পন্ন প্রকৃত কবি। তাঁহার লিখিত এই গদ্যময় বিবিধ প্রসঙ্গে যথেষ্ট কবিত্ব আছে। এমন একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রন্থকারের রুচির ঐকান্তিক পবিত্রতা, মানবচক্ষের সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণসকল পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লক্ষিত না হয়। আমরা বাঙ্গালাভাষায় আজিকালি অনেকানেক প্রবন্ধ পুস্তক প্রণীত হইতেছে দেখিতেছি। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ইংরেজী রিবিউ বা ম্যাগাজীনের আদর্শানুযায়ী। সেগুলিতে লেখার খুব চোট—খুব আড়—খুব ভঙ্গী দেখা যায়, কিন্তু সেগুলিতে লোকের মনের ভাব নিতান্ত অস্ফুট থাকে এবং পড়িবার সময় যেন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা শব্দে গ্রথিত কি একটা ইংরাজী জিনিস পড়িতেছি এরূপ বোধ হয়। আর বিজাতীয় নামের ছড়াছড়ি এতই থাকে যে তাহা দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইতে হয়।

"এই বিবিধ প্রসঙ্গ সেরূপ জিনিস নহে। এইটি সত্য সত্যই একটি বঙ্গীয় অতি নির্মল অবিকৃত হৃদয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করে। এই পুস্তকখানি পাঠকের

মনের সহিত তাঁহার প্রকৃত মাতৃভাষায় কথা কয়। অতি সরল মাতৃভাষা, কিন্তু ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, আর্য, অত্যুন্নত অত্যুদার প্রাচীন পৈতৃক ভাব।"[২২]

গ্রন্থটির নানা স্থান থেকে মোট সাতটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ভূদেব তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

"সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জনে অবিস্থিতিপূর্বক মানব সুখী হইতে পারে না, প্রকৃতি দমনের পিচ্ছিল পথে মানুষ চিরকাল স্থিরপদে থাকিতে শক্ত হয় না, পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকে।·····এই ভাব, এই চিত্র অতি-রঞ্জনের আশ্রয় ব্যতিরেকে এই কাব্যে অঙ্কিত করা হইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী এই কাব্যের নায়ক। প্রথমতঃ বৈরাগ্যাবলম্বনের কৃতকার্যতা অনুভব করিয়া সে দম্ভী হয়, কিন্তু পরে সংসারের মোহমন্ত্রে পুনরায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শাদা কথায় এই শাদা ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি, তাঁহার কবিতা লিখিবার প্রণালীতে একটু পৃথক ধরণ একটু নবীনত্ব আছে বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। যে ভাবই ব্যক্ত করুন, তাহার কবিতাগুলি মিঠা লাগে। অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা না থাকিলেও ভাবের উদ্দীপনা ও ভাষার প্রসাদগুণে তাহার কবিতার সৌন্দর্যাধান হয়। এই গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে এরূপ ভাব ব্যক্ত করিতেছি না। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াও তদীয় পদ্যরচনার প্রতি এই ভাব আমাদের হৃদয়ারূঢ় হইয়া আছে।"[২৩]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্পর্কে ভূদেবের প্রধান বক্তব্য হলো এই যে, 'অতিরঞ্জনের আশ্রয় ব্যতিরেকেই' এই কাব্যের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই তিনটি আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভূদেবের যে অভিমত জানা যাচ্ছে তা হলো,—

১। রবীন্দ্রনাথ 'আযকবি',

২। একজন প্রতিভাসম্পন্ন প্রকৃত কবি,

৩। রুচির ঐকান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষের সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতি তাঁর লেখার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লক্ষিত,

৪। "একটি বঙ্গীয় অতি নির্মল অবিকৃত হৃদয়ের মনের ভাব" তাঁর লেখায় প্রকাশিত। বিদেশীর নকল নয়,

৫। "প্রকৃত মাতৃভাষা"য় লেখা,

৬. কবিতা লেখার প্রণালীতে "একটু পৃথক ধরণ, একটু নবীনত্ব", আছে,

৭. "অংলকৃত" করার চেষ্টা ছাড়াই "ভাবের উদ্দীপনা ও ভাষার প্রসাদগুণে" তাঁর কবিতার "সৌন্দর্যাধান হয়।"

৮. 'যে ভাবেই ব্যক্ত করুন' তাঁর কবিতাগুলি 'মিঠা লাগে'।

ভূদেব যখন এই অভিমত প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্তই তরুণ। (বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স)। কিন্তু সেই সময়েই রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্ব ভূদেবের রসিক চিত্তকে আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রজীবনে উপনিষদের যে প্রভাব মুখভাব তারই প্রকাশকে ভূদেব বলেছেন 'আর্যভাব'। সমসাময়িক-কালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বিশেষ রূপটি অমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কবিমন এবং কবিভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভূদেব সহজেই চিনতে পেরেছিলেন। বাংলাসাহিত্যে একজন প্রকৃত কবির আত্মপ্রকাশকে তিনি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সে সময় বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে যে নানাবিধ রচনা প্রকাশিত হতো, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাকেই ভূদেবের মনে হয়েছে "প্রকৃত মাতৃভাষায় লেখা।[২০] সেই সঙ্গে কবির 'রুচির ঐকান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষের সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতি' তাঁকে মুগ্ধ করেছে।[২৫] আসলে ভূদেবের নিজেরও ছিল এই তিনটি বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যশিল্পী হিসাবে দুজনের মধ্যে কোনো তুলনার প্রশ্ন ওঠে না। তবু সাহিত্য-রসিক হিসাবে ভূদেবেরও ছিল রুচির ঐকান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষের সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতি। বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে সংস্কৃত নাটকের এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত অন্যান্য সমালোচনায় ভূদেবের এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্বল। এই বৈশিষ্ট্য-বলেই এক সহৃদয় আর এক সহৃদয়ের হৃদয়-সংবাদ এত সহজে বুঝতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয়লগ্নে তাঁর আভ্যুদয়িক রচনায় ভূদেব ছিলেন অগ্রগণ্য পুরুষ। সাহিত্য সম্পর্কে ভূদেবের সহৃদয়তার এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। •

স্বীয় সম্পাদিত সাময়িকপত্রে সাময়িক সাহিত্য সমালোচনায় ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র :

এডুকেশন গেজেটে সাহিত্য সমালোচনার একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল। বঙ্গদর্শনেও কিছুদিনের জন্য এ ধরনের একটি বিভাগ প্রচলিত হয়েছিল।

এই বিভাগে সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনা করা হতো। এই সব সমালোচনা থেকে সম্পাদকদ্বয়ের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এই আলোচনায় আমরা সেই সব গ্রন্থকেই বেছে নিয়েছি যেসব গ্রন্থ সম্পর্কে দুজনেই নিজের নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের তালিকা—

কাব্যকদম্ব, কবিতাহার, অবকাশরঞ্জিনী, বৃত্রসংহার—এই কয়টি কাব্যগ্রন্থ।

হেমলতা—নাটক।

বাঙ্গালার ইতিহাস, সেকাল আর একাল—প্রবন্ধ।

বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—২য় খণ্ড—সাহিত্যের ইতিহাস।

'কাব্যকদম্বে'র কবির নাম গঙ্গাচরণ প্রধান। এটি একটি বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতাগ্রন্থ। বঙ্গদর্শনে (বৈশাখ ১২৮০) লেখা হয় যে, গ্রন্থখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত। "বিদ্যালয়ে পাঠের জন্য এই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। তাহার অনুপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। বিস্তারিত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।" অপর পক্ষে এ সম্পর্কে ভূদেব লেখেন (এডুকেশন গেজেট ২২শে ভাদ্র ১২৭৯ সন) 'বালকদের জন্য পুস্তক কি প্রকার হইলে বালকদের সুপাঠ্য হয় তাহা শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীরা বলিতে পারিবেন। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে এই গ্রন্থখানিতে রসের ভাগ নিতান্ত অল্প এবং নীরস কাব্য রচনা কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ কাহারও হস্তে প্রদান করা কর্তব্য নহে।"

ভূদেব ও বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়।

উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পুনরায় ধরা পড়ে 'কবিতাহার' (জনৈক হিন্দুমহিলার প্রণীত) নামক কবিতাগ্রন্থের সমালোচনায়। কবি অল্পবয়স্কা মহিলা বলেই ভূদেব গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন (এ. গে. ৯ই চৈত্র ১২৭৯), কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শন ১২৮০) সমালোচনা করেছেন কাব্যগ্রন্থটি সুপাঠ্য বলে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশবর্ষীয় বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোনো স্ত্রীর হইলেও প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোনো পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত।"

নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হলে বঙ্গদর্শনে তার সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১২৮০ সনের বৈশাখ সংখ্যায়, আর এডুকেশন গেজেটে দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সনের ১২ই আশ্বিন তারিখে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে গীতিকাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন। সমালোচনার শিরোনামা ছিল 'গীতিকাব্য'। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা করেন। যদিও 'মোহিনী সৃষ্টির' গুণে 'চিরস্মরণীয়' হবার মতো কবি ছিলেন না নবীনচন্দ্র তবু বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে তিনি সুকবি। তিনি লিখেছেন—"কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণপথে আইসে। এই কবির সেই শব্দপ্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলিন আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাই উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট করেন। 'অবকাশরঞ্জিনী'র যে-কোনো স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।"

তুলনায় ভূদেব কিন্তু অনেক বেশি কঠোর। অবকাশরঞ্জিনীর (২য়ভাগ) সমালোচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো—

"অবকাশরঞ্জিনী"র কবি একজন লব্ধনামা এবং সামযিক-কবি। সময়ের রুচি অনুসারে তিনি সরস পদ্য লিখিতে বিলক্ষণ পটু। এক্ষণে এদেশের লোকের মনোভাব যেদিকে প্রবল, এ কবির লেখনীর গতিও সেইদিকে প্রসর। ইহার ভাব গভীর, ভাষার লালিত্য তত নহে। অতি গম্ভীর স্থলেও 'চডাৎ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিল তখন"। চড়াৎ করিয়া ইত্যাদি রূপ গ্রাম্যশব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার প্রতি নিশ্বাসে স্বদেশহিতৈষণা প্রবাহিত হয়। সে দেশহিতৈষণা এক্ষণকার শিক্ষিত সাধারণের ন্যায় অতি অভিব্যক্ত, অতি বিশাল। কিন্তু অধিক বিস্তৃত হইলে নদী তত গভীর হইতে পারে না, ভূমির অধিক অন্তরে স্থান পায় না। সন্তানের প্রতি স্নেহ সকলেরই থাকা উচিত এবং পিতামাতার প্রতি ভক্তিও সকলের রাখা বিধেয়। কিন্তু সেই স্নেহ কিছুমাত্র মনে রাখিতে না পারিয়া সব প্রকাশ করিয়া ফেলিলে ছেলে আদুরে হয়, স্নেহের ফলে যে সন্তানের হিত, তা প্রায় হয় না। ভক্তিও কিছু চাপিয়া রাখিতে না পারিলে লোকে 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' মনে করে। বস্তুত সকলেরই সংযম আবশ্যক। একেবারে খোলা কিছুই ভালো নহে। গূঢ়তা সৃষ্টি-প্রকরণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। গূঢ়তা সৌন্দর্যেরও সৌন্দর্যাধায়ক। অট্টহাসি অধিক ভালো লাগে, না, স্মিত অধিক সুন্দর? যাঁহারা যুবতীর কটাক্ষ ভালোবাসেন খোলা চাওনি না উপান্ত দৃষ্টি তাঁহাদের অধিক মনোহর হয়? যে কারুণ্য হা হতোস্মি বোল অপেক্ষা কেবল চক্ষুর জলে প্রকাশ পায় সচরাচর তাহা অধিক মনোহারী ও দয়োদ্রেককারী হইয়া থাকে। প্রৌঢ়া অপেক্ষা মুগ্ধা অধিক মনোজ্ঞা হয়, তাহার কারণই এই, মুগ্ধতায় গূঢ়ত্ব অধিক।"

"মেঘের আড়ালে শশী বজ্রভেদী রূপ।"

বলতে দ্বিধা নেই যে, নবীনচন্দ্রের কাব্যবিচারে বঙ্কিমের চেয়ে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গিই অনেক বেশী সমর্থনযোগ্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় মাঘ ১২৮১ সনে আর এডুকেশন গেজেটে ১লা ফাল্গুন ১২৮১ সনে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব দুজনেই হেমচন্দ্রকে মধুসূদনের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করেন তাতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লেখেন—"মধুসূদনেব ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রেব বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি অনন্তধামে যাত্রা কবিয়াছেন কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমবা কখনও বোদন কবিব না।" ভূদেবেব শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে 'বৃত্রসংহাবে'র সমালোচনায়। সমালোচনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ভূদেব হেমচন্দ্রেব 'আশাকাননে'রও সপ্রশংস সমালোচনা কবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব দুজনেই বৃত্রসংহারের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। হেমচন্দ্র অসম্পূর্ণভাবে কাব্যটি প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটিব 'বীতিমত সমালোচনায়' প্রবৃত্ত হতে পারেননি। কাবণ অংশমাত্র দেখে সম্পূর্ণের দোষগুণ বিচাব করা চলে না। তিনি বলছেন—"তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগেব যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখেব ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তে স্বীকাব করিবেন যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না। এরূপ কাব্য সর্বদা জন্মে না।"

তৃতীয় সর্গে বৃত্রাসুব সম্পর্কে 'পর্বতেব চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই উক্তিটিকে বঙ্কিমচন্দ্র মিল্টনের যোগ্য বলেছেন। তাঁর মতে "বৃত্রসংহার কাব্যমধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিটি সর্গের পরিচয় দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ভূদেবের অভিমত যেটুকু জানা যায়, তা বিশেষ প্রশংসামুখর। তাঁর মতে উপাখ্যানটি মহাকাব্যের সুন্দর উপযোগী। তিনি লিখেছেন—"বৃহৎ কাব্যরচনার উপকরণ আহরণে এত শক্তি আছে পাঠকগণ নূতন দেখিবেন। ক্ষুদ্র কাব্যরচনায় তাঁহার শক্তি যে অদ্বিতীয়, অথবা প্রায়-অদ্বিতীয়, তাহা পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধ আছে। ভারতসংসগীত ও ভারতবিলাপ নামে যে দুটি প্রস্তাব এই কাগজে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সদৃশ গীতিকাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই। এ দুয়ের পূর্বপ্রচারিত ও পশ্চাৎপ্রচারিত অন্য যে সকল ক্ষুদ্র কাব্য হেমবাবুর হাত

হইতে বাহির হইয়াছে তাহাতে তাঁহার যশের পূর্ণ পোষকতাই করিয়াছে। এক্ষণে মহাকাব্য রচনায় হেমবাবুর ঈদৃশ কৃতকার্যতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তবে মাইকেলের একাধিপত্য অপ্রতিহত রহিয়াছে। তথাপি হেমবাবু শতসহস্র ধন্যবাদের যোগ্য। তিনি মাতৃভাষাকে এরূপ অপূর্ব রত্নে ভূষিত করিয়াছেন বলিয়া পাঠকসমাজের চিরকৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।”

দেখা যাচ্ছে বৃত্রসংহার সম্পর্কে ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই মোটামুটি একমত।

হেমলতা নাটক—রচয়িতা হরলাল রায। এ. গে. ১২৮০ কার্তিক, বঙ্গদর্শন—৩০শে, মাঘ ১২৮০।

‘হেমলতা’ নাটকটির বিচার করতে গিয়ে ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই সাধারণভাবে নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাটি দীর্ঘতর। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত নাটকের অভাব সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে তারপর তিনি হেমলতার প্রসঙ্গে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে আবার উত্তরচরিত ও শেক্সপীয়রের নাটকের কথাও এনেছেন।

ভূদেবের মতে—“ইহার উপাখ্যান রচনাটি মিষ্ট হইযাছে। পাত্রগণের কথোপকথনে বাজে কথা কম আছে। গ্রন্থকারের যেটি অভিপ্রেত ছিল, আদ্যন্ত তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপাখ্যানটি রচনা করিয়াছেন এবং তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাত্রগণকে কথোপকথন করাইযাছেন। ইহাতে নাটকখানি বেশ আঁটা-সাঁটা হইযাছে। এটিই আমাদের বিবেচনায় প্রধান গুণ।...

“যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিক থাকিত তবে এই গ্রন্থখানি অপূর্ব হইত। প্রকৃত কবিত্বশক্তি অধিক না থাকিলেও এ গ্রন্থখানি পাঠোপযোগী হইয়াছে। কেবল পাঠোপযোগী নহে, অন্য নাট্যকারগণের আদর্শস্থলীয় হইযাছে। অন্য নাট্যকারগণের কবিত্বশক্তিও নাই, ভালোমন্দ বিবেচনাও নাই। কবিত্বশক্তি জন্মাইয়া দিবার সামগ্রী নহে, ভালোমন্দ বিবেচনা জন্মাইয়া দিতে পারা যায়। এবং ভালোমন্দ বিবেচনা জন্মিলে কবিত্বশক্তির যদি ছিটেফোঁটা থাকে তাহাও কিছু বাড়িতে পারে।··· ইহা অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী হইযাছে।”

হেমলতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ভূদেবেরই অনুরূপ। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। ভূদেব বলেছেন—হেমলতার উপাখ্যানটি সার্থক রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, হেমলতা নাটক না হযে উপন্যাস হয়েছে। কারণ অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিভাবে চালিত হয় তাই দেখানো নাটকের ধর্ম। আর বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিভাবে চালিত হয় তা দেখানো উপন্যাস-

রচয়িতার কাজ। হেমলতা নাটকে অন্তঃপ্রকৃতির কোনো ঘাতপ্রতিঘাত নেই। এই অভিমত প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র হেমলতাকে রসপূর্ণ উপন্যাস বলেছেন। তাঁর মতে "ইহার ভাষা সুন্দর সরল। উপন্যাসটি সুন্দর গ্রথিত। অশ্লীলতাদি কোনো দোষ ইহাতে নাই। ...যাহা হউক সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, হেমলতা নাটক এখনকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। ইহার পাঠকালে মনোমধ্যে নানারসের উদয় হয়, এবং বোধ হয় অভিনীত হইলে সম্পূর্ণ মনোরঞ্জক হইবে।"

হেমলতা উপাখ্যান রচনার পারিপাট্য এবং এর অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্কে দুজন সমালোচকই একমত।

প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এ গে. ৩রা মাঘ ১২৮১, বঙ্গদর্শন মাঘ ১২৮১

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কৃত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' সম্পর্কে ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারপর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান বক্তব্যকে কিছুটা উদ্ধৃতি সহযোগে সংক্ষেপে তুলে দিয়েছেন। তবে লেখক "বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করায়" তিনি আক্ষেপ করেছেন—"যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এবং রাজকন্যা দান করিতে পারে সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

তারপর তিনি বলছেন—'মুষ্টিভিক্ষা হউক কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন, এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে, ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।" তিনি আরো বলেছেন যে ইংরেজিতে এই গ্রন্থের তুল্য বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ নেই। এটি শুধু বালকদের জন্য নয়—বড়দেরও পড়বার মতো।

প্রকৃত ইতিহাস কেমন হওয়া উচিত বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা বলেননি। ভূদেব তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ কি হওয়া উচিত তারই নির্দেশ দিয়েছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য সামান্যই আছে। তাঁর মতে—

"কয়েকটি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতকে ইতিহাস বলিতে আমাদের

ইচ্ছা হয় না। যাহাতে জাতীয়-জীবনচরিত বর্ণিত হয়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। তাহা জাতিবিশেষেরই উদয় উন্নতি ও অবনতির চিত্র। জীবনচরিতে যেমন কালভেদে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাভেদ এবং জ্ঞান ও ধর্মের বিকাশ প্রদর্শিত হয়, তেমনই কালে কালে জাতিবিশেষের অবস্থা জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, প্রকৃত ইতিহাসে তাহা চিত্রিত থাকে। এরূপ ইতিহাস পড়িতেও ভালো লাগে এবং ইহা হইতে অনেক উপদেশও সংগ্রহ করা যায়। এ প্রণালীতে ইতিহাস লেখা ইংবাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার নামগন্ধও নাই। কিন্তু সম্প্রতি বাজকৃষ্ণবাবু যে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ইহাতে এই বৃহৎ ব্রতেব স্চনা হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসই' ইতিহাস। ভূদেব আরো গভীবে প্রবেশ কবে বলেছেন, যাতে 'জাতীয় জীবনচবিত বর্ণিত হয়' তাই 'প্রকৃত ইতিহাস'। ইতিহাস সম্পর্কে ভূদেবেব এই দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে অনেক প্রাগ্রসব।

সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু।

রাজনাবায়ণ বসু ভূদেবের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। শুধু সহপাঠীই ছিলেন না—হিন্দু কলেজে যে কয়েকজন সহপাঠী তাঁব অন্তবঙ্গ ছিলেন—বাজনারায়ণ তাঁদেরই একজন।

রাজনারাযণ বসু তাঁর গ্রন্থটিতে বাঙালীব অনুকরণপ্রিয়তার নিন্দা কবেছেন। বাঙালীর এই অনুকরণপ্রিয়তা ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেবই কাছে নিন্দিত মনে হয়েছে। দুজনেই রাজনারায়ণের গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। তবে ভূদেব প্রশংসার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা সোচ্চার। দুজনেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে বাঙালীর প্রকৃত মঙ্গলকামী বলেই লেখক নব্য বাঙালীর অনুকরণ-প্রিয়তাকে আঘাত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করেন—রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়াছেন বাঙ্গালীর হিতার্থে।" ভূদেব লিখেছেন—"রাজনারায়ণবাবু সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই যেমন প্রাচীন লোকে করিয়া থাকে সেকালকে একাল অপেক্ষা ভালো বলিয়াছেন। কিন্তু যতই বলুন, তাঁহার ভালোবাসা যে একালের প্রতিই অধিক তাহার চিহ্নসমূহ প্রতিপদেই লক্ষিত হয়। এরূপ প্রাচীনতা আমাদিগের চক্ষে বিশেষ আদরণীয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে অনুকরণের দোষ-গুণ আলোচনা করে প্রকৃতপক্ষে একটি

নূতন প্রবন্ধই রচনা করেছেন। তাতে তিনি মানবজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস থেকে দেখিয়েছেন যে, অনুকরণই উন্নত শিক্ষার প্রথম সোপান। তবে অন্ধ অনুকরণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এবং অনুকরণে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আলোচনার নাম দিয়েছেন 'অনুকরণ' এবং সূচনায় বাঙালীকে এক 'অদ্ভুত জন্তু' বলে তীব্র ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনার সূচনায় যে তীব্রতা অনুভূত হয়—পরিণতিতে তা অনেকটা শমিত।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজনারায়ণের গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু ভূদেব বলেছেন। ভূদেব লিখেছেন—

"রাজনারায়ণবাবুর এই পুস্তকে অনেকগুলি কৌতুককণা একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ হাস্যোদ্রেক হয়। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়েরও বিচার আছে—মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে আঘাত করিয়া চিন্তাকে জাগরিত করিয়া দেয়। এবং সর্বত্র এমত একটি সূক্ষ্ম কিন্তু সুদৃঢ় আশার সূত্র গ্রথিত আছে যে, তদ্দর্শনে মনের প্রফুল্লতা জন্মাইয়া দেয়। আমাদিগের বিবেচনায় এইটিই এই পুস্তকের সর্বপ্রধান গুণ।"

ভূদেব এ প্রসঙ্গে একই লেখকের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের কথাও বলেছেন। এ দুখানি গ্রন্থেই দেশীয় জনগণের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবের সঞ্চার অনুভূত হয়। সমালোচক শেষে মন্তব্য করেছেন—"আড়ে গেলা, যা সাহেবী তাই ভালো, এমন মনে করা অবিধেয়—এই প্রতীতি জন্মিতেছে। রাজনারায়ণবাবু স্বদেশীয়দিগের মনের এই গতিটি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহার সম্বর্ধনের উপায় করিলেন। অতএব তিনি অবশ্যই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন।"

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ২য় খণ্ড—শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন রচিত। এ. গে. ৭ই ভাদ্র ১২৮০ সন। বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১২৮০।

এই গ্রন্থটির সমালোচনা করতে বঙ্কিমচন্দ্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই অনিচ্ছার যে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি সম্বন্ধে তীব্র বিরোধিতাই প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমখণ্ড সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে যে সমালোচনা করা হয়—দ্বিতীয়খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন সে সম্পর্কে কিছু শ্লেষসূচক মন্তব্য করেন। তাতে বলা হয়—"যদি বঙ্গদর্শনের ন্যায় কোনো সমালোচক আমার গ্রন্থের প্রশংসা করেন ভালোই। আর যদি অপ্রশংসা

করেন তবে বুঝিব যে সম্পাদকের গ্রন্থের সম্ভবাতিরিক্ত প্রশংসা করি নাই বলিয়াই তিনি আমাদের গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র একে কৌশল বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

"বস্তুত এ কেবল কৌশল নহে। ১৭০ পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্টই পবিচয় দিয়াছেন যে, তিনি সমালোচকদিগেব ভয়ে বিশেষ ভীত। আমবা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। অতএব তাঁহাব প্রতি পক্ষপাতী হইয়া আপন কর্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইলাম। কারণ যদি আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তবে আমরা অপ্রশংসা করিতেই বাধ্য হইতাম। গ্রন্থকারেব সহিত প্রায় কোথাও আমাদের মতেব ঐক্য নাই। আমাদিগেব বিবেচনায় উল্লিখিত 'ভূতত্ত্ববিচাব' ভিন্ন এইরূপ ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। প্রাচীন সংস্কাবগুলির বক্ষা করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়-বিশেষেব নিকট উভয় গ্রন্থই বিশেষ প্রশংসিত হইবে।" পবিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকেব একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁকে চরম আঘাত হেনেছেন। সেই উক্তিটি হলো—"মনুষ্যজাতিব স্বভাব যাহারা উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাবা বেশ বুঝিতে পারেন আমরা যাঁহার নিকট অত্যধিক উপকৃত হই তাঁহাকে দেখিতে পাবি না—দ্বেষ কবি।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলছেন—"আমরা এ গ্রন্থেব বিশেষ প্রশংসা করি নাই তাহার এক কারণ এই যে, তাহা হইলে ন্যায়রত্ন মহাশয় মনে করিবেন, এ ব্যক্তি আমার এ প্রশংসনীয় গ্রন্থে অত্যধিক উপকৃত হইয়াছে দেখিতেছি—অতএব এ আমার প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার দ্বেষক মনে করেন ইহা আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা সুতরাং একারণেও আমরা গ্রন্থ প্রশংসায় বিরত হইলাম।" বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই শেষ করেননি। উপসংহারে তিনি বলছেন—

"ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুশিক্ষক, আমরা অবগত আছি। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় তাঁহার ছাত্রেরা বিশেষ উপকৃত। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও একটু সতর্ক থাকিবেন—ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট; বিদ্যালয়ের চারিপার্শ্বে ইষ্টকাদি যেন পড়িয়া না থাকে।" বঙ্কিমচন্দ্র যদি এর চেয়ে সোজাসুজি গ্রন্থটির সমালোচনা করতেন তাহলে বোধ হয় সে সমালোচনা এতখানি মর্মভেদী হতো না।

ভূদেব মোটামুটিভাবে গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন, তবে মধুসূদন সম্পর্কে ন্যায়রত্নের মন্তব্যের সঙ্গে ভূদেব একমত হতে পারেননি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"ন্যায়রত্ন মহাশয় গ্রন্থ সমালোচনায় জানিয়া শুনিয়া কাহার প্রতি অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু একটি স্থলে তাহার ব্যভিচার আছে। তিনি মহাকবি মধুসূদন দত্তের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি সাধারণতঃ লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে দেখাইবার নিমিত্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য'টি সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া উল্লিখিত মহাকবির গ্রন্থের সমালোচনার মধ্যেই নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি যে ছুছুন্দরী কাব্যের প্রণেতা তৎপ্রণীত কাব্যের ওরূপে প্রয়োগ হইয়াছে দেখিলে অবশ্যই ক্ষুব্ধ হইতেন।

"যাহা হউক সুপ্রসিদ্ধনামা ডাক্তার জনসন মহাকবি মিল্টনের কবিত্বশক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রথিত আছে মহামহোপাধ্যায় মম্মটভট্টও 'নৈষধ-চরিত মহাকাব্যে কেবল দোষালঙ্কারের স্থলই দেখিয়াছিলেন। জনসন এবং মম্মট-ভট্টের ন্যায় আমাদিগের ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও কেহ বা মিল্টন এবং কেহ বা শ্রীহর্ষ থাকিতে পারেন। জনসন মিল্টনকে ছাড়িয়া পোপকে সর্বপ্রধান কবি বলিয়া ধরিয়াছিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও তেমনি কেহ একজন পোপ থাকিতে পারেন।"

বিরোধিতার ক্ষেত্রেও ভূদেব কতখানি সংযত হতে পারেন এই সমালোচনাটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ন্যায়রত্নের সমালোচনার দোষনির্ণয় করতে গিয়ে ভূদেব লিখছেন—

"সর্বশেষে বক্তব্য এই আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যতই কেন ভক্তি করি না, যতই কেন ভালোবাসি না, তিনি গ্রন্থ সমালোচনাকার্য যে সবস্থলেই প্রকৃত পদ্ধতিক্রমে করিতে পারিয়াছেন তাহা বলিতে পারিব না। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গেলে মানসচক্ষু প্রীতিবিস্ফারিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই শাখা-পল্লবসমন্বিত গ্রন্থরূপ বনস্পতির আমূল দৃষ্ট হয় এবং কোন্ বৃক্ষ কোন্ বীজ হইতে উৎপন্ন তাহাও জানিতে পারা যায়। গ্রন্থের প্রকৃত কাজ কি জানিতে পারিলেই সমালোচক কৃতকার্য হয়েন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সমালোচিত কোন গ্রন্থেরই বীজ আবিষ্কৃত করিতে যত্ন করেন নাই। বোধ হয় সেরূপ সমালোচনাসহ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এখনও জন্মে নাই এবং তাহা যতদিন না জন্মিতেছে—ততদিন বাঙ্গালার সাহিত্যসমালোচনাও পল্লবগ্রাহিতায় পর্যবসিত থাকিবে।"

ভূদেবের এই সমালোচনা কঠোর, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে তা কতখানি সংযত এবং মার্জিত তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেবের সাহিত্যবিচারের পার্থক্য আর একটি ক্ষেত্রেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংকলন সম্পর্কে।

১২৯২ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব বিচারকালে বঙ্কিমচন্দ্র অশ্লীলতা সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের উল্লেখ করে লেখেন—

"অন্যের ন্যায় ঈশ্বরগুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমবা তাঁহাকে বেকসুব খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকাব করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই এত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেকস্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদয, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহাব মার্জনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই কদর্য, অশ্লীল ও বিরক্তিকর অংশগুলিকে মার্জনা করতে পারেন নি। তাই তিনি সে সব অংশ বাদ দিয়ে, কোথাও বা সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করে, এই কবিতা সংকলন প্রকাশ কবেন। তিনি লেখেন—

'ঈশ্বরগুপ্তেব যে অশ্লীলতাব কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমবা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া করিয়া বাহিব করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতা দোষের জন্যই একেবাবে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেবের মতবিরোধ। ভূদেব কবির সমগ্র রচনার অখণ্ড প্রকাশেব পক্ষপাতী। ১২৯২ বঙ্গাব্দেব ২৯শে কার্তিক (১৩ই নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রী) এডুকেশন গেজেটে ভূদেব বঙ্কিম-সম্পাদিত গ্রন্থটির সমালোচনা করেন। এর পূর্বেই (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন) গ্রন্থটিব প্রকাশ-সংবাদকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেজন্য সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো।

"কবিতা সংগ্রহ—এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ প্রভাকর পত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু মৃত কবির একটি সংক্ষিপ্ত-জীবনী এবং তৎপ্রণীত কবিতাবলীব একটি সমালোচন লিখিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর তেজী কলমের মুখ হইতে যে সমালোচন নিঃসৃত হইয়াছে তাহার সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি অবশ্যই সকলের গ্রাহ্য হইবে—সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরগুপ্ত Realist এবং Satirist ছিলেন অর্থাৎ তিনি স্বভাবোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি-প্রিয় ছিলেন বা তাহাই করিতে পারিতেন। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরগুপ্ত "মেকি দেখিতে পারিতেন না"—অথবা (সাদা কথায়) মেকি ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইতেন না। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা 'বদজোবান' মাত্র,

আন্তরিক দুষ্টভাবের ব্যঞ্জক নহে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কবিতাগুলির সুবহুস্থলেই পদ এবং পঙ্‌ক্তিকে পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়া ছাপাইয়াছেন। ওরূপ করা ভালো হয় নাই। এ বই তো পাঠশালার বালক-বালিকারা পড়িবে না—ইহাতে পরিত্যাগের গর্হিত প্রণালীটি অবলম্বিত না হওয়াই উচিত ছিল। সেদিন দেখিলাম ঘনরামকৃত শ্রী-ধর্মমঙ্গল গ্রন্থেরও ঐরূপে সম্পাদনকার্য নির্বাহিত হইয়া গিয়াছে। বেথুন আর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন মূল কবিদিগের গ্রন্থে বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থের অন্য মূল আর থাকিতেছে না, সে সকলে ঐরূপ আচরণ বড়ই প্রগল্‌ভতা বলিয়া বোধ হয়।"

ভূদেব 'মূল'কে রক্ষা করার পক্ষপাতী। তাছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের ব্যক্তিগত রুচি ও বিচারবোধকে তিনি বেশি মূল্য দিতেন। তার বিরোধিতা তাঁর দৃষ্টিতে প্রগল্‌ভতা মাত্র।

এই সব সমালোচনা থেকে দেখা গেল—সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তুলনা-মূলক বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়াও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি সমালোচ্য বিষয়টিকে অবলম্বন করে এক একটি নূতন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রায়ক্ষেত্রে সমালোচনাগুলির এক একটি শিরোনামা থাকতো। দোষনির্ণয়ে এবং সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ক্ষমালেশহীন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সমালোচনার ভাষায় একটা তীব্র গতি অনুভূত হয়। সর্বোপরি সমস্ত সমালোচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।

অপর পক্ষে, ভূদেব সর্বদা সমালোচ্য বিষয়ের মূল উদ্‌ঘাটনে মনোযোগী ছিলেন। রসের বিচারই তাঁর কাছে ছিল বেশি মূল্যবান। তাঁর সমালোচনা-রীতিতে তুলনামূলক বিচার অল্পই থাকতো। মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক সংযত এবং মঞ্জুভাষী। শ্লেষ ব্যঙ্গ নেই বললেই চলে। উদার ও অপক্ষপাত দৃষ্টিতে তিনি সমকালীন সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ভূদেবের তিরো-ধানের পরে শতাব্দীর তিন পাদ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও মনে হয় সাহিত্যবিচারে ভূদেবের অনেক বক্তব্য আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভূদেবের সমালোচনাগুলি আজো এডুকেশন গেজেটের পাতার মধ্যেই রয়ে গেছে। এডুকেশন গেজেটের দুষ্প্রাপ্যতা সমালোচক ভূদেবকে জানার পক্ষে দুরূহ বাধার সৃষ্টি করেছে। এসব সমালোচনার অনেকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার যোগ্য।

আমরা এডুকেশন গেজেট থেকে ভূদেবের সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি এখানে সংকলন করলাম।

১. "কাব্যগ্রন্থে কবিতার উপযোগী শব্দের প্রয়োগ করাই উচিত।"

দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' সমালোচনায়—৩১শে ভাদ্র ১২৭৮, ১৫।৯।১৮৭১ খ্রী.

২. "আজিকালি বাঙ্গালা লেখার এইরূপ ধরণই হইয়াছে। প্রায় কেহই ভাষার লালিত্য এবং সুগঠন বিষয়ে অধিক দৃষ্টিপাত করেন না। বর্ণনীয় অংশে কোন ত্রুটি না হইলেই হইল, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আধার কদর্য হইলে মণিরও শোভার ব্যাঘাত করে।"

মুর্শিদাবাদ পত্রিকার সমালোচনায়—২২শে বৈশাখ ১২৭৯, ৩।৫।১৮৭২ খ্রী,

৩. "আমরা কাব্যরসপ্রিয় ব্যক্তিগণকে যত বিশ্বাস করি কাব্যরসদ্বেষী কঠোর প্রকৃতির লোকদিগকে তত বিশ্বাস করি না।"

(লর্ড নর্থব্রুকের কাব্যপ্রিয়তা সম্পর্কে)—১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, ২৮।৫।৭২ খ্রী.

৪. "এই গ্রন্থখানিতে রসের ভাগ নিতান্ত অল্প এবং নীরস কাব্য রচনা কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কাহারও হস্তে প্রদান করা কর্তব্য নহে।"

গঙ্গানারায়ণ প্রধানের 'কাব্যকদম্ব' সমালোচনা—২২শে ভাদ্র ১২৭৯, ৬।৯।১৮৭২ খ্রী.

৫. "অনুকরণের চেষ্টা করিয়া কেহ কখনই কৃতকার্য হয় নাই। রচনা করিবার রীতি মনে ভাবোদয় হইবার রীতির অনুযায়ী হইয়া থাকে। মনের ভিতরে যে প্রণালীতে ভাবের উদয় হয়, সেই প্রণালীতে বাক্যের গাঁথনি হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত এক ব্যক্তির রচনাপ্রণালী কোনক্রমে অন্যের উপযোগী হইতে পারে না। যদি কেহ নিজ স্বভাবের উপর অত্যাচার করিয়া পরের প্রণালী অবলম্বন করে তাহা হইলে তাহার রচনা নিশ্চয় অসার হয়।"

অশ্বিনীকুমার ঘোষের 'পদ্যচন্দ্রিকা'র আলোচনায়—২৯শে ভাদ্র ১২৭৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭২

৬. "কেবল নির্দোষ আমোদ নহে, কাব্যরসের আলোচনাতে যে প্রকার

আত্মোন্নতি সাধন হয়, আমাদের বিবেচনাতে সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। আমরা কাব্যরসকে উন্নতিমাত্রের মূলীভূত-কারণ জ্ঞান করি। যে কারণ-বারির উপর এই জগৎ সংসার ভাসমান রহিয়াছে, কাব্যরস তাহারই রূপভেদ মাত্র। এ প্রকার পদার্থের আলোচনাতে যাঁহারা স্ব স্ব অবকাশকাল অতিবাহিত করেন, তাঁহারা অতিপ্রশংসনীয়, অতি সাধু। আমরা যদিও ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কাহাকে ইন্দ্রিয় সুখচর্চার অনুচিত পক্ষপাতী দেখিতাম, তাহা হইলে আমরা ক্ষুব্ধ হইতাম বটে, কিন্তু নিন্দা করিতাম না, নিন্দা করিতে ইচ্ছাও হইত না।"

চন্দননগরে মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটক দেখে

১৪ই বৈশাখ ১২৮০, ২৫শে এপ্রিল, ১৮৭৩।

৭. "প্রকৃতপ্রস্তাবে গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গেলে মানসচক্ষু প্রীতি-বিস্ফারিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই শাখাপল্লবসমন্বিত গ্রন্থরূপ-বনস্পতির আমূল দৃষ্ট হয় এবং কোন্ বৃক্ষ কোন্ বীজ হইতে উৎপন্ন তাহাও জানিতে পারা যায়। গ্রন্থের প্রকৃত বীজ কি জানিতে পারিলেই সমালোচক কৃতকার্য হয়েন"।

রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ২য় খণ্ড' সমালোচনা।—৭ই ভাদ্র ১২৮০, ২২শে আগ,, ১৮৭৩

৮. "সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন, বীররসে উৎসাহ স্থায়ীভাব, আমরা প্রকারান্তরে বলি, যে রস বীর্য প্রদর্শনে উৎসাহ জাগাইয়া ক্রমেই তাহার পুষ্টিসাধন করে সেই বীররস।"

বীরসুন্দরী, ১মভাগ (যাদবানন্দ রায়) সমালোচনা—৬ই আষাঢ় ১২৮১, ১৯শে জুন ১৮৭৪

৯. "কয়েকটি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতকে ইতিহাস বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। যাহাতে জাতীয় জীবনচরিত বর্ণিত হয়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস, তাহা জাতিবিশেষেরই উদয়, উন্নতি ও অবনতির চিত্র। জীবনচরিতে যেমন কালভেদে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাভেদ এবং জ্ঞান ও ধর্মেরও বিকাশ প্রদর্শিত হয়, তেমনই কালে কালে জাতিবিশেষের অবস্থা, জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, প্রকৃত ইতিহাসে তাহাই চিত্রিত থাকে। এরূপ ইতিহাস পড়িতেও ভাল লাগে এবং ইহা হইতে অনেক উপদেশও সংগ্রহ করা যায়।"

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—প্রথমশিক্ষা—বাঙ্গালার ইতিহাস: ৩রা মাঘ ১২৮১, ১৬।১।১৮৭৫

১০. "গূঢ়তা সৃষ্টি প্রকরণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। গূঢ়তা সৌন্দর্যেরও

সৌন্দর্যাধায়ক। অট্টহাসি অধিক ভালো লাগে, না, স্মিত অধিক সুন্দর? যাঁহারা যুবতীর কটাক্ষ ভালবাসেন খোলা চাওনি না উপান্ত দৃষ্টি তাঁহাদের অধিক মনোহর হয়? যে কারুণ্য 'হা হতোস্মি' বোল অপেক্ষা কেবল চক্ষুর জলে প্রকাশ পায় সচরাচর তাহা অধিক মনোহারী ও দয়োদ্রেককারী হইয়া থাকে। প্রৌঢ়া অপেক্ষা মুগ্ধা অধিক মনোজ্ঞা হয়, তাহার কারণই এই মুগ্ধতায় গূঢ়ত্ব অধিক।"

কাব্যের সৌন্দর্য বিষয়ে—নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' (২য়ভাগ) সমালোচনা—১২ই আশ্বিন ১২৮৫ সন, ২৭।৯।১৮৭৮

১১. "কাব্য ও উপন্যাসসকল সন্নীতি সমন্বিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু নীতিগ্রন্থের ন্যায় এরূপ গ্রন্থে গ্রন্থকর্তা নিজে বক্তার ন্যায় নিজ-মুখেই সমস্ত সদুপদেশ শেষ করিয়া যাইতেছেন এবং উদাহরণস্বরূপে গল্পটি বলিতেছেন এবম্প্রকার হওয়া উচিত নহে।...

"নীতিমার্গ প্রদর্শন উপন্যাস বা আখ্যায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও গ্রন্থকার নিজমুখে ব্যক্ত না করিয়া সদুপদেশগুলি উপাখ্যানের সহিত এরূপভাবে অনুস্যূত করিবেন যেন সেগুলি অতর্কিতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। উপন্যাস রচনাকালে পাঠককে আপনার ছাত্র মনে করা গ্রন্থকারের উচিত নহে। ঈদৃশ গ্রন্থে পর পর বিষয় ও উদ্দেশ্যগুলি জানিবার কৌতূহল বৃদ্ধি করিতে পারিলে যেমন চমৎকারিত্ব হয়, বক্তব্য বিষয় পাঠক অগ্রে জানিতে পারিলে সেরূপ চমৎকারিত্ব থাকে না। ...উপন্যাস মধ্যে গ্রন্থে আখ্যায়িকা প্রধান এবং সমাজ-নীতি বা যে কোন নীতিবোধ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র হওয়া উচিত। মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ এবং কেবল সুরচিত গল্পেই সেই দৃষ্টান্তের অনেকটা কার্য করে।"

বিরাজ মোহন—সমালোচনা, ৩০শে কার্তিক ১২৮৫, ১৫।১১।১৮'৮

১২. "ইতিহাস পাঠে বিজ্ঞতা, সাহিত্য পাঠে রচনা নৈপুণ্য ও প্রবীণতা, পদার্থবিদ্যা পাঠে গাম্ভীর্য, ধর্মনীতি পাঠে ধীরতা এবং তর্কশাস্ত্র পাঠে বিচার-পটুতা জন্মে।"

শাস্ত্রালোচনা। ৩০শে বৈশাখ ১২৮৯, ১২।৫।১৮৮২

১৩. "আমরা সর্বান্তঃকরণে কহিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর বাঙ্গালীদের জীবন রাখা উচিত। সাহিত্য আমাদের একটি অবলম্বস্বরূপ না হইলে ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে আমাদের কখনও প্রবৃত্তি হইবে না।"

বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর একটি ব্যবসায় হওয়া উচিত—১৮ই আষাঢ় ১২৮৮, ১।৭।১৮৮১

১৪. "যাঁহারা কেবল সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন, তাঁহারা সাধারণের বরণীয় ও শ্রদ্ধেয়। কোন দেশের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে সাহিত্যের উন্নতি করা উচিত। সাহিত্যের উন্নতি না হইলে দেশ উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হয় না। সকল দেশের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।"

সাহিত্যজীবী—২৭শে ফাল্গুন ১২৮৮

১৫. "দেশের প্রথাবিশেষকে ও সংস্কারবিশেষকে স্নেহ না করিলেও দেশের প্রতি স্নেহের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভাষাকে না ভালোবাসিলে বোধ হয় দেশকে যথার্থ ভালোবাসা যায় না।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি—১৬ই আশ্বিন ১২৮২।

উল্লেখপঞ্জী

১ ভূদেব চরিত, ১ম ভাগ
২. তদেব পৃঃ ১৬৭
৩. তদেব, পৃঃ ৩৪০
৪. তদেব, পৃঃ ৩৪৩
৫ তদেব, পৃঃ ৩৪৩
৬. তদেব, পৃঃ ৩৪২
৭. এডুকেশন গেজেট, ২৬শে পৌষ ১২৮৬ ৯।১।১৮৮০
৮ তদেব, ১৪ই পৌষ ১২৯৫, ২৮।১২।১৮৮৮
৯ তদেব, ১৮ই কার্তিক ১২৭৮, ৪।১১।১৮৭১, 'মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা'।
১০ তদেব, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯, ২৪।৫।১৮৭২
১১. তদেব, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৯, ২৯।১১।৭২ 'বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক'।
১২ তদেব, ২৮শে বৈশাখ ১২৮০, ৯।৫।১৮৭৩ 'পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে'।
১৩. তদেব, ২৫শে ফাল্গুন ১২৭৯, ৭।৩।১৮৭৩
১৪ তদেব, ১লা বৈশাখ ১২৭৯, ১২।৪।৮২ 'আসামে বাংলাভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে সম্পাদকীয়; ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, ২৪।৫।১৮৭২ 'আসামী ভাষার উপরে আক্রোশ'; ৮ই আষাঢ় ১২৭৯, ২১।৬।৭২ প্রাপ্তপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত জনৈক আসামবাসী বাঙালীর চিঠির উপর সম্পাদকের মন্তব্য।
১৫ ভূদেব চরিত

১৬ এডু গেজেট ১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৭৯, ২৯।১১।১৮৭২ 'মুসলমানদিগের শিক্ষাবিধান'

১৭. তদেব, ২৬শে কার্তিক ১২৮৩, ১০।১১।১৮৭৬ 'মুসলমানদিগের দাওয়া'
তদেব, ৭ই আষাঢ় ১২৮০, ২০।৬।১৮৭৩

১৮ তদেব, ১২ই চৈত্র ১৮৮৮, ২৪।৩।১৮৮২

১৯ তদেব, ২রা আষাঢ় ১২৯০, ১৫।৬।১৮৮৩

২০ তদেব,

২১. তদেব,

২২ তদেব ১৯শে আশ্বিন, ১২৯০, ৫।১০।১৮৮৩

২৩ তদেব ২১শে আষাঢ় ১২৯১, ৪।৭।১৮৮৪

২৪ তদেব ১৯শে আশ্বিন ১২৯০, ৫।১০।১৮৮৩

২৫ তদেব,

চতুর্থ অধ্যায়

ঐ তি হা সি ক উ প ন্যা স

সাধারণ কথা

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যে ভূদেবের দান সামান্য নয়। শুধু প্রবন্ধকার-রূপেই অবশ্য তাঁর সাহিত্যকৃতির বিচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে একথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন। কথাসাহিত্যের উপন্যাস শাখায় তিনি একটি বিশেষ পথের পথিকৃৎ। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম রচয়িতা তিনি। তাঁর এই কৃতিত্বের কথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে,[১] ডঃ সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'[২] গ্রন্থে ভূদেবকে—'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র প্রবর্তকরূপে স্বীকার করেছেন।

ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' দুটি কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। ভূমিকাতেই ভূদেব লিখেছেন—

"ইংরাজীতে 'রোমান্স অব হিস্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। Romance of History : India Vol. I বইটি জে. এইচ. কণ্টারের (J. H. Caunter) লেখা। মূল গল্পের সঙ্গে ভূদেবের রচনার তুলনামূলক পাঠভেদ বিশ্লেষণ করলেই মৌলিক রচয়িতারূপে ভূদেবের কৃতিত্বের বিচার করা সহজ হবে।

২

স ফ ল স্ব প্ন

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম কাহিনীটি 'সফল স্বপ্ন'। এটিকে রোমান্স অব হিস্টরির প্রথম গল্প 'দি ট্রাভেলার্স ড্রিম' (The Traveller's Dream)-এর ভাবানুবাদ বলা চলে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূমিকায় ভূদেব বলেছেন—"গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়—ইহাই এই পুস্তকের

উদ্দেশ্য।" সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কিছু নিজস্ব বক্তব্য সংযোজন করেছেন, কোথাও বা বিবরণকে কিছু সংক্ষিপ্ত করেছেন। এছাড়া কাহিনীটিকে আদ্যন্ত মোটামুটি মূল গল্পটির ভাবানুবাদই বলা চলে। কাহিনী দুটির তুলনামূলক পাঠভেদ আলোচনা করলেই এই উক্তির যথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

মূল এবং অনুবাদ দুটিই তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল গল্পটি ৬১৩০টি শব্দে রচিত আর বাংলা গল্পটির শব্দসংখ্যা ৩৩৬১। অর্থাৎ বাংলায় গল্পটি অনেক সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

মূল গল্পের সংক্ষিপ্তসার :

কান্দাহারের মহারণ্যে একাকী ভ্রমণ করার সময় জনৈক পথিকের অশ্বটি সিংহের আক্রমণে নিহত হয়। পথে আহার্য হিসেবে একটি সদ্যজাত হরিণশিশু সংগ্রহ করে পথিক কিছুদূর গিয়ে অগ্নিসংযোগে আহার্য প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হলে, সহসা সন্তানস্নেহে আকুলা করুণনয়না হরিণমাতাকে দেখে হরিণশিশুকে মুক্তি দেয়। এর ফলে পথিকের চিত্তে একটি অপূর্ব তৃপ্তি ও আনন্দের ভাব জাগ্রত হয়। রাত্রে বিশ্রাম-কালে স্বপ্নে দেবদূত তাকে এই ঘটনার জন্য ভবিষ্যতে এক সাম্রাজ্যলাভের বর প্রদান করেন এবং প্রাণীমাত্রের প্রতি এই মনোভাব বজায় রাখতে আদেশ দেন।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু করে পথে এক দস্যুদলের কবলে পড়লে তারা পথিকের সর্বস্ব অপহরণ করার উদ্দেশ্যে তাকে আহত করে। তারপর তার সুগঠিত দেহ দেখে তাকে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে। পরে পথিক কিছু সুস্থ হলে তাকে নিজেদের ব্যবসায়ে অংশীদার হতে আহ্বান জানায়। পথিক দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলে তাকে দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করে দেয়। দাস-ব্যবসায়ী চড়ামূল্যে তাকে বিভিন্ন জনের কাছে বিক্রয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। তখন অর্থের বিনিময়ে পথিককে আত্মমুক্তি ক্রয় করতে বলে। যে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, পথিক তা অর্থমূল্যে ক্রয় করতে সুদৃঢ় অসম্মতি জানায়। অবশেষে খোরাসানের অধিপতি আলুপ্তগীন তাকে উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করে নেন।

পথিক আলুপ্তগীনের ক্রীতদাস হয়ে আসার অল্পদিনের মধ্যে আপন প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করে। প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় তাদের আদি-বাসস্থান পারস্যদেশ ছেড়ে তার পূর্বপুরুষ তুরস্ক দেশে চলে যায়। তদবধি তারা তুর্কী। তার পিতা দরিদ্র হলেও ধার্মিক। পনেরো বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে ঘর

ছেড়ে এসে অবশেষে সে খোরাসানপতির সেবাদাসত্ব লাভ করেছে। সব শুনে আলুপ্তগীন তাকে উচ্চতবপদে উন্নীত করেন এবং অবশেষে সে আমীর-উল-ওমরাহ উপাধি লাভ করে সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়। তার যোগ্যতায় সাম্রাজ্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হয়।

কার্যকারণে সর্বদা অন্তঃপুরে যাতায়াত করতে করতে আলুপ্তগীন-কন্যা জহীরার প্রতি সে আকৃষ্ট হয় এবং জহীরাও একই আকর্ষণ অনুভব করে। পিতৃ-অনুমতি ছাড়া জহীরা বিবাহে অসম্মতি জানালে সে আলুপ্তগীনের অনুমতি নিয়ে জহীরাকে বিবাহ করে।

আবদুল মালিক সোমানির মৃত্যু হলে আলুপ্তগীনের অসম্মতিতে আবদুলের নাবালক পুত্র মনসুরকে সিংহাসনে বসানো হয়। আলুপ্তগীন জামাতাকে নিয়ে গজনী আক্রমণ করলে মনসুর এক সেনাবাহিনী পাঠান। তাও পরাজিত হয়। পনেরো বছরের মধ্যে আলুপ্তগীন এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্বাধীন অধীশ্বর হন। আলুপ্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু আইজাক সিংহাসনে বসেন। আবু আইজাক ভগ্নীপতিসহ বোখারায় উপনীত হলে মনসুর কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন ও তাঁকে গজনীর সুলতান হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। অল্পদিন পরে আবুর মৃত্যু হলে সর্বসম্মতিক্রমে জহীরার স্বামীই সিংহাসনারূঢ় হন এবং তাঁর নাম হয় সবুক্তগীন। তাঁরই পুত্র মামুদ গজনী ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান বিজেতা। এইভাবে বনপথে দেখা স্বপ্ন পথিকের জীবনে সফল হয়।

'সফল স্বপ্নে' ভূদেব এই কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে কেবল স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সম্পর্কে পথিকের মনে মনে প্রার্থনা করার মধ্যে দিয়ে পথিকের মাধ্যমে ভূদেবের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—"অবিনশ্বর ধর্মপদার্থসকল এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু" ভাবা উচিত নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভূদেব দস্যুদলের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, দস্যুপতির সঙ্গে পথিকের কথাবার্তা সংক্ষেপ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে শেষের ইতিহাস অনুক্ত। প্রণয় সম্পর্কে ভূদেবের নিজস্ব কিছু বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

৩

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম কাহিনী 'সফল স্বপ্ন' রচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় কোনো মৌলিকতার পরিচয় দেন নি। ঘটনা, সংলাপ বা কাহিনী কোনোটিকেই সৃষ্টি বলা চলে না। বরং অনুবাদই বলা

চলে—স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ। সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর ধর্মবোধ দ্বারা যে জীবনে জয়যুক্ত হওয়া যায় এই নীতিকথা প্রচারই ভূদেবের উদ্দেশ্য (ভূমিকা স্মর্তব্য) ছিল। ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রথম গুণ যে 'ঐতিহাসিকতা' ভূদেব এখানে তার বিচারের চেষ্টা করেননি—মূলকেই অনুসরণ করেছেন। কাহিনী বিস্তার, ঘটনার মাধ্যমে চরিত্রের ক্রমবিকাশ, সংলাপ, আকৃতি কোনোটিই উপন্যাসোচিত হয় নি। তাই এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার 'খসড়া' বলে আখ্যাত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাবানুবাদের বৈশিষ্ট্য বিচারের জন্য মূল আর তার অনুসৃতিরূপে তিনটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। প্রথম উদ্ধৃতি ও তার অনুসৃতি :

"It is far from the haunts of men, amid the deep recesses of the forest or on the summit of the distant mountain, that the nature is seen to develop the noblest features of her beauty. The stillness that reigns around the solemn repose of the scene not broken in upon by human associations nor interrupted by the voice of human intercourse, enhance the impression of grandeur produced by the sight of objects which cannot fail to elevate the soul to pious adoration of the great illimitable God of the universe."

The Traveller's Dream

(প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

"ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে—মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য গুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্যশালী জগৎকর্তার সন্নিধানে নীত হয়।"

সফল স্বপ্ন

(প্রথম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি ও তার অনুসৃতি :

"The robber laughed and turning to his comrades said, "Hear's a fellow that won't be plucked without fluttering; we must try blows to bring down the game, if he chooses to be deaf to persuation." "Come" said he, turning to the traveller, "get rid of that unsightly

bump upon your shoulders and show how straight a man you are when you stand upright without an encumbrance."

The Traveller's Dream

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

"তস্কর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগিগণকে কহিল—'এ বেটা বলে কি রে? এ যে মরিতে বসেও কার্দানি ছাড়ে না। ভাল, দেখা যাউক দুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে' এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল 'আইস তোমার পিঠ্-বোচকাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুব্জের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে। একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রূপখানি দেখাও।"

সফল স্বপ্ন

(দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ)

তৃতীয় উদ্ধৃতি ও তার অনুসৃতি :

As the Ameer-ool-omrah resided in her father's palace, Zahira had opportunities of seeiug him. They frequently met, they frequently conversed and such meetings and such conversations beg of mutual goodwill.…

It was imposible, they should frequently meet without that optical revelation which is invariably made where two hearts throb in unison , and when he was satisfied by the eloquent exchange of a certain tenderness not to be mistaken which the eye so legibly communicates when it is really and evidently felt that his passion for the lovely daughter of Aluptugeen was returned in full force, he no longer hesitates to declare his passion, which declaration was received with an approbation that excited him to a perfect delirium of joy.

The Traveller's Dream

(তৃতীয় অধ্যায়, ৮ম-৯ম পরিচ্ছেদ)

"প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময় রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে

উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রেই নয়নদ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়ি-যুগলের প্রীতি-প্রফুল্ল-নেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি ধারণ করে যে দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকশিত হইয়া উঠে এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধানমন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন।"

সফল স্বপ্ন

(তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

এই নির্বাচিত উদ্ধৃতি-ত্রয় থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে ভূদেব 'রোমান্স অব হিস্টরি'র মর্মানুসরণ করেছেন। তাঁর অনুবাদকর্মও ভাবানুবাদের সগোত্র। কিন্তু যেখানে ভাব ও ভাষার মাত্রাতিরেকী অত্যুক্তি আছে সেখানে স্বভাব-সংযত ভূদেব স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অতিকথনকে তিনি সর্বক্ষেত্রেই বর্জন করেছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতির সর্বশেষ বাক্যাংশের মূল "which declaration was received with an approbation that excited him to a perfect delirium of joy"—ভূদেব সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন।

অঙ্গুরীয় বিনিময়

সফল স্বপ্নের বিস্তারিত আলোচনায় দেখা গেল যে, এতে ভূদেবের মৌলিক সৃষ্টি-কুশলতার উল্লেখ্য কোনো পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসকার বলে ভূদেবের যে প্রতিষ্ঠা তা 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র জন্যেই। সমালোচকগণের অভিমতও একথারই সমর্থন করে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র মূলও নিহিত রয়েছে কণ্টারের 'রোমান্স অব হিস্টরি—ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে। প্রথম খণ্ডের শেষ গল্প "দি মাহরাট্টা চীফ" (The Mahratta chief) থেকে ভূদেব তাঁর কাহিনীর প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভূদেব কাহিনীবিন্যাসে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। নতুন ঘটনা, নতুন চরিত্র, নতুন সংলাপ ভূদেবের রচনায় মৌলিকতা এনেছে। কণ্টারের কাহিনীটি নিছক রোমান্স—অসম্ভব কল্পনায় গড়া। শিবজী চরিত্রকে এখানে বিকৃত করা হয়েছে—তাঁর সম্পর্কে আমাদের মনে যে 'ইমেজ' রয়েছে তা বিনষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু ভূদেব তা করেন

নি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ভূদেবের দৃষ্টিতে তা শিবজীর হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে। অথচ সেজন্য মুসলমানদের যে প্রকৃত দান, যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তাকে তিনি বিকৃত করেন নি। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখেই তিনি তার কাহিনী গড়ে তুলেছেন। তবু—যেহেতু তিনি "ঐতিহাসিক উপন্যাস" লিখতে বসেছেন, তাই উপন্যাসের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মনোভাবে ও সংলাপে কিছু পবিবর্তন ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাব দ্বাবা ববীন্দ্রনাথ যাকে 'ঐতিহাসিক বস' বলেছেন তা ক্ষুণ্ন হয়নি।

এবাবে মূলগল্প আর ভূদেবেব গল্প—দুটিব তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। তবে তাব আগে ভূদেবেব একটি কথা আমবা আব একবার স্মবণ কবতে চাই। ভূমিকায় ভূদেব লিখেছেন—

"অঙ্গুবীয় বিনময"-নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।' এই কিয়দংশ কথাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু কাঠামোটিই তিনি ইংবেজি গল্পটি থেকে নিয়েছেন—তাকে পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর নিজের কল্পনা।

মূলকাহিনী

কণ্টারের

The Mahratta Chief

সংক্ষিপ্তসার :

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্য দিয়ে পিতা আবঙ্গজেবেব কাছে মাদুরায় যাবার পথে বাদশাহ-কন্যা রোসিনারা শিবজী কর্তৃক অপহৃতা হন।

নিকটেই শিবজীর এক দুর্ভেদ্য দুর্গে রোসিনারাকে সংগোপনে কিন্তু যথোচিত মর্যাদায় রাখা হলো। একমাত্র দুর্গের বাইবে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যেতে তাঁর ওপর বাধা রইল না। চতুর্থ দিন সকাল পর্যন্ত রোসিনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার পর স্বয়ং শিবজী তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন শিবজীর দুর্গে তিনি বন্দিনী। শিবজী আরো জানালেন, কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা মোগল সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই রোসিনারাকে অপহরণ

করার কারণ। রোসিনারা বাদশাহ-কন্যা, পার্বত্য দস্যুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের হীনতা স্বীকারে তিনি তীব্র আপত্তি জানালেন। শিবজী বললেন, তিনি দস্যু নন, সেই পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীন সম্রাট তিনি, ইতিহাসে তাঁর কীর্তিকাহিনী লেখা থাকবে। তাঁকে বিবাহ করায় কোনো অসম্মান নেই। এই বলে প্রতিদিন সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবজী প্রতিদিন রোসিনারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে তাঁর প্রতিদিনের কাজ, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার, স্বপ্নের কথা জানাতেন। একদিন শিবজীর অনুপস্থিতির সুযোগে রোসিনারার রূপমুগ্ধ শিবজীর এক সেনানী রোসিনারার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করায় রোসিনারা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়। শিবজী ফিরে এসে সব শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও আহত করে দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে ফেলে দেন। এরপর তিনি রোসিনারাকে বিবাহ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সেই আহত মারাঠা সৈনিকের কিন্তু মৃত্যু হলো না। অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে সে শিবজীর দুর্গের নিকটতম মোগল শিবিরে উপস্থিত হলো। মোগল সেনাপতিকে শিবজীর সন্ধান বলে দিতে সে প্রতিশ্রুত হলো। স্থির হলো, কার্যসিদ্ধি হলে সে এক হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।

কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে সে মোগল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে শিবজীর দুর্গ অভিমুখে রওনা হলো। প্রথমে শিবজীর সামনে একাকী উপস্থিত হয়ে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর গভীর রাত্রে সৈন্যদলে কর্মরত তার এক ভাই-এর সঙ্গে পূর্বব্যবস্থা মতো মোগল সৈন্যদের প্রবেশের ব্যবস্থা করল। কিছু মোগল দুর্গে প্রবেশ করার পরে শিবজী সংবাদ পেলেন। মুক্ত অসিহস্তে তিনি ছুটে এলেন। বিশ্বাসঘাতক মারাঠা দুজনকে হত্যা করলেন। এবার শিবজী দেখলেন দুর্গ শত্রুর হাতে। তিনি ছুটে গেলেন রোসিনারার কাছে। মোগলদের হাতে রোসিনারার ভয়ের কোনো কারণ নেই, একথা জানা থাকায় শিবজী তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্যপথে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

মোগল সৈন্যদল দুর্গ জয় করে রোসিনারাকে আরঙ্গজেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। মোগল হারেমে পৌঁছলে রোসিনারার সন্তান সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পেল। আরঙ্গজেব তাঁর মুখদর্শন করলেন না। যথা সময়ে রোসিনারার একটি পুত্র জন্মালে

পুত্রটিকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানে সরিয়ে দেওয়া হলো। দুঃখে বেদনায় তাঁর নিঃসঙ্গ দিনগুলি কাটতে লাগলো।

চতুর্থ অধ্যায়

এরপর শিবজী পুনরায় নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেন এবং ক্রমশ তাঁর রাজ্যসীমা বাড়িয়ে চললেন। ছলে বলে কৌশলে নিজের শক্তিবৃদ্ধিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আরঙ্গজেব শঙ্কিত হলেন। শায়েস্তা খাঁকে শিবজীর বিরুদ্ধে পাঠানো হলো। ফলে শিবজীর শক্তি কিছু হ্রাস পেল। শায়েস্তা খাঁ শিবজীর রাজধানী পুণা দখল করে শিবজীর প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। সুযোগসন্ধানী শিবজী একদিন অতর্কিত আক্রমণে সেই প্রাসাদ উদ্ধার করলেন, পালাবার সময় শায়েস্তা খাঁর হাতের একটি আঙুল কাটা গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

এবার বীর রাজপুত মির্জা রাজা শিবজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হলেন। শিবজীর সব দুর্গ শত্রুর হাতে চলে গেল। শিবজী নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। তার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে এই প্রতিশ্রুতি পেলে শিবজী দিল্লীতে এসে বাদশাহ আরঙ্গ-জেবের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন।

আরঙ্গজেবের সভায় কিন্তু শিবজী প্রতিশ্রুত সম্মান পেলেন না। বরং তাকে কারারুদ্ধ করা হলো। তারপর রোসিনারার সহযোগিতায় এক ফুলওয়ালার সাহায্যে তার সঙ্গে পোশাক বদল করে শিবজী কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন। আরঙ্গজেব যখন একথা জানতে পারলেন তখন কন্যা রোসিনারাকেও আর হারেমে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তারপর পূর্ব ব্যবস্থা মতো রোসিনারা একটিমাত্র সঙ্গিনী নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে শিবজীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক বিপদ, অনেক দুর্গম পথ পার হয়ে অবশেষে নিজের রাজ্যে পৌছলেন।

রোসিনারার অন্তর্ধানের পর আরঙ্গজেব কঠিন অসুখে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন।

বাদশাহ পুনরায় সভায় উপস্থিত হলে এক সৌম্যদর্শন ষোড়শোত্তীর্ণ নবীন তরুণ তাঁর সভায় উপস্থিত হলো। সেই বয়সেই সে সব-রকম যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। বাদশাহ তার প্রতি একটু সস্নেহ পক্ষপাতিত্ব দেখালেন।

রাজনীতিতেও তার বিচক্ষণতা প্রকাশ পেল। অল্প দিনের মধ্যেই সভার সকলের কাছে সে ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠল।

সপ্তম অধ্যায়

স্বরাজ্যে ফিরে এসে শিবজী বিনা বাধায় তাঁর রাজ্যসীমা বাড়িয়ে চললেন। সব হারানো দুর্গ ফিরে পেলেন। দক্ষিণ ভারতে মোগলদের প্রধান বিরোধীশক্তি হয়ে উঠলেন। তারপর পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সুরাট দখল করে অনেক অর্থ লাভ করলেন।

আরঙ্গজেব সব শুনে শিবজীর বিরুদ্ধে একলক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠালেন। অন্যতম সেনাপতি হিসেবে গেল সেই নবীন তরুণ। পার্বত্যযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী শিবজীর কাছে মোগল বাহিনী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তখন একদিন সেই তরুণ বীর বিশহাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে শিবজীর পার্বত্যদুর্গ অভিমুখে রওনা হলো। তারপর একদিন এক গুপ্তস্থান থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীরে সে আহত হলে যন্ত্রণায় আর আক্রোশে সঙ্গীদের ফেলে রেখে একাই সামনে এগিয়ে গেল। তখন সেই সংকীর্ণ গিরিপথে এক মারাঠা সৈনিককে দেখা গেল। প্রশ্ন করে তরুণ জানতে পারলো যাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার তার আজন্মের সাধ, মারাঠা সেই শিবজী। দ্বৈত সংগ্রামে শিবজীর অস্ত্রে সে আহত হলো। শিবজী তাকে নিজের কোলে টেনে নিলেন। তার গায়ের রক্ত মোছার জন্য তার জামা খুললে শিবজী তার বুকের ডানদিকে একটি বর্শাফলকের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। অনুচরদের ডেকে এনে তাকে নিকটতম দুর্গে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষার আদেশ দিলেন।

জ্ঞান ফিরলে তরুণ বীর নিজেকে শত্রুশিবিরে সযত্নে শয়ান দেখতে পেল। তাকে রোসিনারার কাছে আনা হলো। শিবজী তরুণকে তার বক্ষোবাস সরাতে বললেন। তরুণ তাই করলে রোসিনারা কয়েক পলক স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দুহাত বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে তরুণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন এতোদিন পরে তাঁর হারানো পুত্রকে তিনি ফিরে পেলেন—আর পুত্র পেল তার পিতা-মাতাকে। তার বুকের ওই বর্শাফলকের চিহ্ন জন্মসূত্রে পাওয়া। তখন তরুণের সব কথা মনে পড়লো। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তার জন্মকে ঘিরে যে রহস্যজাল জড়িয়ে ছিল এতোদিনে তার উন্মোচন হলো। তারপর সুস্থ হলে সে মোগল বাহিনীতে ফিরে গেল। কিন্তু মোগল বাহিনীর রাজপুত শাখাকে প্রভাবিত করে সে শেষ

পর্যন্ত শিবজীর সঙ্গে যোগ দিল। তখন থেকে শিবজীর শক্তি পূর্ণতা পেল। ১৬৬০ খ্রীঃ শিবজীর মৃত্যু হলে তাঁর এই পুত্র শাম্ভজী সিংহাসনে বসলেন। রোসিনারাও অল্প দিনের মধ্যে পরলোক গমন করলেন।

অঙ্গুরীয় বিনিময়

সংক্ষিপ্তসার

প্রথম অধ্যায়ে ভূদেব কোনো নতুন ঘটনার সৃষ্টি করেননি। ভূমিকা স্বকীয়, কথোপকথন মূল অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। মূলে রোসিনারার অবসর যাপন ছিল সহচরীদের সঙ্গে গল্পকথায়, এখানে বিদ্যাচর্চায়। তাতে রোসিনারা চরিত্রের অসামান্যতার পূর্বাভাস সূচিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবজী-রোসিনারার প্রণয়পর্বের ক্রমবিকাশের ধারাটি মূলানুগ, কেবল একটি ঘটনা ভূদেবের সৃষ্টি। তাঁর কাহিনীতে মারাঠা সৈন্যের সঙ্গে দ্বৈতসংগ্রামে শিবজী বিশেষভাবে আহত হলে রোসিনারা প্রত্যহ তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং এভাবেই তাদের হৃদয়বিনিময় সুসম্পন্ন হয়েছে। ভূদেব উভয়ের মধ্যে বিবাহ ঘটাননি। গুরুজনের অনুমতি না নিয়ে এই বিবাহ মঙ্গলজনক হবে না ভেবে উভয়ে সেই অনুমতির অপেক্ষায় রইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এখানেও ভূদেব অনেক পরিবর্তন করেছেন। সেই আহত মারাঠা সৈনিক এখানে শিবজীকে গ্রেপ্তার করে দেবার জন্যে কোনো পুরস্কার গ্রহণে সম্মত হয়নি। তাছাড়া ভূদেবের কাহিনীতে সেই মারাঠার মৃত্যু শিবজীর হাতে হয়নি। আর রোসিনারাকেও আমরা দেখছি শাজাহানের সঙ্গে এক অবরোধে থাকতে, হারেমে নয়। শাজাহান চরিত্র ভূদেবের নিজস্ব।

চতুর্থ অধ্যায়

এখান থেকে ভূদেব মূলকে ছেড়ে নিজের মতো করে কাহিনীকে পরিণতির পথে নিয়ে গিয়েছেন। শিবজীর দুর্গ উদ্ধারপন্থাও ভূদেব নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন। সেই বিশ্বাসঘাতক মারাঠার পরিণতি ভূদেব অন্যভাবে দেখিয়েছেন। শিবজী দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করলে সেই মারাঠাকে মুসলমান হতে বলা হয়। সে তাতে রাজী না হয়ে তীর্থপর্যটনে বিশ্বাসঘাতকতারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে

তাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। শিবজী তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করলেন। তারপর সেই সেনানী এক আশ্চর্য ঘটনার কথা বলল। সে বলল, শিবজীর আরাধ্যা দেবী ভবানী অনুচরীদের নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলেন। শিবজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে তাকে তিরস্কার করে শাস্তিস্বরূপ গোরক্ত আর গোমাংস পানাহার করতে দিলেন। এমন সময় রামদাস স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সব শুনে সৈনিকটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পরের দিন রামদাস স্বামীর ব্যবস্থা মতো এক বিশাল মারাঠাবাহিনী মোগল শিবির আক্রমণ করল। রামদাস স্বামীর অনুপ্রেরণায় এবং স্বয়ং ভবানীপ্রদত্ত খড়্গের সাহায্যে সেই মারাঠা সৈনিক একক বীরত্বে মোগলদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করে; প্রধানত তারই কৃতিত্বে তাদের দল জয়যুক্ত হয়। এইভাবে কঠোর সংগ্রামে শ্রান্ত অবসন্ন হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল। আর তাতেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো। তখন রামদাস স্বামী যে খড়্গ দিয়ে মারাঠা সৈনিকটি যুদ্ধ জয় করেছে, সেই খড়্গটি শিবজীকে দিলেন। ভবানীপ্রদত্ত বলে সে খড়্গের নাম হলো 'ভবানী'। আজো সে খড়্গ সেতারা প্রদেশের ভূপাল বংশীয়দের দ্বারা পূজিত হয়।

রামদাস স্বামীর চরিত্রও এ কাহিনীতে ভূদেবের সংযোজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এবার শিবজীর বিরুদ্ধে পরাক্রমশালী সেনাপতি রাজপুত রাজা জয়সিংহ প্রেরিত হলেন। পার্বত্যযুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শিবজীর অনেক ক্ষতি হলো। কিন্তু তিনি মনোবল হারালেন না। হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে একাকীই রাজা জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন। তারপর তাঁর হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়, এ উদ্দেশ্যসাধনে রাজার সাহায্যও প্রার্থনা করলেন।

রাজা শিবজীর কথায় মুগ্ধ ও বিচলিত হলেন, কিন্তু তিনি শিবজীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন বলে বাদশাহকে কথা দিয়ে এসেছেন। তাই তখনই শিবজীর কথায় রাজী হতে পারলেন না। বললেন, তিনি যদি শিবজীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন, তাহলে, শিবজী বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী আছেন কিনা। শিবজী ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাজী হলেন।

রাজার সঙ্গে বিজয়পুর অভিযানে যেতে এবং আপাতত কিছু ক্ষতি স্বীকারেও শিবজী সম্মত হলেন। শুধু একটি অনুরোধ তিনি করলেন। রাজাকে বললেন— তার সেনাবাহিনীর বেতন যেন বাদশাহের কোষাগার থেকে না দেওয়া হয়। তার বদলে বিজিত ভূমির নির্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়। রাজা কিছু চিন্তা না করেই রাজী হলেন। পরবর্তীকালে এই চৌৎ আদায়ের নামেই মারাঠা-শক্তি নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল। সান্ধপত্র স্বাক্ষর করে বাদশাহের অনুমতির জন্য তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শিবজী রাজার সঙ্গে বিজয়পুর যাত্রা করলেন।

সপ্তম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আমরা শাজাহানকে দেখতে পেলাম। মূলে শাজাহান প্রসঙ্গ নেই। রোসিনারা শাজাহানের বন্দীজীবনের সঙ্গিনী হয়ে এলেন। শাজাহান শিবজীর সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে রোসিনারাকে শোনাতেন। রোসিনারাও আপন মধুর ব্যবহারে শাজাহানকে তুষ্ট রাখতেন। আরঙ্গজেবের সভায় শিবজীর আগমন-সংবাদ জানিয়ে শাজাহান রোসিনারাকে সভার চারিপাশে যে জালের আড়াল আছে, সেখান থেকে সভাগৃহের সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পরামর্শ দিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

শিবজী সভায় উপস্থিত হলে ঘোষণা করা হলো তাকে পাচহাজারি মনসবদারী দেওয়া হলো। শিবজী স্বাধীন রাজা, এতে অপমানিত হয়ে রাজার প্রতিশ্রুতির কথা বাদশাহকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আরঙ্গজেব জানালেন শিবজী পরাজিত, সুতরাং তাঁর সম্পর্কে কি করা হবে তা বাদশাহের ইচ্ছাধীন। শিবজীকে চিররুদ্ধ রাখাই ছিল বাদশাহের অভিলাষ। তাই সুকৌশলে তাঁকে তিনি নজরবন্দী করে রাখতে চাইলেন। বললেন, রাজার কাছ থেকে চিঠি পেলেই তিনি সসম্মানে শিবজীকে বিদায় দেবেন। ততদিন শিবজী বাদশাহের অতিথি হিসেবে নগর-পালের তত্ত্বাবধানে থাকুন। শিবজীও কম চতুর নন। তখনই রাজী হয়ে বললেন— রাজার উত্তর আসতে দেরী হবে। সুতরাং তিনি কয়েকজন মাত্র অনুচরকে কাছে রেখে সব সৈন্যকে ফেরত পাঠাতে চান। আরঙ্গজেব রাজী হলেন। চাতুরীতে শিবাজীকে পরাস্ত করতে পেরেছেন ভেবে আত্মতুষ্ট হলেন।

সেরাত্রে নিজের নিভৃতকক্ষে বসে আরঙ্গজেব সেনাপতি জয়সিংহের প্রভাব হ্রাস করার সঙ্কল্প করলেন। পুত্র হিসেবে অতীতে আরঙ্গজেব পিতা শাজাহানকে

প্রতারণা করেছেন। তাই পিতা হিসাবে এখন নিজের পুত্রকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। সুতরাং একই সঙ্গে পুত্রেরও প্রাধান্য হ্রাস করতে মনস্থ করলেন। পুত্রকে এক পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন—জয়সিংহ সহ সকল সেনাপতিকে একত্র করে তিনি যেন বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহলেই সেনাপতিদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পাবে। তারপর একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে ডেকে যথোচিত নির্দেশ দিয়ে সেই পত্রটি তার হাতে দিলেন। আর বললেন জয়সিংহ বাদশাহপুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হলে তাঁকে যেন এক বিশেষ মশলা দিয়ে পান খেতে দেওয়া হয়। এই বলে সেই বিশেষ মশলাটিও তার হাতে দিলেন।

নবম অধ্যায়

শিবজী সামান্য কয়েকজন অনুচরকে কাছে রেখে বাকী সৈন্যদের ফেরত পাঠালেন। তারপবে নিজে অসুস্থতার ভান করে বেশ কিছুদিন নগরপালের নির্দিষ্ট গৃহে বাস কবতে লাগলেন। তারপর একদিন নগরপাল এবং আরো কজনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। বাজারে এসে এক সন্ন্যাসীব সঙ্গে চোখোচোখি হলে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করে এলেন। কিছুদূর যাবার পর গুরু রামদাস স্বামীকে সশিষ্য বৃক্ষতলে বসে থাকতে দেখলেন। শিবজী কোনো কথা না বলে ফিরে যেতে চাইলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন যে অসুখের সময় তিনি মানত করেছিলেন সুস্থ হলে পূজা দেবেন। এখন এই সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁকে দিয়েই তাঁর স্বস্ত্যয়নাদি করাতে বাসনা জাগছে। নগরপাল সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সেকথা জানাতে সন্ন্যাসী ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তখন শিবজী গিয়ে অনেক অনুরোধ করে সন্ন্যাসীকে রাজী করালেন। তারপর তাঁরা ফিলে এলেন। এরপর থেকে প্রতদিন সেই সন্ন্যাসী (গুরু রামদাস স্বামী) হোমপূজাদি করতে লাগলেন আব নানা উপহার ফলমিষ্টি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শহরের বিশিষ্ট এবং সাধারণ মানুষেব মধ্যে বিতরণ করা হতে লাগলো। এভাবে শিবজী নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে রোসিনারারও মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন।

দশম অধ্যায়

বাদশাহের জন্মদিবস উপলক্ষে বরাবরের মতো সেবারও অন্তঃপুরে বাজার বসেছিল। শ্রেণী নির্বিশেষে পুরনারীরা এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছিল। এখানে অন্তঃপুরচারী পুরুষরা ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকারও ছিল না। পৌত্রীকে যদি কিছু আনন্দ দিতে পারেন এই ভেবে শাজাহানও এসেছিলেন

রোসিনারাকে নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে যখন দুজনে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন এক বারবনিতা একটি উষ্ণীষ আর একটি অঙ্গুরীয় নিয়ে সম্রাট-দুহিতার কাছে বিক্রয় করতে এলো। রোসিনারা তৎক্ষণাৎ তা শিবজীর বলে চিনতে পারলেন। মেয়েটিকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে রোসিনারা জিজ্ঞাসা করলেন এগুলি সে কোথায় পেল। স্বয়ং মালিকের কাছে, একথা বলে সে জানালো মালিক বলেছেন রোসিনারা আজো যদি তাঁকে ভুলে না গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যেন তাঁর সঙ্গে প্রস্থানের উপায় করেন। শাজাহান সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রোসিনারা জিজ্ঞাসা করলেন শিবজী নিজের মুক্তির কি উপায় করেছেন। মেয়েটি জানালো তা সে জানে না, তবে শিবজী তাঁকে বলেছেন রোসিনারার সম্মতি থাকলে তিনি যেন সেই রাত্রিশেষে এক বিশেষস্থানে শিবজীর সঙ্গে মিলিত হন—এই বলে রোসিনারার কানে কানে স্থানটির নাম বলল। এমন সময় শাজাহান এক দাসীর পোশাক এনে তাই পরে রোসিনারাকে মেয়েটির সঙ্গে পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু শিবজীর প্রকৃত মঙ্গল কোন পথে, তার সঙ্গে মিলনে না বিচ্ছেদে, এ চিন্তাই রোসিনারাকে ব্যাকুল করে তুললো। পিতামহের বার বার অনুরোধে তিনি জানালেন—শিবজী হিন্দু, তিনি মুসলমান। যদি আরঙ্গজেব নিজে তাদের বিবাহ দিতেন তাহলে তিনিই হতেন শিবজীর প্রধান সহায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি শিবজীর প্রধান শত্রু। তাছাড়া এ বিবাহ মারাঠাদের মনেও শিবজী সম্পর্কে বিরূপতা জাগিয়ে তুলবে। সেক্ষেত্রে এই ভিন্নধর্ম বিবাহ শুধুমাত্র বৈরিতারই সৃষ্টি করবে। যাঁকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তাঁকে এমনি করে আরো বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে তিনি কিছুতেই পারবেন না। এই বলে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে মেয়েটির হাতে একটি পত্র দিলেন। তারপর তার কাছ থেকে শিবজীর অঙ্গুরীয়টি নিয়ে নিজেরটি মেয়েটির হাতে দিলেন। মেয়েটি ফিরে গেল।

একাদশ অধ্যায়

সেদিন আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে সংবাদ পেয়েছেন জয়সিংহ নিহত আর বাদশাহপুত্র বিদ্রোহী হতে চেয়ে সেনাপতিদের বিশ্বাস হারিয়েছেন। এবার শিবজী ধ্বংস হলেই তিনি কণ্টকমুক্ত।

বাদশাহ তখন রোসিনারার কাছে একাকী উপস্থিত হলেন। শিবজীর কাছ থেকে আসার পর এই প্রথম তাঁর কন্যার কাছে আগমন। রোসিনারা একটু

আগেই শিবজীর দূতীকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে নিঃশব্দ-রোদনে সেই বেদনা সহ্য করছিলেন। এমন সময় আরঙ্গজেব তাঁর সামনে এসে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রোসিনারা কোনো উত্তর না দিয়ে আরো ব্যাকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন। তখন আরঙ্গজেব কন্যাকে পারস্যের শাহজাদাকে বিবাহ করার কথা বললেন। রোসিনারা উত্তরে পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের মতো চিরকুমারী থাকতে চাইলেন। আরঙ্গজেব এই উত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন, যাঁর কথা ভেবে কন্যার এই সঙ্কল্প তাঁর ছিন্নশিব কন্যাকে উপহার দেবেন। তখন আবো বেশী ব্যাকুল হয়ে রোসিনারা বললেন তিনি পিতার সব কথা মেনে নেবেন। শুধু কন্যার অপরাধে পিতা যেন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড না দেন। আরঙ্গজেব তখন সব্যঙ্গে বললেন পিতার কথা রাখা নয়, সেই দস্যুব প্রাণের মায়াই তাহলে কন্যার কাছে বড়ো। অতএব স্বচক্ষে কন্যাকে সেই দস্যুর বিনাশ দেখতে হবে এবং তাঁর নির্বাচিত পাত্রকেই বিবাহ কবতে হবে। একথা শুনে কন্যা চেতনাশূন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। নিষ্ঠুব পিতা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শিবজীকে কিভাবে হত্যা করা যায় আরঙ্গজেব যখন একথা চিন্তা করছেন তখন শিবজীর তত্ত্বাবধায়ক নগবপাল ছুটে এসে তাঁর পায়ের ওপর পড়ল। প্রত্যুৎপন্নমতি আবঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন কি হয়েছে। নগরপালকে একজন সেনাপতির কাছে রেখে অশ্বারোহণে তিনি শিবজীর গৃহাভিমুখে ছুটে গেলেন। মুহূর্তে শিবজীর পলায়ন সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

পথে একটি লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে ধরে আনতে দেখা গেল। জানা গেল তাকে কিছু মাদক দ্রব্য খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে শিবজী তার সঙ্গে নিজের পোশাক বদলে পালিয়ে গেছেন। সে কিছুই জানে না। তখন আরঙ্গজেব শিবজীকে ধরে আনবার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে সমবেত সকলেব কাছে শিবজীর পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ করলেন। বললেন, শিবজী জয়সিংহের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিলেন। এখন দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর আসার সংবাদ পেয়ে সেই মিথ্যা প্রচার হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়েছেন। অম্লান-বদনে এসব মিথ্যা কথা রটনা করে আরঙ্গজেব জয়সিংহের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে কপট অশ্রু বিসর্জন করলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

গভীর নিশীথে পুরাতন দিল্লীর এক ভাঙা মন্দিরে সেই বারবনিতা শিবজীর সঙ্গে দেখা করল। তাকে একা ফিরতে দেখেই শিবজী নিরাশ হলেন। তারপর ব্যগ্রভাবে তার হাত থেকে রোসিনারার পত্র ও অঙ্গুরীয় নিলেন এবং মেয়েটির কাছে রোসিনারার সব কথা শুনে চমৎকৃত হলেন।

এমন সময় রামদাস স্বামীও এলেন। তিনি রোসিনারা প্রসঙ্গ কিছুই জানতেন না। এখন সব শুনে শিবজীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। শিবজী নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের চেয়ে এক নারীর প্রেমকেই বড়ো করে দেখেছেন বলে তাঁকে তিরস্কার করলেন। কিন্তু তারপর বারবনিতার কাছে সব শুনে রামদাস নিজের ভুল স্বীকার করলেন। এবার আগুন জ্বেলে রোসিনারার পত্র পাঠ করতে লাগলেন।

"হে মহারাষ্ট্ররাজ! হে প্রিয়তম।" এই বলে সম্বোধন করে রোসিনারা লিখেছেন পরস্পরের অঙ্গুরীয় বিনিময়ের দ্বারাই তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হলো। সেদিন থেকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। শিবজীর সঙ্গিনী হলেই রোসিনারা সবচেয়ে সুখী হতেন কিন্তু তাতে শিবজীর অমঙ্গল। শিবজী তাকে পেলে রাজ্যসুখও ত্যাগ করতেন একথা সত্য। তবে তাতে তো শিবজীর বৃহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। তাই স্বামীর ভাবী দুঃখের কথা চিন্তা করেই তিনি নিজেকে স্বামী-সঙ্গ-সুখ থেকে বঞ্চিত করলেন। শিবজীও তেমনি তাঁর বৃহত্তর স্বপ্নের সার্থকতার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করুন।

রামদাস স্বামী এ পত্র পাঠ করে চমৎকৃত হলেন। শিবজীকে রোসিনারা-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে বললেন স্বামীর জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দেন রোসিনারার পাতিব্রত্য তাঁদের চেয়ে মহত্তর। যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে পরজন্মে এ কন্যাই শিবজীর সহধর্মিণী হবেন।

মূলের সঙ্গে তুলনা

মূল কাহিনী এবং ভূদেবের সৃষ্ট কাহিনীর মধ্যে তুলনামূলক পাঠবিশ্লেষণে দেখা যাবে ভূদেবের রচনায় অনেক পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন ঘটেছে।

প্রথম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কাহিনীতে। মূল কাহিনীতে দেখা যায়—বন্দিনী রোসিনারা প্রথমে শিবজীর প্রতি বিরূপ থাকলেও পরে তাঁর প্রতি অনুরক্তা হন ও পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর রোসিনারা একটি পুত্রের জননী হন। আরঙ্গজেবের কারাগার থেকে শিবজীর পলায়নের ব্যাপারে তিনি

সহযোগিতা করেন এবং নিজেও শিবজীর সঙ্গিনী হন। অবশেষে পিতামাতার সঙ্গে পুত্রের (শিবজী-রোসিনারার পুত্রের) মিলনে কাহিনীর মধুর সমাপ্তি ঘটেছে। বলাই বাহুল্য, ইতিহাসের কোনো স্বনামধন্য পুরুষ সম্পর্কে এ ধরনের কল্পিত কাহিনীকে নিছক রোমান্স ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিন্তু এ স্বাধীনতা নেই। ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে কল্পনাসৃষ্টি সেখানে নিষিদ্ধ না হলেও তার গতি ও পরিণতি ইতিহাস-সম্মত হওয়া চাই। ইতিহাসে যা ঘটেনি, কাহিনীর পরিণতিতে তা দেখানো অসমীচীন।

ভূদেব ইতিহাস পড়েছেন, ভালোভাবেই পড়েছেন। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে বসে ইতিহাসের সত্যকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে শিবজী-রোসিনারা প্রণয়-উপাখ্যানটি তাঁর ভালোই লেগেছিল। কিন্তু তার মাধুর্যকে স্বীকার করে নিয়েও পরিণতিতে এমন কিছু করেননি যাতে ইতিহাসের সত্য, ইতিহাসের ঘটনা ব্যাহত হয়। তাই ভূদেবের কাহিনী স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছে।

শিবজীর প্রতি প্রথমে রোসিনারার বিরূপ মনোভাব, পরে তাঁর প্রতি অনুরাগ। অনুরাগের পারস্পরিক স্বীকৃতি। কিন্তু গোপন বিবাহে উভয়ের অনিচ্ছা। পরে আরঙ্গজেবের বন্দীশালা থেকে শিবজীর পলায়ন এবং দূতীমুখে রোসিনারার কাছে সংবাদ প্রেরণ। শিবজীর বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে প্রেমময়ী কল্যাণী রোসিনারার শিবজীর সঙ্গিনী হতে অস্বীকৃতি। কিন্তু দূতী মারফত প্রেরিত শিবজীর অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে নিজের অঙ্গুরীয় বিনিময় করে পরস্পর আত্মিক বিবাহবন্ধনের প্রতিজ্ঞা এবং নিজেকে আজীবন প্রিয়সঙ্গসুখলাভ থেকে বঞ্চিত রাখা।

এই যে প্রেমোপাখ্যান এটি কোনো ভাবেই কোথাও ইতিহাসের মূল ঘটনা-স্রোতকে ব্যাহত করেনি। একদিকে যুদ্ধ হানাহানি আর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিযান, আর একদিকে সেই অভিযানের নায়কের জীবনে প্রেমের আবির্ভাব। তাঁর কাছে বড়ো কোনটি? এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ না জীবনের পরমতমাকে নিয়ে সুখের নীড়ে সেই নভোচারী কল্পনার বিশ্রাম গ্রহণ? লেখক এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই কাহিনী শেষ করেছেন। আর এতেই কাহিনীটি তার ঐতিহাসিক ধর্ম অক্ষুন্ন রেখে তারই মধ্যে জীবনেরও স্পর্শ এনে দিয়েছে। রাজনৈতিক ঘনঘটার মাঝখানে পড়ে শাহজাদীর প্রেম যে

সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না এ বেদনা পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। রোসিনারার জীবনের বিষাদ ঘনিয়ে এসেছে তাঁর আদর্শবাদের পথ বেয়ে, যে আদর্শবাদ তাঁকে ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগের চেয়ে প্রেমাস্পদের চরমতম কল্যাণকেই বড়ো করে দেখতে অনুপ্রাণিত করেছে। কাহিনীর এ ধরনের পরিণতি সৃষ্টি করে ভূদেব যে রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তাতে রোসিনারা চরিত্রের মহনীয়তা যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তেমনি ইতিহাসের সত্যও রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য শিবজীর জীবনে এ ধরনের প্রণয়ের ঘটনা ইতিহাসে কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটা কিছু অসম্ভবও ছিল না। এ কল্পনা সম্ভাব্য কল্পনা, উপন্যাসে এ ধরনের কল্পনাকে স্বীকার করে নেওয়া যায়। ঐতিহাসিক চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ না করেও ভূদেব এই কল্পনার সার্থক ব্যবহার করেছেন।

সমগ্র কাহিনী জুড়ে একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। শিবজীর সৈন্যসজ্জায়, তাঁর রণকৌশলে, তাঁর পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায়, তাঁর রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিতে, মারাঠাদের বীরত্বে, মোগল সেনাদের অকুতোভয় সংগ্রামে, শাজাহানের করুণ—পরিণতিতে, বাদশাহপুত্রীর বিষণ্ণ প্রেমে আর সর্বোপরি আরঙ্গজেবের শাঠ্য আর ক্রূরতায় যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তা পাঠকের মনকে সেই যুগের মাঝখানে নিয়ে যায়।

কাহিনীর পরিবর্তনের আর একটি কারণও অনুমান করা যায়। ভূদেব ভূমিকায় বলেছেন, তাঁর গ্রন্থ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য 'হিতোপদেশ শিক্ষা' দেওয়া। এখানে সে শিক্ষা স্বদেশ সাধনায়, স্বদেশ প্রেমিকতায় রূপ নিয়েছে। ভূদেব কাহিনী নির্বাচন করেছেন মোগলযুগের শেষ অবস্থায়। সেই অন্তিমদশায় মোগল সাম্রাজ্যে হিন্দুদের যে দুরবস্থা হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। শিবজীর অভ্যুত্থান ও সংগ্রাম তারই বিরোধী শক্তিরূপে, সেই অপমান আর লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য। এ প্রসঙ্গে আমাদের এই ধারণার সমর্থনে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর "শিবাজী এ্যাণ্ড হিজ টাইমস" (Shivāji and his Times) গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন :

Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead, that it can rise beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage, exclusion from the administration and legal repression ; it can put forth new leaves and branches ; it can again lift its head up to the skies. (6th. edition, page 3৪0).

মোগলরা মূলত বহিরাগত শক্তি। সেই শক্তিকে বিদেশী কল্পনা করে ভূদেব শিবজীকে স্বদেশ-আত্মার প্রতিভূ বলে গ্রহণ করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে রাজপুতশক্তি তার পূর্ব গৌরব ও স্বাধীন সত্তা প্রায় হারাতে বসেছিল, মারাঠাশক্তিই সেদিন আত্মগৌরবে, আত্মমর্যাদায় মোগলশক্তির প্রতিপক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে স্বদেশচেতনা জাগ্রত করতে ভূদেব তাই তার কাহিনীর নায়ক নির্বাচন করেছিলেন মারাঠাবীর শিবজীকে। কাহিনীর মধ্যেই তার ইংগিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিবজীর আরাধ্যা দেবী ভবানী বিশ্বাসঘাতক মারাঠার উদ্দেশে বলেছেন, "রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহবিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মী শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস না গর্ভ-ধারিণী মাতা আর পয়স্বিনী গো এবং সবদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি এই তিনই সমান।"

এখানে 'বরপুত্র' কথাটি লক্ষণীয়। আর জন্মভূমিকে মা হিসেবে কল্পনা করায় ভূদেবের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বাসঘাতক মারাঠা সৈন্যের চরিত্রেও ভূদেব পরিবর্তন এনেছেন। এখানে শিবজীর হাতে তার মৃত্যু ঘটেনি। আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে শিবজীকে একটা বড়ো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়ে দিয়ে প্রার্থিত মৃত্যুবরণ করেছে। আর শিবজীকে ধরিয়ে দেবার জন্য মোগল সেনাপতির কাছে কোনো পুরস্কার গ্রহণেও সে সম্মত হয়নি।

এরপর আসে ভূদেবের রচনায় মূল বিষয় পরিবর্তনের কথা। 'পরিবর্তনের' আলোচনাতেই আমরা জেনেছি ভূদেব শিবজী-রোসিনারার বিবাহ এবং তাঁদের পুত্রজন্মের ঘটনাকে বাদ দিয়েছেন। তাছাড়াও শিবজীর জীবনের কোনো কোনো ঘটনাকেও বাদ দিয়েছেন। যেমন ছলনা ও চাতুরী দ্বারা দুর্গজয়, মোগল সেনাপতিকে হত্যা করা, সুরাট লুণ্ঠন ইত্যাদি। ইতিহাসে এসব ঘটনার প্রমাণ আছে। কিন্তু ভূদেবের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হবে ভেবেই তিনি শিবজীর চরিত্রের এই নিন্দনীয় দিকটিকে তাঁর কাহিনীতে পরিহার করেছেন। কখনো মোগলপক্ষে কখনো বা পাঠানপক্ষে সুবিধে মত যে-কোনো দলে যোগদান করা এবং কখনো বা স্বার্থের প্রয়োজনে বিশ্বাসঘাতকতা করা—শিবজী-জীবনের এই দিকটি সম্বন্ধে ভূদেব উল্লেখ করেছেন মাত্র। তার বর্ণনা দেননি। ইতিহাস-বিখ্যাত শায়েস্তা খাঁ প্রসঙ্গও বাদ দিয়েছেন।

এবারে ভূদেব কাহিনীতে কি পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন (অথবা বলা যায় কি

সংযোজন করেছেন) তার আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত ভূদেব কতগুলি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যেমন রামদাস স্বামী, শাজাহান, বারবনিতা, এরা কাহিনীতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া বাদশাহপুত্র, নগরপাল, রামসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি গৌণচরিত্রও আছে।

শিবজী-রোসিনারা প্রণয়প্রসঙ্গে আহত শিবজীর সেবা করার মধ্যে দিয়ে শিবজীর প্রতি রোসিনারার অনুরাগ। পিতামহ শাজাহানের সঙ্গে রোসিনারার সম্পর্ক এবং পৌত্রীর প্রণয়-ব্যাপারের সার্থকতার জন্য শাজাহানের প্রচেষ্টা, বারবনিতার আগমন ও রোসিনারার সঙ্গে তার কথাবার্তা, রোসিনারার শিবজীকে পত্র দেওয়া ও অঙ্গুরীয় বিনিময় সবই নতুন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন শিবজী-জয়সিংহ সাক্ষাৎকার এবং শিবজীর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা। শিবজীর ভাষণের মধ্য দিয়ে ভূদেবের নিজের বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে।

রামদাস স্বামীর প্রসঙ্গও এখানে বিশেষ মূল্যবান সংযোজন। রামদাস স্বামী ঐতিহাসিক পুরুষ, শিবজীর গুরু। তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে শিবজীকে কতটা উপদেশ দিতেন বা সাহায্য করতেন তা সুস্পষ্ট নয়। ভূদেব এখানে রামদাসকে শিবজীর সর্বব্যাপারে উপদেষ্টা এবং সংকটত্রাতারূপে অঙ্কন করেছেন।

এছাড়া শিবজীর সৈন্যসজ্জা, শাসন পরিচালনা, রাজস্ব আদায় পদ্ধতি, মোগল আমলে, বিশেষ করে শাজাহানের সময়ে, মোগল স্থাপত্যের উৎকর্ষের পরিচয়, দিল্লী দরবার বর্জন, আরঙ্গজেব-শিবজী কথোপকথন, আরঙ্গজেবের পুত্রের কাছে পত্র প্রেরণ এবং জয়সিংহ হত্যা, আরঙ্গজেবের কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বাদশাহের জন্মদিনের উৎসব, সবই সংযোজন।

এইভাবে মূল কাহিনীর কাঠামোমাত্র রক্ষা করে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের দ্বারা ভূদেব যে কাহিনী গড়ে তুলেছেন, তার সৃজনকুশলতা অনস্বীকার্য। ইতিহাস আর উপন্যাস এখানে আপন আপন ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখেও একটি পরম সার্থকতায় মিলিত হতে পেরেছে। ভূদেবের এ কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হবে।

চরিত্রচিত্রণ

অঙ্গুরীয় বিনিময়ের চরিত্রচিত্রণে ভূদেব যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কাহিনীর প্রধান চরিত্র তিনটি : শিবজী, রোসিনারা এবং আরঙ্গজেব। শিবজীর গুরু

রামদাস স্বামী, আরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ, বন্দী বাদশাহ শাজাহান কাহিনীর গতি ও পরিণতি নির্ণয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছেন। সব-কটি চরিত্রই ইতিহাস-বিখ্যাত। শুধু রোসিনারা নামটি নিয়ে সংশয় আছে। কেননা ইতিহাস থেকে জানা যায় রোসিনারা ছিলেন শাজাহানের কন্যা, আরঙ্গজেবের ভগ্নী। আরঙ্গজেবের চারটি কন্যার কারো নামই রোসিনারা ছিল না। তাঁদের নাম ছিল: জেব-উন্-নিসা, জিনৎ-উন্-নিসা, জুবদৎ-উন্-নিসা এবং বদর-উন্-নিসা।[৩] ভূদেবের কাহিনীতে রোসিনারার যে বয়স এবং চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার সঙ্গে জেব-উন্-নিসার কিছুটা মিল পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে নামটা বড়ো কথা নয়। কেননা শিবজী-রোসিনারা প্রণয় কাহিনীটি কল্পিত, ইতিহাসে তা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। বাদশাহ-কন্যার সঙ্গে শিবজীর প্রণয় ও তার পরিণতিই কাহিনীর রোমান্স অংশের উপজীব্য। কিছু গৌণচরিত্র কাহিনীর পরিণতিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুটি: বিশ্বাসঘাতক মারাঠা সেনানী এবং বারবনিতা।

শি ব জী

ভূদেব একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মারাঠাকুলতিলক শিবজীকে তার কাহিনীর নায়ক নির্বাচন করেছিলেন—ভারত ইতিহাসে শিবজী এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজক। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশায় মোগলশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এক বিরাট মারাঠাশক্তির অভ্যুদয় হয়। সেই নবপ্রতিষ্ঠিত শক্তির প্রাণপুরুষ ছিলেন শিবজী। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' শিবজীর সেই সংগ্রামী রূপটি ভূদেব বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকায় ইতিহাসকে বিকৃত না করেও কোনো কোনো স্থলে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। ভূদেবের সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি ছিল একজন জাতীয়-বীরের চরিত্রচিত্রণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীচিত্তে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ভূদেবের জাতীয়-বীরের অনুসন্ধান তারই ফলশ্রুতি। একটা বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মমর্যাদাবোধ শিবজীর ঐতিহাসিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে। ভূদেব সেজন্যই শিবজীকে তাঁর কাহিনীর নায়ক নির্বাচন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে শিবজীকে নিয়ে কাহিনী-রচনা এই প্রথম।

কাহিনী যখন শুরু হয়েছে, আরঙ্গজেব তখন দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করছিলেন।

১৬৫২ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতের মোঘল শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর শাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে আরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীঃ জানুয়ারীতে দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করেন এবং সে বৎসরের মাঝামাঝি (জুলাই) আগ্রায় বাদশাহরূপে তাঁর অভিষেক হয়। সুতরাং কাহিনী যখন শুরু হচ্ছে সেটা ১৬৫৭ খ্রীঃ-এর শেষাশেষি বলেই মনে হয়। আর পরবর্তীকালে শিবজী যখন আরঙ্গজেবের বন্দীশালা থেকে পলায়ন করেন, তখন ১৬৬৬ খ্রীঃ অগাস্ট মাস। ভূদেবের কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে। তাহলে শিবজীব জীবনের প্রায় নয় বছরের কাহিনী অঙ্গুরীয় বিনিময়ে বর্ণিত হয়েছে। শুধু শিবজী নয়, আরঙ্গজেব তথা সমগ্র ভারত ইতিহাসেই এই ন'বছর সময় বিশেষ ঘটনাবহুল এবং উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে শিবজী কখনো মোগলশক্তি কখনো বা পাঠানশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, নানাভাবে নিজেব শক্তি বৃদ্ধি করেছেন এবং কখনো কখনো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরাজয় মোগল সেনাপতি মির্জা রাজা জয়সিংহের কাছে। সেটা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তারপর তিনি আগ্রায় আরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হন কিন্তু উপযুক্ত মর্যাদা পান না। আরঙ্গজেব তাঁকে সুকৌশলে বন্দী করেন। সুচতুর শিবজী তিনমাস পরে পলায়ন করে আত্মমুক্তি সাধন করেন। এই ন' বছরের মধ্যে শিবজী বিজাপুরী সেনাপতি আফজল খাঁকে হত্যা করেছেন, সুরাট এবং আরও ক'টি স্থান লুণ্ঠন করেছেন এবং অতর্কিত আক্রমণে মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর আঙুল কেটে এবং তার পুত্রকে হত্যা করে পুণা অধিকার করেছেন। ভূদেব এইসব ঘটনাকে তাঁর কাহিনী থেকে বাদ দিয়েছেন। শিবজীর বীরত্ব এবং স্বদেশানুরাগ ফুটিয়ে তোলার জন্যই ভূদেব এটা করেছেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

শিবজীর চরিত্রের দুটি রূপ কাহিনীতে ফুটে উঠেছে : একটি যোদ্ধারূপ আর একটি প্রেমিকরূপ। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কাহিনীর নীতিদীর্ঘ পরিসরে তাঁর যোদ্ধারূপই প্রাধান্য পেয়েছে। রোসিনারার প্রতি শিবজীর সানুরাগ উক্তি মাত্র একটি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আহত শিবজীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না সেবাময়ী রোসিনারাকে শিবজী বলেছিলেন—"শস্ত্রব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত সুখ হইতেছে যে, তজ্জন্য এমত বেদনা শতশতবার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান হয়।" এই একটি মাত্র উক্তিতে প্রেমিক শিবজীর অন্তরটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। তবে শিবজী-রোসিনারা প্রণয় পর্বটি এখানে পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। সংলাপের মধ্য

দিয়ে তা সজীব হয়ে উঠতে পারেনি। তাই শিবজীর প্রেমিকরূপটি লেখকের দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হয়। শিবজী হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন সময় করে রোসিনারার কাছে আসতেন, তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কাযকলাপের কথা রোসিনারার কাছে ব্যক্ত করতেন এবং এভাবেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। তারপর রোসিনারারই সম্মান রক্ষার জন্য শিবজীর আহত হওয়া এবং আহতকে রোসিনারার সেবা করার মধ্য দিয়ে উভয়ের প্রণয় পর্বটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এতো বড়ো ঘটনার মধ্যে প্রণয়প্রকাশক উক্তি মাত্র একটিই (পূর্বেই তা উল্লিখিত হয়েছে)। এবং কাহিনীর শেষ পর্যায়ে শিবজীর রোসিনারাকে মোগলহারেম থেকে উদ্ধার করার জন্য দূতী প্রেরণ এবং রোসিনারার অঙ্গুরীয় নিয়ে দূতীর একাকী প্রত্যাবর্তনে শিবজীর ব্যস্ত হয়ে রোসিনারা সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন এবং পরে সব শুনে তাঁর সখেদ উক্তি—"যদি তাঁহার নিমিত্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম—তাদৃশ সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্যবাসেও অসুখ নাই"—শিবজীর হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করেছে। এটুকু ছাড়া বাকী সবটাই শিবজীর চরিত্রের যে রূপটিকে প্রকাশ করেছে সে তাঁর বীররূপ, যোদ্ধারূপ, ইতিহাস-আশ্রিত রূপ।

ইতিহাসে শিবজীর যে চরিত্রের কথা জানা যায়, তা অতি আশ্চয। শিবজী অতি চতুর, কুশলী এবং সুযোগসন্ধানী, তাঁর রণনীতিতে সুবিধাবাদই হচ্ছে একমাত্র নীতি, উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনে তাঁর আপত্তি ছিল না, লুণ্ঠন তাঁর ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল, এ সবই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এর কোনো কিছুই তাঁর ব্যক্তিগত সুখভোগ কিংবা প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ছিল না।[৪] বিভিন্ন যুদ্ধ এবং লুণ্ঠনলব্ধ সমস্ত সম্পদ সঞ্চিত হতো মারাঠা দেশ এবং মারাঠা জাতির নামে। ব্যক্তিগত জীবনে শিবজী অত্যন্ত সংযমী এবং মিতাচারী পুরুষ ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করত। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং সংযতাচার পালিত হতো। এ ব্যাপারে কোনোরকম শৈথিল্য ক্ষমার অযোগ্য ছিল।[৫] শিবজীর চরিত্রের এই বিশিষ্টতা ভূদেবের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

রোসিনারার প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য শিবজী তাঁর জনৈক সেনানীকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীজাতির প্রতি অবমাননা যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম। সেকথা বোঝাবার জন্য তিনি রাজশক্তি প্রয়োগ না করে তাকে দ্বৈতসংগ্রামে আহ্বান জানালেন। এর দ্বারা একই সঙ্গে অপরাধীর

শাস্তিবিধান এবং সেনাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও সদাচার বজায় রাখার শিক্ষাদান দুই-ই সম্পন্ন হলো। বিশ্বাসঘাতক মারাঠা সেনানীকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে শিবজী-চরিত্রের উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। শিবজীর চরিত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে মির্জা রাজা জয়সিংহের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। হিন্দুজাতির স্বার্থরক্ষার জন্য শিবজী মৃত্যুবরণ করতেও রাজী ছিলেন। নিজের জীবন সম্পূর্ণ বিপদগ্রস্ত জেনেও তিনি শত্রুশিবিরে একাকী এসেছেন এবং সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে আশা করে নির্দ্বিধায় আগ্রা যেতে রাজী হয়েছেন। মহারাজকে তিনি বলেছেন—"আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সবজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন।" এই উক্তিতেই শিবজীর মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৬]

আবার আদর্শ রাজা সম্বন্ধে শিবজী যে উক্তি করেছেন, নিজের জীবনে তিনি সে আদর্শ পালন করে গেছেন।[৭] "রাজশক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন বা অন্য কোনো জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে।"

এই দুটি উক্তি শিবজী চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে। অবশ্য এখানে ভূদেব ইতিহাসের সত্য থেকে সরে এসেছেন। শিবজী জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার পরামর্শেই আগ্রা গিয়েছিলেন একথা সত্য। কিন্তু জয়সিংহ এবং শিবজীর মধ্যে এধরনের কোনো মনোভাব বিনিময় ইতিহাসে ঘটেনি। জয়সিংহ রাজপুত, কথার এবং কাজের বিশ্বস্ততা তার কাছে জীবনের চেয়ে বড়ো ছিল। তিনি বরাবর আরঙ্গজেবের স্বার্থই রক্ষা করে এসেছেন।[৮] তবে বাদশাহের দরবারে শিবজীর সম্মানরক্ষার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন একথা সত্য।

আরঙ্গজেবের সভায় শিবজীর আচরণ ও উক্তি কিছুটা সত্য।[৯] এতে শিবজীর আত্মসম্মানবোধ এবং অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কখনো দুর্গ আক্রমণে, কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, সেনাবাহিনীর বিন্যাসে, শাসন

যন্ত্র পরিচালনায় শিবজীর কুশলতা ফুটে উঠেছে। শিবজীর অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি পাঠককে মুগ্ধ করে।

'দি মারহাট্টা চীফে' মূলে শিবজীর চরিত্রের এ মহত্ত্ব তেমন করে ফুটে ওঠেনি। সুরাট লুণ্ঠন, আফজল খাঁ (কাহিনীতে নাম উল্লিখিত হয়নি) হত্যা, শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ ও পুণা অধিকার মূলকাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বোপরি শিবজী-রোসিনারা বিবাহ এবং তাদের পুত্রজন্ম শিবজীর ঐতিহাসিক মহিমাকে খর্ব করেছে, তার চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়েছে। ভূদেবসৃষ্ট শিবজী এ গ্লানি থেকে মুক্ত। ভূদেব শিবজীর চরিত্রে অভিলষিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে, তার মানব হৃদয়টিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাবেই শিবজী চরিত্র পাঠকচিত্তকে অধিকার করেছে।

আ র ঙ্গ জে ব

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র পাঠকগণ আরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ পান মাত্র দুবার—একবার অষ্টম অধ্যায়ে আর একবার একাদশ অধ্যায়ে। এই স্বল্প অবকাশেই ভূদেব আরঙ্গজেবের ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিবজী যেদিন আরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রা দরবারে এলেন সেদিনই প্রথম আরঙ্গজেবকে দেখা গেল। ভূদেবের বর্ণনায়—

"আরঙ্গজেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল দান্তস্বভাব, কুটিলবুদ্ধি এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল।'

এ বর্ণনা সত্য।[১০]

আরঙ্গজেব অত্যন্ত কৌশলী ছিলেন। শিবজীর প্রতি তাঁর মনে একটি সভয় বিতৃষ্ণা ছিল। দরবারে আমন্ত্রণ করে এনে তাকে পাঁচহাজারী মনসবদার বলে ঘোষণা করা, ভবিষ্যতে সসম্মানে বিদায় দেবেন বলে তখনকার মতো বাদশাহের আতিথ্যস্বীকারে রাজী করিয়ে সুকৌশলে বন্দী করা আরঙ্গজেবের সে মনোভাবেরই পরিচায়ক।[১১]

আরঙ্গজেব দরবারের সমস্ত কাজ নিজে উপস্থিত থেকে সম্পন্ন করতেন। ভূদেব তাঁর সেই কাজের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন।[১২]

আরঙ্গজেব নিজে পিতাকে বন্দী করে এবং ভ্রাতৃবধ করে সিংহাসনে বসে-ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রকেও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। তাই তাঁর যে

পুত্র (শাহ-আলম্‌—ভূদেব নাম উল্লেখ করেন নি) দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাঁকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাই কৌশলে তিনি নিজেই পুত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে আদেশ করে নিজের অনুগত সেনাপতিদের কাছে তাকে চিরদিনের মতো অবিশ্বাসী করে তুলেছিলেন। আরঙ্গজেব কাউকেই বিশ্বাস করতেন না। সব কাজ নিজে করতে চাইতেন। একটি স্বগতোক্তিতে তাঁর সেই মনোভাব প্রকাশিত—"প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য সাধন হয় না—হায় যদি আমি স্বহস্তে সমুদায় কায সাধন করিতে পারিতাম তাহা হইলে জগৎ একদিকে আর আমি একলা একদিক হইলেও বুঝি জয় হইত"—আরঙ্গজেবের সংশয়জর্জরিত হৃদয়ের সার্থক চিত্র। এই সংশয়ের জন্যই তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রবীণ সেনাপতি জয়সিংহকে হত্যা করিয়েছিলেন। (অবশ্য জয়সিংহ-হত্যা ব্যাপারটি ভূদেব-কল্পিত, ঐতিহাসিক সত্য নয়)।[১৩]

শিবজীর পলায়ন-সংবাদ পাওয়ার পর আরঙ্গজেবের আচরণ, তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিপদে অবিচল মনোভাব এবং স্থৈর্যের পরিচয় দান করে। শিবজীর পলায়নের ব্যাখ্যা এবং জয়সিংহের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে অশ্রুমোচন তাঁর কূটকৌশলের প্রকাশক।

সংযতাচারী এবং স্থির-মস্তিষ্ক আরঙ্গজেব কোনো ভাবপ্রবণতাকেই প্রশ্রয় দিতে পারতেন না। তাছাড়া কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যাবে এ চিন্তা তাঁর অহমিকাকে আঘাত করত। তাই শিবজীর প্রতি কন্যার অনুরাগকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি। নিজের আদর্শের চেয়ে বাৎসল্য তাঁর কাছে বড়ো হতে পারেনি। শিবজী একে শত্রু, তায় বিধর্মী। কন্যা তাঁরই প্রাণরক্ষার জন্য পিতার সমস্ত রোষ নিজে সহ্য করিতে চাইবেন, এটা তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তিনি কন্যাকে শিবজীর ছিন্নশির উপহার দেবেন জানিয়ে সরোষে বিদায় নিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ভূদেবের কল্পনাসৃষ্ট। কিন্তু আরঙ্গজেবের পক্ষে যে এটা অসম্ভব নয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। তিনি দারার ছিন্নশির শাজাহানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। (মাখনলাল রায়চৌধুরী অনূদিত 'জাহানারার আত্মকাহিনী')।

অঙ্গুরীয় বিনিময়ে আরঙ্গজেবের সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ থাকলেও তাঁর চরিত্রে চতুরতা, শঠতা আর নিষ্ঠুরতাই চিত্রিত হয়েছে। তাই আরঙ্গজেব-চরিত্র পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না।

রাজা জয়সিংহ

রাজা জয়সিংহ আরঙ্গজেবের একজন বিশ্বস্ত ও কৃতী সেনাপতি। তাঁর পুরো নাম মির্জা জয়সিংহ। কণ্টারের কাহিনীতে তাঁর নাম মির্জা রাজা বলে উল্লিখিত হয়েছে। আর ভূদেব লিখেছেন রাজা জয়সিংহ। রাজা জয়সিংহ শুধু রণকুশলীই ছিলেন না, একজন চতুর কূটনীতিবিদও ছিলেন।[১৪] বহু কঠিন সংগ্রামে তিনি মোগলদের জয়যুক্ত করেছিলেন। তাই শিবজীর শক্তিকে দমন করার জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আরঙ্গজেব তাঁর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সেনাপতি জয়সিংহকে শিবজীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত করলেন। প্রকৃতপক্ষে জয়সিংহের সঙ্গে আর একজন বিশ্বস্ত ও পারদর্শী সেনাপতিও প্রেরিত হয়েছিলেন। সেই সেনাপতির নাম দিলীর খাঁ।[১৫] কিন্তু কণ্টার বা ভূদেব কেউই তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। যাই হোক—শিবজীর বিরুদ্ধে জয়সিংহ বিজয়ী হলেন। শিবজী বশ্যতা স্বীকার করলেন, মোগল বাদশাহের পক্ষে বিজাপুরের (ভূদেব লিখেছেন বিজয়পুর) বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। শেষ পর্যন্ত আগ্রার বাদশাহ আরঙ্গজেবের সামনে উপস্থিত হতেও তিনি রাজী হয়েছিলেন। এসবই ঐতিহাসিক সত্য।[১৬] কিন্তু ভূদেব জয়সিংহের চরিত্রচিত্রণে সত্য থেকে কিছুটা সরে এসেছেন।

ভূদেবসৃষ্ট জয়সিংহ শিবজীর যুক্তি এবং হিন্দুধর্মপ্রেমিকতার দ্বারা বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। শিবজীকে ভবিষ্যতে সাহায্য করার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন ("কিন্তু ইহা বলিয়া যে কোনপ্রকার চেষ্টা করিব না তাহাও বলিতেছি না")। কিন্তু যেহেতু তিনি রাজপুত তাই তাঁর কাছে কথার দাম অনেক বড়ো। শুধু এজন্যই তিনি শিবজীর সঙ্গে তখন সহযোগিতা করতে পারলেন না। ইতিহাস কিন্তু একথা লেখে না। ইতিহাস বলে—জয়সিংহ কোনোদিন কোনো কারণেই মোগলশক্তির বিরোধিতা করেননি। বরং মোগলদের যাতে স্বার্থরক্ষা হয় সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। শিবজীর সঙ্গে হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কোনো আলাপ-আলোচনাও হয়নি।[১৭]

ভূদেবের কাহিনীতে জয়সিংহকে শেষপর্যন্ত আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সহযোগীরূপে দেখিয়ে আরঙ্গজেবের প্রেরিত দূতের সাহায্যে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এটাও সত্য ঘটনা নয়। জয়সিংহের মৃত্যু হয় হস্তিপৃষ্ঠ থেকে পতনের ফলে, সেটা নিতান্তই দুর্ঘটনা।[১৮]

আসলে ভূদেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর কাহিনী রচনা করেছিলেন তাতে জয়সিংহ-চরিত্রের এই কল্পিত পরিবর্তনটুকু প্রয়োজন ছিল। আগ্রায় শিবজীর

যথোপযুক্ত সম্মানরক্ষার জন্য জয়সিংহ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—একথা সত্য।[১৯] সেই সত্যটুকুর ওপর নির্ভর করেই ভূদেব এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' জয়সিংহ বাইরে বাদশাহের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ কিন্তু অন্তরে সেই হিন্দুই রয়ে গেছেন। শিবজীকে হঠাৎ তাঁর শিবিরে উপস্থিত দেখে তিনি প্রথমে একটু হতচকিত হলেও পরমুহূর্তেই তাঁকে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন করেছেন। তারপর তাঁদের দুজনের কথাবার্তার শেষে শিবজী নিজের সৈন্যবাহিনীর জন্য বাদশাহের রাজকোষ থেকে বেতন না নিয়ে তার বদলে বিজিত ভূমির নির্দিষ্ট করের চৌৎ সংগ্রহের অনুমতি চাইলেন। জয়সিংহ তার গূঢ়ার্থ না বুঝেই রাজী হলেন। এসব থেকে মনে হয় জয়সিংহ যেন অতি সাধারণ এক ভালোমানুষ। জয়সিংহের সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়ে শিবজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সমর্থনের মনোভাবই সূচিত হয়েছে।

শা জা হা ন

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' 'শাজাহান' চরিত্রটি ভূদেবের সংযোজন। যুদ্ধ, চক্রান্ত আর হানাহানির রাজনৈতিক ঝটিকার মধ্যে শাজাহান-রোসিনারার মধুর সম্বন্ধটি সহজেই একটি স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল রচনা করেছে। কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে রোসিনারার মতো শাজাহানেরও কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতরা নায়িকা রোসিনারার প্রেমকে তিনি আপনার সস্নেহ সমর্থন ও সতর্ক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সার্থকতায় পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যর্থতার বেদনায় জর্জরিত হয়েছেন, পিতামহের সস্নেহ করুণমধুর হৃদয়টি নিয়ে তিনি এক অপূর্ব মহিমায় উদ্‌ভাসিত হয়েছেন। মনে হয়, এ চরিত্রটির সৃষ্টিতে নিজের বাল্যস্মৃতি ভূদেবকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নিজের জীবনের প্রথম বারো বছর কেটেছে পিতামহের মধুর সান্নিধ্যে। ভূদেবের নিজের ভাষায় পিতামহ হচ্ছেন "মহাগুরুর মহাগুরু অথচ ক্রীড়াকৌতুকের সহচর' (পিতামহদেব, পারিবারিক প্রবন্ধ)। শাজাহানও এখানে রোসিনারার বেদনাতুর জীবনে একমাত্র আনন্দের সহচর।

রোসিনারা নিজের মনোভাব পিতামহের কাছেই কিছুটা হাঁলকা করতে পারতেন। পিতামহও পৌত্রীর সন্তুষ্টির জন্য শিবজীর সকল সংবাদ সংগ্রহ করে জানাতেন। শিবজীর বাদশাহের কাছে আগমনের সংবাদ দিয়ে পৌত্রীকে কৌতুক করে তিনি বলছেন—'মহারাষ্ট্রপতি আসিতেছেন, কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও

না যে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।" এই ধরনের কথায় যেন আমাদের ঘরোয়া জীবনের সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আবার দশম অধ্যায়ে শিবজীর দূতী যখন রোসিনারাকে শিবজীর সঙ্গিনী হতে আহ্বান জানালো—তখন শাজাহান নিজে হাতে একটি দাসীর পোশাক এনে তা পরে পৌত্রীকে ছদ্মবেশে অন্তঃপুর ছেড়ে যেতে সাহায্য করছেন। রোসিনারা যখন বলছেন "আমার যাওয়া কি উচিত হয়"—তখন শাজাহান অস্থিবকণ্ঠে বলে উঠেছেন—"কিসে অনুচিত?…এখানে তুমি এমন কি সুখে আছ যে যাইতে অনিচ্ছা হয়?" এই উক্তির মধ্য দিয়ে শাজাহানের সেই হৃদয়টিই প্রকাশ পেয়েছে যা একান্তভাবেই মানবিক। হারেমের কোনো শাহাজাদী বিধর্মী শত্রুপক্ষীয় একজনের সঙ্গে পলায়ন করবে, আর কোনো বাদশাহ তার সুযোগ করে দেবেন সাধারণ ক্ষেত্রে এ কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু মানবিক হৃদয়বৃত্তিই যেখানে বড়ো হয়ে ওঠে সেখানে কিছুই আব অসম্ভব বলে মনে হয় না। এ ধরনের মানবিক আচরণই উপন্যাসকে রসসিক্ত করে তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

শেষপযন্ত শিবজীর বৃহত্তর স্বার্থ আব মহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে রোসিনারা যখন শিবজীর সঙ্গে যেতে অসম্মত হলেন, তখন শাজাহান তার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে না পারলেও, রোসিনারার যুক্তির ঔদার্যটুকু বুঝতে পারলেন। শিবজীর সঙ্গে মিলনেই রোসিনারার সুখ মনে করে তিনি তাঁদের সুখেই সুখী হতে চেয়েছিলেন। তা না হওয়ায় তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হলেন।

এরমধ্যেই সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে শাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব-জর্জরিত হৃদয়টিও উদ্ঘাটিত হয়েছে। আগ্রার দুর্গে বন্দী শাজাহান পৌত্রীর কাছে নিজের সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত করতেন। নিজের অতীত জীবনের বিশ্লেষণও সে প্রসঙ্গে এসে পড়ত। পুত্র শাজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। আবার পিতা শাজাহান নিজের সে আচরণ বিস্মৃত হয়ে পুত্রদের প্রতি একান্তভাবেই স্নেহান্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আর তারই ফলে তার প্রিয়পুত্র দারাসীকো আর মুরাদকে হত্যা করে এবং সুজাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে তাঁর তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করলেন এবং নিজে সিংহাসনে বসলেন। শাজাহান নিজের এ অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে অশেষ যন্ত্রণায় বলে উঠেছেন—"বুঝিলাম, বুঝিলাম যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অপমানগ্রস্ত হইতে হয়।" আবার পরমুহূর্তে ভাবছেন—"আমি আপনার কর্মভোগ ভুগিতেছি—তবে আরঙ্গজেবও নিষ্পাপ? আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন,

তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম? কপালের লিখন? না না তাহা হইলে অসৎকর্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে?" এই অন্তর্দহনের প্রকাশেই চরিত্রটি পূর্ণতা পেয়েছে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র অন্যান্য চরিত্রের মতো এখানেও শাজাহান-রোসিনারা সম্পর্কটি সংলাপের মধ্য দিয়ে পাঠকের অনুভূতির প্রত্যক্ষতার মধ্যে গড়ে ওঠেনি—লেখকের বিবৃতির মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও যেটুকু ঘটনা বা সংলাপ এখানে রচিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মানুষ শাজাহানের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তার মূল্যও সামান্য নয়।

রা ম দা স স্বা মী

রামদাস স্বামী শিবজীর গুরু, ঐতিহাসিক পুরুষ। আবাল্য ধর্মপরায়ণ শিবজীর জীবনে রামদাস স্বামীর বিশেষ প্রভাব ছিল। কথিত আছে রামদাস স্বামীর গৈরিক উত্তরীয়কে শিবজী তার রাজপতাকা করেছিলেন।[২০] এই পতাকা 'ভাগোয়াঝাণ্ডা' নামে বিখ্যাত। শিবজীর জীবনে গুরুর স্থান কতখানি ছিল আর একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজীর চারিত্রিক সংশোধনের জন্য তাঁকে গুরু রামদাস স্বামীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।[২১] সুতরাং শিবজী রাজনৈতিক সংকটে যদি সেই গুরুর শরণ নেন, তাহলে খুব অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব কিছু ঘটে না। এখানে রামদাস স্বামী শিবজীর রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সংকটের পরিত্রাণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন।

বিশ্বাসঘাতক মারাঠা সৈনিক নিজকৃত অপরাধের জন্য প্রাণবিসর্জনের সংকল্প প্রকাশ করলে তাকে রামদাস স্বামীর কাছে পাঠানো হয়। রামদাস স্বামীর অনুপ্রেরণাতেই সে যুদ্ধে অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করে প্রাণবিসর্জন দেয়। তারই কৃতিত্বে শিবজীর বাহিনী মোগলদের পরাজিত করে। আগ্রা থেকে শিবজীর পলায়নের ব্যাপারেও রামদাস স্বামী বিশেষ সহায়তা করেন। আবার রোসিনারা-প্রেরিত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে তাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করার জন্য তিনিই শিবজীকে অনুমতি দেন ও শিবজীকে মানসিক সংকট থেকে উদ্ধার করেন। সামান্য কয়েকটি আঁচড়েই শিবজীর জীবনে গুরুর স্থান ও প্রভাব কতখানি তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমগ্র কাহিনীতে রামদাস স্বামীর সন্ন্যাসীসুলভ নিরাসক্তি সুস্পষ্ট অনুভূত। কিন্তু তাতে কাহিনীতে তাঁর পক্ষে একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি।

রো সি না রা

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র রোমান্স অংশের নায়িকা রোসিনারা। রোসিনারা বাদশাহ আরঙ্গজেবের কন্যা। কাহিনীতে রোসিনারাকে অল্প সময়ের জন্যই দেখা যায়। কিন্তু সেই স্বল্প অবকাশেই রোসিনারা-চরিত্রের মাধুর্য, কমনীয়তা এবং গভীরতা পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে। রোসিনারা-চরিত্রে ভূদেব যে আদর্শবাদিতা দেখিয়েছেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্তত প্রথমদিকে প্রভাবিত করেছিল (দুর্গেশনন্দিনী —আয়েষা)। কাহিনীতে রোসিনারার জীবন রোমান্স অংশটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই, ইতিহাসের বা শিবজীর জীবনের কোনো ঘটনাকে তা কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। কাহিনীতে প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ না থাকলেও তাঁর জীবন ও আচরণ একটা ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে। তাঁর ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত সেযুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পূর্ণতই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এভাবেই ইতিহাসের কোনো ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হয়েও, ইতিহাসের গতিধারার সঙ্গে রোসিনারার জীবনধারাটিও এসে মিলতে পেরেছে। এখানেই ভূদেবের চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা।

প্রথমদর্শনে রোসিনারাকে বাদশাহ-কন্যা বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তাঁর বন্দী-জীবনের প্রথম তিনদিন তিনি অন্তরালবর্তী অজানা দুর্গস্বামীর সসম্ভ্রম এবং আন্তরিক আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর চতুর্থদিনে সকালেও যখন দুর্গস্বামীর দেখা পাওয়া গেল না, তখন কিছু অশ্রুবিসর্জনও করলেন। "কিন্তু সেই অশ্রুনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ অথবা আপনাকে দুর্গস্বামীর অবজ্ঞেয়-বোধ" লেখক তা ব্যাখ্যা করেননি। তারপর বেলা বাড়লে দুর্গস্বামী দেখা দিলেন। বাদশাহ-পুত্রী তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন না। তখন তিনি যথোচিত গাম্ভীর্যে কিন্তু মৃদুস্বরে দুর্গস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন তিনি বাদশাহের পরমশত্রু শিবজী স্বয়ং। তাঁকে বন্দী করার কারণ হিসেবে যখন শুনলেন তাঁকে বিবাহ করে বাদশাহের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করাই শিবজীর উদ্দেশ্য তখন গর্বোদ্ধত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—"এ কি অসঙ্গত কথা। তৈমুরবংশ-সম্ভূত দিল্লীশ্বরের সহিত পার্বতীয় দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধন।" এই একটি বাক্যে বাদশাহ-কন্যার মনোভাব এবং চরিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। নারীসুলভ কৌতুহলের নিরসন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশ এবং পদমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছে। এটাই স্বাভাবিক। তারপর কেমন করে এই বাদশাহ-কন্যার সঙ্গে

পার্বতীয় দস্যুর প্রণয়সম্পর্ক গড়ে উঠলো, ভূদেব সে বিষয়ে শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেননি। সামান্য কয়েকটি কথায় লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন, এবং সে বর্ণনা সম্ভাব্যও বটে। তবে কথাসাহিত্যের দাবি আরো অনেক বেশি। কথাসাহিত্য অর্ধনাটক, সংলাপ তার প্রাণ। বাদশাহ-পুত্রীর জীবনের এতো বড়ো একটা পরিবর্তন, এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা সেই প্রাণের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত।

রোসিনারার হৃদয়ভাব শিবজীর প্রতি যখন সম্পূর্ণ অনুকূল তখন তাঁরই সম্মান রক্ষার জন্য শিবজী আহত হলেন। এই সংবাদে বাদশাহ-কন্যার মধ্যে চিরন্তন নারীহৃদয়টি জেগে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে শিবজীর কাছে এলেন এবং শিবজীর শয্যার পাশে বসে তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। শিবজীর উৎফুল্ল হৃদয়ের কথা শুনে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে শুধু বললেন—"আমিই এই অনর্থের মূল"। তারপর মনে মনে সংকল্প করলেন যতদিন না শিবজী সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছেন ততদিন তিনি নিজে শিবজীর সেবা করবেন। আর এই উপলক্ষেই তাঁর নারীসত্তার পূর্ণ জাগরণ হলো। এবার শিবজীকে বিবাহ করতে তাঁর আর আপত্তি রইল না। শুধু গুরুজনের অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করলে তার ফল কখনো ভালো হয় না বলে রোসিনারা এবং শিবজী দুজনেই সেই অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কিছুদিন পর মোগলরা শিবজীর দুর্গ জয় করে নিলে শিবজী পালিয়ে যাবার আগে রোসিনারার কাছে এলে তিনি শিবজীকে বললেন—"কখনও যদি পুনর্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও।" এ যে রোসিনারার মুখের কথা মাত্র নয়, রোসিনারা পরে তার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

এবার রোসিনারাকে দেখা গেল আগ্রা দুর্গে বন্দী পিতামহ শাজাহানের সমব্যথিনী সঙ্গিনীরূপে। শিবজীকে ভালোবেসে রোসিনারার নবজন্ম হয়েছিল। তাই পিত্রালয়ে ফিরে এসে সুখৈশ্বর্য সম্ভোগের মধ্যে তিনি আর শান্তি খুঁজে পেলেন না, বৃদ্ধ পিতামহের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সম্পর্কের মধুরতার জন্য পিতামহের কাছে তিনি সহজেই আপন মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন। শাজাহানও সহানুভূতির সঙ্গে পৌত্রীর কথা শুনতেন ও পৌত্রীকে শিবজীর কার্যকলাপের খবর এনে দিতেন। বাদশাহের সঙ্গে শিবজীর দেখা করতে আসার সংবাদ তিনিই পৌত্রীকে জানিয়েছিলেন। তারপর বাদশাহ-কন্যার জীবনে সেই চরম মুহূর্ত উপস্থিত হলো যখন শিবজীর দূতী গোপনে অঙ্গুরীয় আর উষ্ণীষ নিয়ে এসে রোসিনারাকে পলায়নপর শিবজীর সঙ্গিনী হতে আহ্বান জানালো।

একদিকে প্রেমের আহ্বান আর একদিকে প্রেমপাত্রের প্রকৃত মঙ্গলের চিন্তা—এই দুই চিন্তার দ্বন্দ্বে রোসিনারার অন্তর দুলে উঠলো। কত কথা তাঁর মনে হতে লাগলো। পিতামহ তাঁকে বারবার শিবজীর সঙ্গে চলে যেতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রিয়তমের প্রকৃত কল্যাণকামনাই তাঁর কাছে বড়ো বলে মনে হলো। পিতামহ শিবজীর সঙ্গে যেতে তাঁর অনিচ্ছার কারণ জানতে চাইলে রোসিনারা বলে উঠলেন—"অনিচ্ছা। আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা যে কি পর্যন্ত বলবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে না।" কিন্তু তবু যে তাঁকে সে ইচ্ছা দমন করতে হচ্ছে তার কারণ এতে শিবজীর প্রতি আরঙ্গজেবের বিদ্বেষ যেমন বেড়ে যাবে তেমনি মারাঠা জাতিও একজন মুসলমানীকে বিবাহ করার জন্য শিবজীর প্রতি বিরূপ হবে। দু'পক্ষই তখন শিবজীর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। "সুতরাং আমা হতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম কেমন করিয়া করিব ?" একদিন তিনি শিবজীকে বলেছিলেন "আমি তোমারই", এবারে জীবনের চরম ত্যাগেব মধ্য দিয়ে তিনি সে কথারই শেষ উত্তর দিলেন। ভূদেব এখানে রোসিনারার চরিত্রে চিরন্তন ভারতীয় নারীত্বকে প্রকাশ করেছেন, প্রেমের জন্য স্বার্থবিসর্জন দেওয়াই তার ধর্ম। তারপর রোসিনাবা শিবজীর অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে নিজের অঙ্গুরীয় বিনিময় করলেন এবং দূতীর হাতে শিবজীকে এক পত্র দিলেন।

শিবজীকে লেখা রোসিনারার পত্রটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার মধ্যে রোসিনারার হৃদয়টি উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শিবজীর প্রতি রোসিনারার আন্তরিক ভালোবাসা এবং একান্ত আত্মসমর্পণ মনে দাগ কেটে যায়। "হে মহারাষ্ট্ররাজ, হে প্রিয়তম" এই বলে সম্বোধন করে রোসিনারা পত্র শুরু করেছেন। লিখেছেন—"আমি আর অধিক কি বলিব—তুমিই আমার স্বামী তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম—অতএব অদ্যাবধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামিসহবাসসুখে বঞ্চিত করিলাম—যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই—কিন্তু মনে করিয়া দেখ শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে। অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত

করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই—একান্ত অধীনা রোসিনারা।"

এই পত্রটিতেই রোসিনারার চরিত্র সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে, এর ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কণ্টারের রচিত রোসিনারা চরিত্রের সঙ্গে ভূদেবের রচনার পার্থক্য অনেকখানি। সেখানে শিবজীর সঙ্গে রোসিনারার বিবাহ হয়েছে, রোসিনারা শিবজীর পুত্রের জননী হয়েছেন, সেই পুত্রকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর আগ্রা থেকে শিবজীর পলায়নের সময় তিনি শিবজীর সঙ্গিনী হয়েছেন। পরিশেষে হারানো পুত্রের সঙ্গে পিতামাতার মিলনে কাহিনীর মধুর সমাপ্তি ঘটেছে। রোসিনারা-চরিত্রের কোনো বিশিষ্টতা সেখানে ফুঠে ওঠে নি। একজন কোমলপ্রাণা প্রেমময়ী পত্নীরূপেই সেখানে তাঁকে দেখা গেছে, সকল বাধা বিঘ্ন দূরে ঠেলে ফেলে যিনি নিজের স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু প্রেমপাত্রের জন্য আত্মসুখ বিসর্জনের অপূর্ব মহিমায় ভূদেবসৃষ্ট রোসিনারা-চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভূদেবের রচনায় শিবজী-রোসিনারার বিবাহ বা তাঁদের পুত্রসন্তান লাভের অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা স্থান পায়নি। শিবজী বহুপত্নীক ছিলেন একথা ইতিহাসে জানা যায়।২২ কিন্তু তা'বলে তিনি কোনো অসবর্ণ বিবাহ করেননি। ভূদেব এ সত্যকে রক্ষা কবেছেন এবং সেই সঙ্গে রোসিনারা চরিত্রকেও এক অসাধারণত্ব দিয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে অগণ্য নারীচরিত্রের ভিড়ের মধ্যেও রোসিনারা স্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে অঙ্গুরীয় বিনিময়ের বিচার

ভূমিকাতেই বলা হয়েছে যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'ই তাঁর সেই সাৎক রচনা। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'অঙ্গুয়ীয় বিনিময়ে'র বিচার তাই অপরিহার্য।

প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা কি এ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে সহজে তার মীমাংসা হবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস যখন উপন্যাস তখন সেখানে ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যের দাবিই বড়ো। তবু ইতিহাসকেও অস্বীকার করা চলে না। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে গ্রহণ করলে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। "সাহিত্য" গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, উপন্যাসের সেই রসটুকুর প্রতিই ঔপন্যাসিকের লোভ। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি নূতন শব্দ সৃষ্টি করেছেন— 'ঐতিহাসিক রস'। বলেছেন—

"লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণা সফল হইলেই হইল।"

তবে সর্বজনবিদিত সত্যকে অস্বীকার করলে চলবে না, ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের স্বরূপধর্মকে রক্ষা করলেই সেই সত্যকে স্বীকার করা হয়। সেই সত্যকে বজায় রেখে—কল্পনাকে কিছুটা প্রশ্রয় দেওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায় এটুকু মনে রাখলেই চলে। কেননা প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা বিচার করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কাজ, সাহিত্যের পাঠক এমনকি তার সমালোচকেরও কাজ তা নয়। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র ঐতিহাসিকতা বিচারেও দেখতে হবে যে ইতিহাসের খুঁটিনাটি বাদ দিলেও লেখক তাঁর উপন্যাসে ঐতিহাসিক রসের পরিবেশনে সার্থক হয়েছেন কি না। যদি হয়ে থাকেন তাহলেই তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃত হবে।

চরিত্র আর ঘটনা—এই দু'ভাগে এ আলোচনাকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

চরিত্রের আলোচনায় আগেই দেখা গেছে ভূদেব প্রধান চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা বজায় রেখে তার মধ্যে কল্পনার বিস্তার করেছেন। তাই এখানে তা নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র।

ঘটনা এখানে দুটি ধারায় অগ্রসর হয়েছে। নায়ক শিবজীর জীবনের একটি ধারা জাতীয়-জীবনকে প্রভাবিত করেছে আর একটি ধারা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম ধারাটি ঐতিহাসিক, দ্বিতীয়টি রোমান্স। রোমান্সটি নিছক কল্পনা। এখানে বিচার্য এই কল্পনা কিভাবে ইতিহাসের গতি-ধারার সঙ্গে মিশে ঐতিহাসিক রসের উৎসারণ ঘটিয়েছে।

শিবজীর চরিত্র আলোচনায় দেখা গেছে, ভূদেব ঘটনাবিন্যাসে ইতিহাসকেই অনুসরণ করেছেন। ঘটনার ফ্রেম এখানে ঠিকই আছে, কিন্তু ঘটনার সংস্থাপনে ভূদেব ঐতিহাসিক কালের কিছু অদল বদল করেছেন। শিবজী-জয়সিংহ এবং শিবজী-আরঙ্গজেব দুটি সাক্ষাৎকারেই ভূদেব ঘটনাকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন।

ভূদেবের কাহিনীতে শিবজী নিরস্ত্র একাকী জয়সিহের শিবিরে অকস্মাৎ

উপস্থিত হন। জয়সিংহ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে ইঙ্গিতে পারিষদবর্গকে স্থানান্তরে পাঠালেন। শিবজী তখন এক দীর্ঘ ভাষণে তাঁর হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় জয়সিংহের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। ভবিষ্যতে সাহায্য করার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়সিংহ আরঙ্গজেবের পক্ষে শিবজীর সঙ্গে সন্ধি করলেন।

ভূদেবের এই ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের সত্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে না।

স্যার যদুনাথ সরকারের গ্রন্থে [Shivaji and his Times. (6th Edition) যেটি সাধারণত Shivaji নামে পরিচিত—এবং Short History of Aurungzib 3rd edition.] এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে 'শিবাজী' গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে জানা যায় শিবজী অনেক চেষ্টা করে জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন।[২৩] এই ঘটনার পূর্বে শিবজী আফজল খাঁকে হত্যা করেছিলেন বলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। শিবজী নিরস্ত্র হয়ে ছজন মাত্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে এলে জয়সিংহ তাঁর সচিবদের পাঠিয়ে আগে জানিয়ে দেন শিবজী তাঁর সব দুর্গ সমর্পণ করতে রাজী থাকলে তবেই যেন জয়সিংহের কাছে আসেন। শিবজী রাজী হলে তবেই জয়সিহ তাঁকে সপারিষদ অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু শিবজী জয়সিংহের শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহের নির্দেশে মোগলবাহিনী নায়কহীন পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করে। শিবজী অযথা লোকক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে পরাজয় মেনে নেন।[২৪] তারপর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

সুতরাং ভূদেব যে সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণনা করেছেন তা তাঁর কাহিনীর উদ্দেশ্যের অনুকূল এবং শিবজীর দীর্ঘ আবেদনটি ভূদেবের রচনা। তবে শিবজী যে হিন্দুদের রক্ষাকর্তারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন এটি সত্য।[২৫] সুতরাং ভূদেবের এই রূপান্তর শিবজী চরিত্রের বিকাশের সহায়তা করেছে।

সন্ধির একটি শর্তেরও অন্যরকম প্রয়োগ হয়েছে। প্রথমে স্থির হয়, শিবজী নিজে আগ্রা যাবেন না। তাঁর আটবছর বয়সের পুত্র শম্ভুজী পাঁচহাজারী মনসবদার হিসেবে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন। কিছুদিন পরে দক্ষিণ ভারত থেকে শিবজীকে দূরে রাখার জন্য জয়সিংহ তাঁকে অনেক অনুরোধ করে এবং নিজে তাঁর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে আগ্রা যেতে রাজী করান।[২৬]

এরপর আসে শিবজী আরঙ্গজেব প্রসঙ্গ। ভূদেব লিখেছেন শিবজী প্রথমে উত্তেজিত হলেও শেষপর্যন্ত আরঙ্গজেবের সকল প্রস্তাবে সম্মত হন। ঐতিহাসিক বিবরণ কিন্তু আলাদা। স্যার যদুনাথের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শিবজীর সঙ্গে

আরঙ্গজেবের কোন প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ হয়নি, হয়েছিল জয়সিংহ-পুত্র রামসিংহের মাধ্যমে। শিবজীকে পাঁচহাজারী মনসবদার ঘোষণা করা হলে শিবজী ক্রুদ্ধ হন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো তিনি আরঙ্গজেবের সামনে আসেননি।[২৭]

ভূদেবের বর্ণনা মতো শিবজী সেদিনই তাঁর সৈন্যদের নিজরাজ্যে ফেরত পাঠাতে চাননি। কিছুদিন পরে আরঙ্গজেবের সন্দেহ দূর করে নিজের মুক্তির পথ সুগম করতেই তা করেন।[২৮]

ঐতিহাসিক কালনির্ণয়ে ভূদেব আর একটি ব্যাপারে স্বাধীনভাবে নিজের লেখনী চালনা করেছেন। ভূদেবের কাহিনীতে আরঙ্গজেবের জন্মদিনের উৎসবের হৈ-চৈ-এর মধ্যেই শিবজী পলায়ন করেন। কিন্তু শিবজী যেদিন আগ্রায় প্রবেশ করেন সেদিনই ছিল প্রকৃত পক্ষে আরঙ্গজেবের জন্মদিন।[২৯]

রোমান্স অংশে ভূদেব আগ্রায় রোসিনারাকে শাজাহানের সঙ্গিনী করেছেন। কিন্তু শিবজী আগ্রায় আসেন ১৬৬৬ খ্রীঃ-এর মে মাসে। তার আগেই ওই বছরের জানুয়ারী মাসের ২২শে তারিখে শাজাহানের মৃত্যু হয়। শাজাহানের মৃত্যুর পরেই আরঙ্গজেব আগ্রায় দরবার করেন। শাজাহানের জীবদ্দশায় কখনো তিনি আগ্রায় দরবার বসাননি।[৩০] তবে শাজাহান যেহেতু এখানে রোমান্স অংশের চরিত্র আর সে অংশ নিছকই কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং এ ত্রুটি উপেক্ষণীয়। ভূদেবের এই ত্রুটিই কাহিনীতে মানবিকরসের উৎসারণে সাহায্য করেছে। ইতিহাসের সংস্রবে মানবজীবনে যে বিষাদ ঘনিয়ে আসে তারই কারুণ্য এখানে পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত করে। এতেই ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের রাখীবন্ধন সম্পন্ন হয়।

আলোচনার পরিভাষায় ভূদেবের রচনা কালাতিক্রমদোষে দুষ্ট। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভূদেব একটি ঐতিহাসিক ভাবমণ্ডল রচনায় সার্থক হয়েছেন। শিবজীর সৈন্যসজ্জা, সেনাবাহিনীর বিভাগ, রণকৌশল সবই ইতিহাসে স্বীকৃত। একদিকে ইতিহাসের বিপুল আয়োজন আর একদিকে মানবজীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ করুণমধুর ভালোবাসা—এ দুয়ের সংঘাতে ইতিহাসই জয়ী হয়েছে, ভালোবাসা চরম বিষাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। নায়িকার জীবন ইতিহাসের কোনো ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও তার গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সহজভাবেই মিশে গেছে। এমন পরিবেশে শিবজী-রোসিনারা প্রণয়পর্বটিকে আর অসম্ভব বলে মনে হয় না। বরং এই প্রেমের সমাপ্তি মিলনে সার্থক হলো না বলে পাঠকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই প্রেমের

আবির্ভাব, বিকাশ এবং পরিণতি উপন্যাসোচিত সংলাপের মধ্য দিয়ে পাঠকের অনুভবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি একথা সত্য। এই রকম বড়ো একটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যেতে পেরেছে। এখানেই 'ঐতিহাসিক রস' পরিবেশনে ভূদেবের পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। 'দি মারহাট্টা চীফ'-এ ঐতিহাসিক আধারে যে উদ্দাম কল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে, তা শেষপর্যন্ত ইতিহাসকেই অস্বীকার করেছে। কিন্তু ভূদেব তার বীজটুকু মাত্র গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই অপূর্ব। ইতিহাসকে অস্বীকার না করে তারই পটভূমিকায় মানবজীবনের আনন্দবেদনাকে আভাসিত করে তুলতে পেরেছেন। ইতিহাসের জয়রথ মানবজীবনের ভালোবাসাকে দলিত করে চলে গেছে। তবু সেই দলিত পরাজিত ভালোবাসার করুণ আর্তিই শেষপর্যন্ত পাঠকের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই এই আখ্যায়িকা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হিসাবে সার্থক হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (ঐতিহাসিক উপন্যাস) (১৮৫৭) দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস-এর মধ্যে 'সফলস্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুইটি আখ্যান সন্নিবিষ্ট। উহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক উপন্যাস জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূল সুর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহে দাবি করা যাইতে পারে।"—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সং) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৩৫

২. "বাঙ্গালা উপন্যাসের সূত্রপাত পাইতেছি আলালের ঘরের দুলাল হইতে। কিন্তু এই উপন্যাসে উপদেশাত্মক এবং হাস্যরসবহুল চিত্রাঙ্কনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। প্রণয়কাহিনী বা রোম্যান্টিসিজমের কোনো অবকাশই ইহাতে নাই। রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন পাইতেছি ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বিতীয় আখ্যান 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (৩য় সং), ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ৯৮

৩. Short History of Aurungzib. পৃঃ ১৫-১৬

৪. তদেব – ১৫শ অধ্যায় পৃঃ ৩৬৫-৬৬

৫. তদেব—১৫শ অধ্যায় পৃঃ ৩৬৫

৬. তদেব—১৫শ অধ্যায় পৃঃ ৩৭১
১৬শ অধ্যায় His influence on the Spirit অংশ

৭ তদেব—১৬শ অধ্যায় Shivaji genius analysed ”

৮. Short history of Aurungzib.—Jai Singh against Shivaji ; Capture of Purandar. Ch. X.

৯. Shivaji and his times : Shivaji in the presence of Aurungzib. Ch. VI.

১০. His private life, dress, food and recreations were all extremely simple, but well-ordered. He was absolutely free from vice and even from the more innocent pleasures of the idle rich.

Short history of Aurungzib (3rd edition)
Ch. XIX P. 438

১১. He was of a low stature, with a large nose, slender and stooping with age. The whiteness of his round beard was more visible on his olive-coloured skin. Ch. XIX P. 439, Shivaji and his times : The net closes round Shivaji. Ch. VI.

১২. His industry in administration was marvellous. In addition to regularly holding daily Courts (sometimes twice a day) and Wednesday trials, he wrote orders on letters and petitions with his own hand and dictated the very language of official replies.

Short history of Aurungzib (3rd edition)
Ch. XIX. P. 439-40.

১৩. Broken hearted from disgrace and disappointment and labouring under disease and old age, Jai Singh died from an accidental fall from his elephant on reaching Burhanpur on 28th August 1667.

Short history of Aurungzib.
Ch. XII P. 234.

১৪. In diplomacy he had attained to a success surpassing even his victories in the field.

Short history of Aurungzib.
Ch. X. P. 196.

১৫. "He (Aurungzib) decided to send his ablest Hindu and Muhammadan generals Jai Singh and Dilir Khan to put down Shivaji".

Short history of Aurungzib.
Ch. X. P. 196.

১৬. Shivaji and his times. Ch. V. P. 123-133.

১৭. Ibid, Shivaji interviews Jai Singh.
Ch. V. P. 122.

১৮, Short history of Aurungzib. Ch. XII. P. 234.

১৯. Shivaji and his times :
Mughal policy during Shivaji's Confinement. in Agra.
Ch. VI. P. 148.

২০. Shivaji. P 369

২১. Ibid P 317

২২. Ibid P 332

২৩. Ibid, Shivaji negotiates for submission. Ch. V

২৪. Ibid, Shivaji interviews with Jai Singh. Ch. V

২৫. To the Hindu world in that renewed persecution, Shivaji appeared as the star of a new hope, the protector of the retualistic paint-mark (Tilak) on the forehead of the Hindus and the survivor of the Brahmins.
Shivaji, 15th Ch. P. 371

২৬ Shivaji P. 123-124, P. 132-133, P. 148-149.

২৭. Ibid, Shivaji in the presence or Aurungzib.

২৮. Ibid, Ch. VI. P. 147.

২৯. 50th lunar birthday fell on the 12th May of that year······ This is the reason why the 12th of May was the date fixed beforehand for Shivaji's audience.
Shivaji, Ch. VI, P. 140
—why Shivaji's andience with Aurungzib went wrong.

৩০. Ibid

সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য স্যার যদুনাথ সরকারের গ্রন্থদ্বয় (১) Shivaji and his Times (6th edition) এবং (২) Short history of Aurunzib (3rd edition) থেকে সংগৃহীত।

পঞ্চম অধ্যায়

প্র ব ন্ধ কা র ভূ দে ব

১

সা মা জি ক প্র ব ন্ধ

প্রথম প্রকাশ—এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়। ৭ই জানুয়ারী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শুরু হয়, শেষ হয় ২৪শে জানুয়ারী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ দু'বছর ধরে তিনি এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ লেখা শেষ হবার প্রায় তিন বছব পরে এটি পুস্তকাকাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই তারিখের দিনলিপিতে ভূদেব লিখেছেন—"সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।"[১]

'সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার পূর্বেও ভূদেব সমাজ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এ নিয়ে চিন্তা করেছেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' রচনা করতে গিয়েই তিনি 'সামাজিক প্রবন্ধ' বচনার জন্য অনুপ্রাণিত হন।[২] পারিবারিক প্রবন্ধের প্রথম পনেরোটি প্রবন্ধ লেখা শেষ করেহ পরের সপ্তাহে (২৪শে আষাঢ় ১২৮৩ সাল) লেখেন 'সমাজ কি—একটি দৃষ্টান্ত।' তারপর দু' সপ্তাহে পরপর লেখেন—'সমাজ কিরূপে জন্মিয়াছে' এবং 'সমাজবৃদ্ধির অন্যতর হেতু'। এই তিনটি প্রবন্ধ অবশ্য 'সামাজিক প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ ছাড়াও তিনি সমাজ বিষয়ে আরো কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন—যেগুলি বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয়ভাগে সংকলিত হয়েছে।

'সামাজিক প্রবন্ধে'র ভূমিকায় 'গ্রন্থের আভাস' দিতে গিয়ে ভূদেব এক জায়গায় লিখেছেন—

"একখানি সর্বদেশ-সাধারণ সমাজতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়ন উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায় কি আচার ব্যবহারে, সর্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্তব্যসূত্র অনির্দিষ্ট, এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।

"এইজন্য, ইংরাজরাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান, এবং এই অভূতপূর্ব শান্তিসুখের অবসর প্রাপ্ত-

হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজেদের কর্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্তব্য অবধারণ কার্যের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি জ্ঞান করিব"।৩

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে আজকাল আমরা সমাজতত্ত্ব বা সমাজ-বিজ্ঞান বলতে যা বুঝে থাকি 'সামাজিক প্রবন্ধ' সে জাতীয় গ্রন্থ নয়। ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় এবং ইংবেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ফলে আমাদের দেশে একটি বিশেষ শ্রেণার উদ্ভব হয়। এঁদের চিন্তাধারা এবং আচরণ আমাদের দেশের প্রচলিত চিন্তাধারা এবং আচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে। সামগ্রিক সামাজিক জীবনে এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার প্রকৃতি বিচার করে দেখাই এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য। কারণ লেখকের মতে এব ফলে কর্তব্যনির্ণয় সহজ হবে। ভূদেব এই গ্রন্থে ভারতেব অতীত ইতিহাস আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন ভারতের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কি। সেজন্য কি করা কর্তব্য তাঁর বিশ্বাসমতে তার নির্দেশও দিয়েছেন।

ভূদেব ছয়টি অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের রূপ অঙ্কন করেছেন। কোনো জাতির আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন 'জাতীয় ভাবের' জাগরণ। ভূদেব তাই প্রথমে জাতীয় ভাব কি, তার উপাদান কি এবং তার সম্বর্ধনের পথ কি তা আলোচনা করেছেন। জাতীয় ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ কিনা সে প্রশ্নও এসেছে। তারপর স্বাভাবিকভাবেই এসেছে ভারতসমাজের কথা। ভারতসমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে তা এতই স্বতন্ত্র যে প্রচলিত ইউরোপীয় সমাজের মানদণ্ডে তার বিচার করা ভুল। ইংরেজরা সম্পূর্ণ একটি আলাদা সমাজের লোক। তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার সব স্বতন্ত্র। সেই অভিনব সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারত-বর্ষের জনজীবনে যে সংঘাত বেধেছে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক তার পর্যালোচনা করেছেন, দেখাতে চেয়েছেন তার সুফল ও কুফল কি। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য ইংরেজদের প্রকৃতি ও চরিত্র এবং তাঁদের দোষগুণ। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ভারতের 'ভবিষ্যবিচার' করেছেন। সেই ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করতে হলে যা করা কর্তব্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেকথাই বলেছেন।

এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে ভূদেবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো

১। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

২। ভারতের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সুগভীর আশা ও বিশ্বাস।

৩। ভারতের বর্তমান অবনতির কারণ বিশ্লেষণে তাঁব স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি।

৪। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব।

৫। মুসলমান ধর্ম এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের দান সম্পর্কে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং উদাব মনোভাব।

৬। ইংরেজদের দোষ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সোচ্চার হলেও তাঁদের গুণাবলীর স্বীকৃতি এবং ভারতবাসীর পক্ষে তার কোনো কোনোটি শিক্ষা করার যে প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে দ্বিধাহীন অভিমত প্রকাশ।

৭। বিচিত্রভাষী ভাবতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পারস্পরিক ভাবেব আদান-প্রদান ও জাতীয় সংহতির জন্য যে একটি বিশেষ ভাবতীয় ভাষার প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে দূরদর্শী চিন্তা।

৮। কৃষিজীবী ভারতেব পক্ষে যে শিল্পবিজ্ঞানেব চর্চা অবশ্যকর্তব্য এবং সেজন্য বিদেশে যাওয়াও প্রয়োজন সে বিষয়ে সংস্কারমুক্ত মনের পবিচয়।

৯। ভাবতবর্ষের জাতীয় মুক্তি যে একজন সর্বগুণে গুণান্বিত জাতীয় মহাপুরুষের দ্বারাই সম্ভব হবে সেবিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

১০। সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যসভ্যতা সম্পর্কে সহানুভূতি।

১১। সর্বোপরি সমগ্র আলোচ্য বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করে প্রাঞ্জলভাষায় তার প্রকাশ।

এককথায় মনীষী ভূদেবের ভারতচিন্তাব সুনিশ্চিত পরিচয় বহন করে 'সামাজিক প্রবন্ধ'। ভারতসমাজের এমন সামগ্রিক বিচার এবং এমন অখণ্ড ভারত-বোধের পরিচয় ভূদেবের পূর্বে আর কেউ বোধ হয় করতে বা দিতে পারেননি। একদিকে ইংরেজী শিক্ষিতদের বিদেশীয়ানার অন্ধ অনুকরণ আর একদিকে এক-শ্রেণীর হিন্দুর বিচারশক্তিহীন গোঁড়ামি, এ দুয়ের মধ্যে ভূদেব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট সহানুভূতি এবং অনুরক্তি সত্ত্বেও তিনি সব কিছুকে যুক্তি দ্বারা বিচার করে নিয়েছেন এবং অন্যদের কাছেও যা শিক্ষণীয় সশ্রদ্ধ চিত্তে তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন। এই প্রবন্ধগুলি মূলত যাঁদের লক্ষ্য করে লেখা তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ভারতীয়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখক। 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।

২

সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেবের বক্তব্যের সার সংকলন

প্রথম অধ্যায়—জাতীয়ভাব—তাৎপর্য

কোনো জাতিকে তার আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে সব থেকে আগে প্রয়োজন জাতীয় ভাবের জাগরণ। জাতীয়ভাব দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক চেতনার সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে একজাতি একপ্রাণ একতার সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তানায়ক ভূদেব এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং কিভাবে সেই সত্যকে রূপায়িত করে তোলা যায় সে বিষয়ে স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী পথনির্দেশ করেছিলেন।

ভূদেব ভারতবর্ষকে সনাতন হিন্দুভারত বলেই বিশ্বাস করতেন। হিন্দুর বিচ্ছেদপ্রবণতা এবং স্বজাতিবিদ্বেষই হিন্দু-সমাজের অখণ্ড ঐক্য গড়ে তুলতে বিরোধিতা করেছে। সেই মনোভাবটিকে সবার আগে বর্জন করতে হবে। তাঁর মতে এ বিষয়ে হিন্দুর আদর্শস্থল হলো মুসলমান। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের যে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং ভালোবাসা রয়েছে তা অতুলনীয়। এ মনোভাবটি অনেক সময় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণু হলেও স্বীয় সমাজের ঐক্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই সঙ্গে ভূদেব ভারতসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মুসলমান খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কেও সমান মর্যাদায় গ্রহণ করার কথা বলেছেন। হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতসমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে,—ইংরেজ এ সত্য জানে বলেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে নিরন্তর প্রয়াসী। সুতরাং হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এ সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, না হলে তাদের অনেক বড়ো সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হবে।

'জাতীয়ভাব' ব্যাখ্যায় ভূদেবের বিশ্লেষণশক্তি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এবং প্রসারতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জাতীয়ভাব কি, তার উপাদান এবং তা সম্বর্ধনের উপায় কি—এই তিনটির আলোচনায় তাঁর এই গুণগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সামাজিক প্রকৃতি—তাৎপর্য

ভূদেবের মতে কোনো সমাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার শুরুতেই প্রয়োজন সেই সমাজের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করা। ভারতবর্ষের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয় করতে

গিয়ে ভূদেব তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসমাজের মূল প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। বিভিন্ন ধর্মদর্শনের আলোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাঁর মতে—

১। প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তিপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত।

২। ঐরূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু দ্রব্য-গুণবাদ-তৎপর বৌদ্ধজাতীয়েরা শান্ত, পরিশ্রমী, ধৈর্যশালী এবং সাধনশীল।

৩। ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খ্রীষ্টধর্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল এবং ভোগসুখলিপ্সু।

৪। ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী মুসলমান অশান্ত, স্বৈরাচার এবং সাম্যধর্মী। ভূদেবের এই বিশ্লেষণ তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচায়ক।

সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন পাশ্চাত্য মতবাদগুলি আলোচনা করে ভূদেব তার অসারতা এবং অসম্পূর্ণতা কোথায় তা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে নির্বিচারে সকল সমাজের বিচার করা অনুচিত এবং ভুলও বটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভুল করে থাকেন। তাছাড়া তাঁদের সর্বদাই চেষ্টা অন্যান্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য জাতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা প্রচার করা। ভূদেব এই মনোভাবের নিন্দা করেছেন।

সামাজিক প্রকৃতি আলোচনায় ভূদেব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন স্বত্বাধিকারের উপর এবং এই প্রসঙ্গে এনেছেন বিভিন্ন সমাজের বিবাহপদ্ধতির কথা। বিবাহ কোন বয়সে হওয়া উচিত সে নিয়েও নানা মত। সমাজের প্রথমাবস্থায় সমাজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য লোকসংখ্যার আধিক্য প্রয়োজন হয়। তাই কোনো সমাজেই প্রথমদিকে বিবাহ পদ্ধতি বা বিবাহের বয়স নিয়ে কোনো কঠোর নিয়ম থাকে না। কিন্তু কালক্রমে লোকসংখ্যা কমানোর নানা প্রয়োজন দেখা দেয়। ভূদেবের দৃষ্টি এই বিষয়টিকেও লক্ষ্য করেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন শুধু আজকের প্রশ্নই নয়—এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। ভূদেবও এই-প্রশ্নের সারবত্তা স্বীকার করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়—পাশ্চাত্যভাব—তাৎপর্য

হিন্দু এবং ইংরেজ এই দুটি জাতি সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অথচ ভারতবর্ষে এই দুই সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষে

এমন কতকগুলি নূতন ভাবের আগমন হয়েছে যা বিশেষ করে আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত একটি বিশেষ শ্রেণীর আচরণে এবং মনোভাবে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছে। হিন্দুর যে চিরন্তন জীবনাদর্শ এই আচরণ আর মনোভাব একান্তভাবেই তার বিরোধী হয়ে উঠেছে। ভূদেব দেখিয়েছেন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে এর কোনোটাই আমাদের দেশে নতুন নয়। স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা, সাম্য, ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা আর শাসনকর্তার সমাজ প্রতিভূত্ব—সাধারণত এই সাতটি ভাব পাশ্চাত্য ভাব বলে উল্লিখিত হয়। ভূদেব একে একে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে এই ভাবগুলি যে রূপ নিয়ে প্রচলিত সে রূপ খুব গৌরবজনক নয়। বরং হিন্দুধর্মেই এই ভাবগুলিকে অনেক-বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত করে দেখা হয়েছে। হিন্দুর পক্ষে কখনোই স্বার্থপর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ হিন্দু পরচিত্তজ্ঞ। ইংরেজ সর্বদা যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে তৎপর, তেমনি আবার স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানেও সজাগ। তবে ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন স্বদেশীয় যে কোনো ভাবই মর্যাদা হারাচ্ছে তখন সাময়িক ব্যবস্থাহিসেবে হিন্দুর পক্ষে ইংরেজের ন্যায় 'স্বজাতিবৎসল, স্বজাতি-পক্ষপাতী , স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদোষপ্রচ্ছাদক' হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে।

উন্নতিশীলতা প্রসঙ্গে বলা হয় মানবজাতির আকৃতিগত ক্রমবিবর্তন ঘটে চলেছে এবং তার ফলে যেসব জাতি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে তারা ইউরোপীয় এটি নিতান্তই সংকীর্ণ মতবাদ এবং অবৈজ্ঞানিকও বটে। আসলে এর দ্বারা অ-ইউরোপীয় জাতিগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে জগতে কোথাও সাম্য নেই। মানুষ একান্তই স্বার্থপর এবং সর্বদাই সে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সাম্যবাদ প্রচার করেন যার দ্বারা সর্বজাতি এবং মানুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আচারে-ব্যবহারে সমদর্শী হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার স্বীকার করতে হবে—কার্যত সেই আদর্শের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। আর শুধু যদি আদর্শ হিসেবে বিচার করতে হয় তাহলে এর চাইতেও মহত্তর আদর্শ আমাদের হিন্দুধর্মেই আছে। হিন্দুধর্মে শুধু সকল মানবে নয়, চেতন অচেতন সর্বজীব এবং সর্ববস্তুতেই একটি মৌলিক একত্ববোধ অনুভূত এবং স্বীকৃত।

ঐহিকতায় প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়—বলা হয় সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখের কাল বর্তমান আর স্থান এই পৃথিবী। কিন্তু এ মতবাদও ভারতবর্ষে নতুন

নয়। আমাদের দেশের চার্বাকের মতেও এই কথাই বলা হয়েছে। এভাব ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাসাধক—তাই প্রকৃত কল্যাণকর হতে পারে না।

স্বাতন্ত্রিকতাবোধ ব্যক্তিগতভাবের অনুকূল—তা সামাজিকতাবোধের বিপরীত। সামাজিকতাবোধে যে সমষ্টিগত চিন্তা ও প্রচেষ্টা স্বাতন্ত্রিকতাবোধে তা ব্যষ্টিগত। ইউরোপের নব্য সমাজগুলিতে এই স্বাতন্ত্রিকতাবোধ প্রাধান্য পেয়ে আসছে এবং ইংরেজের মাধ্যমে আমাদের দেশে এ-ভাব ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে চলেছে। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হয়েছে হৃদয়ের অনুজ্ঞাই সকল কর্মের নিয়ামক হওয়া উচিত। কিন্তু তবুও নির্বিচার স্বাতন্ত্রিকতাবোধ কখনোই সর্বার্থসাধক হতে পারে না। সামাজিকতাবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যেই স্বাতন্ত্রিকতার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিকতার মূলকথা প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল। প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও আবার পরীক্ষা করে নিতে হয়। ইউরোপ বাহ্যবিজ্ঞানশাস্ত্রে অশেষ উন্নতিলাভ করেছে, সে বিষয়ে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানশিক্ষা শুরু হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। তা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের মাধ্যমে দান করা হয় না—পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমেই হয়। এতে সত্যকে নিজে জেনে বুঝে নেওয়া হয় না। অন্যের বক্তব্যকে বিনা পরীক্ষায় মেনে নেওয়া হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার পরীক্ষা এবং প্রয়োগ যেদিন সম্ভব হবে সেদিনই কেবল আমাদের দেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞানশিক্ষা সার্থক হবে।

ইউরোপে রাজশাসনকে ধর্মশাসনের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। আর রাজাকে সেখানে সমাজের প্রতিভূ বলে গণ্য করা হয়েছে। ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মশাসনেরই প্রাধান্য স্বীকৃত। রাজশরীর এদেশের দেবশরীর বলে গণ্য হলেও রাজদণ্ডবিধিই এখানে রাজা বলে গৃহীত। 'রাজা' নামে কোনো ব্যক্তিই সেই বিধিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। ইউরোপে রাজার প্রজার চুক্তি চলে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রজার মঙ্গলের জন্যই রাজার এই বিধিপালনকেই রাজধর্ম বলে। সুতরাং আমাদের দেশেও কার্যত রাজা সমাজের প্রতিভূ হয়েই আছেন।

তাই লেখকের মতে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইসব পাশ্চাত্যভাবকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার যে প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে তা নিন্দনীয়। ইংরেজী শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ভালোমন্দ বিচার করে তবেই তা গ্রহণ করা উচিত। এজন্য প্রয়োজন পরিশ্রম, অধ্যয়ন আর চিন্তা। নিশ্চেষ্টতা থেকেই অনুকরণ-প্রবৃত্তি জাগে আর নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুর পূর্বরূপ। সুতরাং তা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়—ইংরাজাধিকার—তাৎপর্য

ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষের কতকগুলি উপকার হয়েছে, একথা সত্য। যেমন—দেশে একশাসনের গুণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অন্তর্দেশীয় মেলামেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে, বিদেশী আক্রমণের ভয় দূর হয়েছে। এজন্য ভারতবাসীর ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ইংরেজের বড়ো দোষ ইংরেজ কিছুতেই কাউকে নিজের সমকক্ষ বলে মনে করে না। ইংবেজশাসনে রাজশক্তি সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মাধিকরণ বরাবর রাজশক্তির ক্ষমতার বাইরে ছিল। এই ভাবেই এখানে শক্তি-সামঞ্জস্য স্থাপিত হযেছিল। রাজশক্তির যথেষ্ট প্রয়োগ-ক্ষমতা যে প্রজাদেরই স্ব-চেষ্টায় খর্ব কবে রাখতে হয়, একথা ভারতবাসী জানে না। তাই এখানে রাজায় প্রজায় মিল নেই। তাই ইংরেজ শাসনে রাজশক্তি যথেচ্ছ হয়ে উঠেছে, তবে ইংরেজ রাজশক্তি এদেশের ধর্মব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি। ইংরেজের আর এক দোষ সে আত্মদোষ দেখতে পায় না। মুসলমানগণ এদেশকেই নিজের দেশ বলে গ্রহণ করে এদেশের জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই তারা শেষ-পর্যন্ত এদেশের জনগণের ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পেরেছিল। কিন্তু ইংরেজগণ নিজের দেশকে কোনোদিন ভুলতে পারে না। তারা যেখানে যায় সে জায়গাকে নিজের দেশের মতো করে নেয়, নিজেরা তাদের মতো হয় না। তাই তারা কারো আপন হতে পারে না। তাদের এই বৈদেশিক ভাবের জন্যই তারা ভারতবাসীর প্রকৃত ভালোবাসা লাভ করতে পারে না। ইংরেজ শাসন কেন এদেশে প্রজানুরঞ্জক হতে পারছে না—তার অন্যান্য কারণগুলিও তিনি আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়—ভবিষ্যবিচার - তাৎপর্য

ইউরোপে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কোঁৎ। তাঁর কল্পিত ভবিষ্যৎ হলো—পৃথিবী ধর্মভেদ, বর্ণভেদ রহিত হবে, যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না, বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা দূর হবে, জনগণ সর্বত্র যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, অভ্যাসগুণে স্বার্থপরতা বিলীন হবে। ভূদেব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে—পৃথিবীতে ধর্মভেদ এবং বর্ণভেদ কোনোদিন দূর হবে না, তবে বিদ্বেষভাব দূর হতে পারে। যুদ্ধবিগ্রহও সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না। কারণ পৃথিবীজাত ভোগ্যবস্তু এবং পৃথিবী দুই সসীম। সুতরাং তার অধিকার

নিয়ে বিরোধ থাকবেই। তবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রসারণ দ্বারা সর্বজনমান্য কোনো সভা সংস্থাপন করে এই সব সমস্যার বিনাযুদ্ধে মীমাংসার ভার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের মূলকারণ কোনোদিন দূর হবে না। বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন বন্ধ হলেও ক্ষমতাশীল লোকে কোনো না কোনো ভাবে সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হবে। শাসনের ভার যাজক সম্প্রদায়ের হাত থেকে চলে যাবে। যাজক, শাস্তা, শ্রমজীবী এই তিনভাগ ভারতবর্ষে হয়েই আছে। তবে অতিপল্লবিত হয়ে ওঠায় তার সুফল কমে গেছে। কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ করতে পারলে আবার সেই পূর্বগৌরব ফিরে পাবে। আর স্বার্থপরতা থেকেই পরার্থপরতার জন্ম। মানবমন কোনোদিন সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হতে পারে না। সুতরাং ভূদেবের মতে কোঁতের সব অভিমতই নির্ভুল নয়।

ভবিষ্যতে ভারতের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ কার্যকরী হতে পারে না, এদেশে কোনো বিদেশী উপনিবেশ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির সমীকরণ সম্ভব, আর এদেশ থেকে জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হতে পারে না। ভারতের দিন দিন হীনতার কারণ কি, সে হীনতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে কিনা এবং তা কোন্ অভিমুখীন তা বিশেষ বিবেচনা করে দেখা দরকার। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মধ্যে একজন সর্ববাদিসম্মত প্রকৃত সংস্কারকের আবির্ভাব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে গবর্নমেণ্টকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়রূপে মেনে চললে ক্ষতি নেই। ইংরেজ শাসনে ভারত যে একতা লাভ করেছে সেজন্য ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং সে একতা রক্ষার ব্যাপারে তারা ইংরেজকেই প্রধান সহায় বলে মেনে নিতে পারে। বীরপ্রকৃতির ইংরেজ যাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তাকে ভালোবাসতেও পারে না। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীগণ তা জানেন, তাই তাঁদের মধ্যে নানা রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর সকল প্রচেষ্টার পিছনে রয়েছে ইংরেজের সাহায্য, এতে অনুকরণপ্রিয়তা জাগে। কিন্তু অনুকরণের দ্বারা কোনো প্রকৃত কাজ হয় না। কারণ একদেশের সমাজের নীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকেদের স্বভাব, শিক্ষা, অভ্যাসের উপযোগী হয় না। এ প্রণালী অনুপযোগী। সুতরাং ইংরেজের নেতৃত্বে এখানে প্রকৃত কাজ হতে পারে না। সেজন্য নেতার প্রয়োজন একান্ত হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়—কর্তব্যনির্ণয়—তাৎপর্য

ইংরেজের বড়োগুণ—সম্মিলন প্রবণতা। ভারতবাসীর মধ্যে এই সম্মিলন শক্তিরই একান্ত অভাব। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা এবং অনুবর্তন না করা তার মর্মগত মহাপাপ এবং তাব সমস্ত দুর্গতির ও অধঃপতনের মূল। কোনো স্বদেশীয় নেতৃ-পুরুষের দ্বারাই একমাত্র এইসব দুর্গতি এবং অধঃপতন রোধ করা সম্ভব—লেখকেব একান্ত বিশ্বাস তাই। সেই নেতৃপুরুষকে হতে হবে আত্মত্যাগী, স্বদেশবাসীব প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, সকল ভারতবাসীব মধ্যে সম্মিলন সাধনের উপায় আবিষ্কারক, সকল সম্প্রদাযের প্রতি সমান পক্ষপাতশূন্য, স্বদেশের অতীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান, শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সন্নিবিষ্ট হবে তাঁর শিক্ষায়, আর থাকবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদাবতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণ। আর স্বদেশবাসীর কর্তব্য সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এমন মহাপুরুষ নেতার আবির্ভাবের উপযুক্ত পবিবেশ সৃষ্টি কবা। যে যে কাজেব দ্বাবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পবম্পরা সম্বন্ধে পবার্থপরতা প্রবল হবে, সম্মিলন প্রবণতা বাড়বে, আত্মসংযম বৃদ্ধি পাবে এবং পাশবভাব দুর্বল হবে—তাতেই ভারতসমাজের বলবৃদ্ধি। বিদ্যাহীনতা এবং ধনহীনতা ভারতসমাজেব প্রধান দুটি দোষ। বিদ্যা-হীনতার কারণ শিক্ষকসমাজেব তেজহীনতা এবং দবিদ্রতা। প্রথমে তা দূর কবা একান্ত আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে ইউবোপীয় বিজ্ঞানেব প্রকৃত শিক্ষাও কাযকবী করতে হবে। সেজন্য বিদেশগমনও বিধেয়। সেই সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন করতে হবে। আর প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার জন্য সভাসমিতি স্থাপন। ধনহীনতার প্রধান কারণ দেশীয় শিল্পের অবনতি। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন যৌথকারবারের প্রতিষ্ঠা করা। পরিশেষে লেখক বলছেন জাতীয় ভাবটি উচ্চভাব হলেও উচ্চতম ভাব নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সে ভাবটির চর্চার প্রয়োজন আছে।

৩

ভূদেব ও ভারতবর্ষের মুসলমান

সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব ভারতবাসী বলতে প্রধানত হিন্দুদের বোঝালেও মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কেও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভারতবাসীর মনে একটি অখণ্ড ভারতবোধ জাগিয়ে তুলতে

হলে সকল ধর্মসম্প্রদায়কে মিলিত হতে হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেছেন। তবে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে মুসলমানগণ দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মসম্প্রদায় বলে এবং ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের অধীন ছিল বলে মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি একটু বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই ভূদেবের আর যেসব গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে সেগুলির কথা মনে আসে। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'তেও তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কাহিনী নির্বাচনেও তাঁর এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এডুকেশন-গেজেটে প্রচারিত অন্যান্য প্রবন্ধ তো আছেই।

মুসলমানদের দোষ এবং গুণ নির্বাচনে ভূদেব নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মতে মুসলমানরা অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মনিষ্ঠ জাতি। এ বিষয়ে তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু। স্বভাবে তারা অশান্ত এবং স্বৈরাচারী। কিন্তু মুসলমানদের প্রধানগুণ সাম্যবোধ। একজন মুসলমান অন্যজন মুসলমানকে সর্বদা সমান দৃষ্টিতে দেখে। তাদেব ধর্মে ছোটবড়ো উঁচুনীচু নেই। ধর্মপ্রচারের অনুপ্রেরণাতেই তারা বিশ্ববিজয়ে বের হয়েছিল, লুটপাট করে নিজেরা ধনশালী হবে বলে নয়। যেখানে গেছে সেখানে বিবাহ এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে তারা নিজেদের ধর্মপ্রচার করেছে এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে সাদরে স্বীয় সমাজে গ্রহণ করেছে, এমনকি রাজকার্যেও নিযুক্ত করেছে। ভূদেবের মতে, স্বধর্মে সুগভীব ভক্তিমূলক এই যে উদাবতা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ।[৩] তিনি আরো লিখেছেন—"সাম্যবাদের একটি অতিমনোহর শক্তি আছে। মুসলমানধর্ম সেই সাম্যবাদ বলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যধর্মী। ফলতঃ মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা।"[৪]

এই সাম্যবাদী মুসলমানদের কাছে ভারতবাসীর ঋণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"মুসলমানদের ভারতরাজ্যশাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সাধারণ হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্যশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহাঋণগ্রস্ত।"[৫] 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ভূদেবের অনুরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"আর একটি নরকুল ঐ মহাদেশে লব্ধপ্রবেশ হইল। ইহারা সাহসিক, বীর্যবান, ও একাগ্রচিত্ত। ইহারা মহাদেশটিকে পুনর্বার একচ্ছত্রের অধীন করিল, ভাষাভেদ

প্রায় রহিত করিয়া আনিল, হর্ম্য এবং বর্ত্মাদির নির্মাণদ্বারা দেশের শোভা সম্পাদন করিল এবং মনুষ্যমাত্রেই পরস্পরতুল্য এই মহাবাক্যের পুনঃপুনঃ উচ্চারণদ্বারা সম্মিলন সাধনের যত্ন করিল।"৬ তবে কেন তারা সম্পূর্ণ সফল হলো না তিনি তার কারণও নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে "ইহারা রজোগুণপ্রধান, বিলাস-পরায়ণ ও সুখাভিলাষী লোক। ইঁহাদিগের সমাগমে মহাদেশমধ্যে সত্ত্ব এবং রজোগুণের একত্র অবস্থান মাত্র হইল—উভয় গুণের সম্মিলন হইল না।"৭ এই বিশ্লেষণ ভূদেবের উদার এবং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দান করে।

ভূদেব এজন্যই মুসলমানদের ভারতসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' লিখেছেন –

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানরাও ইঁহার পালিত সন্তান।

"এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আমাদিগের মধ্যে কি পূর্বের মতো বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদরপূরণ করিব?"৮ ভূদেব এই যে অপরের উদরপূরণের প্রশ্ন তুলেছেন সে প্রশ্ন অন্যত্রও করেছেন। তিনি লিখেছেন—ইংরেজরা তাদের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দুমুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাতে সচেষ্ট। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান যদি এর দ্বারা ভ্রান্তপথে চালিত হয় তাহলে দুজনেরই সর্বনাশ। তিনি লিখেছেন—"এই রাজনীতি সর্বতোভাবে দুষ্য। কিন্তু উহা যতই দুষ্য হউক ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ঐ সকল ইংরাজ মুসলমানের আদর যতই করুন মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া যতই কথা কহুন আর পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন—তাহাতে হিন্দুদিগের কোন-মতেই ঈর্ষা করা উচিত নহে। ঈর্ষা করিলেই উহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"৯ ইংরেজের সেই অভীষ্ট ছিল ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা। সে সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি ঠিকই কিন্তু ইংরেজ হিন্দু মুসলমানে এই বিচ্ছেদ ঘটাতে সফল হয়েছিল। আর তার পরিণামে হয়েছে দেশ বিভাগ। এই ঘটনা ভূদেবের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

ভূদেব চেয়েছিলেন হিন্দুসমাজ সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও স্বজাতিবিদ্বেষ থেকে মুক্ত হোক। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দুদের বরাবরকার পতনের কারণ স্বজাতিবিদ্বেষ। এরচেয়ে মহাপাপ আর কি হতে পারে। এ বিষয়ে মুসলমানদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা প্রশংসনীয়। ভূদেবের মতে "স্বধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি একান্ত সহানুভূতি সম্বন্ধে উঁহারা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়া আছেন।"

ঐতিহাসিক কারণেই যে মুসলমানগণ এদেশের অধিবাসী হয়ে গেছেন ভূদেব সশ্রদ্ধভাবে তাদের দোষগুণ আলোচনা করে প্রসন্নচিত্তেই তাদের গ্রহণ করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন—"ইংলণ্ডে যেমন ধর্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে।"[১০]

মুসলমানদের সম্পর্কে এমন উদারতা আর সহিষ্ণুতার পরিচয় ভূদেবের পূর্বে রামমোহন এবং পরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো জ্ঞানবান পুরুষও এই বিষয়ে ভূদেবের সমকক্ষ নন। ['সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার সমকালে 'এডুকেশন গেজেটে' ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান সমস্যা নিয়ে ভূদেব অনেক আলোচনা করেছেন। তাতে বারবার তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের উপর জোর দিয়েছেন। সাময়িকপত্রের সম্পাদক অধ্যায়ে সে সব প্রবন্ধের উল্লেখ ও আলোচনা করা হয়েছে]।

৪

মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোঁতের মতের আলোচনা

মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় ইউরোপে প্রধানত দুটি বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এক—বৈজ্ঞানিক বিচার, দুই—ধর্মশাস্ত্রের বিচার।

বৈজ্ঞানিক বিচারে বলা হয়—পৃথিবী ক্রমশ তাপশূন্য হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি কঠিন শীতল পদার্থে পরিণত হবে এবং সমস্ত প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর একদল বিজ্ঞানী বলেন—বিজ্ঞানের উন্নতির বলে প্রাকৃতিক জগতে যে বিভিন্নতা আছে একদিন তা দূর হবে এবং মানুষের মধ্যেও তার প্রভাব পড়বে। ফলে একজাতি, একভাষা, এক শাসন প্রণালী গড়ে উঠবে।

ধর্মশাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তাতে একেশ্বরবাদীদের

মত সকলেই তাঁদের মতবাদ মেনে নেবে যারা নেবে না তারা ধ্বংস হবে। নিরীশ্বরবাদী আর সর্বেশ্বরবাদী উভয়েরই মত পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়—সবই চক্রনেমি—ক্রমে পরিবর্তিত হয় এবং হতে থাকবে।

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্মমত উভয়কে সামনে রেখে এবং ইতিহাসের সাহায্যে অগস্ট কোঁৎ একটি নূতন মতবাদ কল্পনা করেছেন।—তাঁর মতে—

"১। পৃথিবীতে ধর্মভেদ রহিত হইবে ২। বর্ণভেদ রহিত হইবে ৩। যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যাইবে ৪। বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে ৫। শাসন এবং শিক্ষাকার্য পরিত্রাতা পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে ৬। জনগণ সর্বত্র যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে, এবং ৭। অভ্যাসগুণে পরার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্বার্থপরতার আসন পরিগ্রহ করিবে।"[১১] ভূদেব এই সাতটি মতের আলোচনা করে তার দোষগুণ বিচার করেছেন।

১। কোঁতের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রমাণ করা যায় না এবং মানবজাতির হিতসাধনই যখন ধর্মবুদ্ধির মূল ও চরমকথা তখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সমস্ত উপধর্মের প্রতি বিশ্বাস দূর হবে ও নরদেব পূজার প্রচলন হবে।

ভূদেবের মতে সর্বেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি সব রকম প্রমাণের দ্বারাই সুসিদ্ধ এবং সর্বজ্ঞত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বপ্রীতি, বিশ্বসৌন্দর্য সর্বেশ্বর মতবাদে যখন অনুভূত তখন কাল্পনিক একটি নরদেব পূজার প্রচলন অসম্ভব। তাঁর মতে কালক্রমে সর্বেশ্বর মতবাদেরই বিস্তার হবে।[১২]

২। বর্ণভেদ সম্পর্কে ভূদেবের অভিমত—

প্রাকৃতিক ভেদই বর্ণভেদের মূল কারণ। সুতরাং বিজ্ঞানের উন্নতির বলে প্রাকৃতিক ভেদ দূর হলে বর্ণভেদও দূর হয়ে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই উন্নতি কি সম্ভব, আর সম্ভব হলেও তা সুদূরপ্রসারী। তবে বিভিন্ন বর্ণের লোক একদেশে একত্রে বাস করতে থাকলে বিবাহ প্রভৃতির বলে বর্ণসংকর ঘটে। তখন বর্ণভেদের ব্যবধান কিছুটা কমে আসে। তবে "যে যে কারণে পূর্বে বর্ণভেদ জন্মিয়াছে সে সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে পরিবৃতির ভেদে আকার ভেদ এবং যোগ্যতার অনুসারে বংশের রক্ষা, তাহা তো কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না।"[১৩]

৩। যুদ্ধবিগ্রহ উঠে যাওয়া সম্পর্কে—

পৃথিবী এবং পৃথিবীজাত ভোগ্যবস্তুর সসীমতাই মানুষে মানুষে সমস্ত বিরোধের

মূল কারণ। ভোগ্যবস্তু অসীম হলে মানুষের এই সব বিরোধের একটা চিরস্থায়ী হেতু দূর হতো। তবে "বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের মধ্যে সকলের মাননীয় এমন একটি সভাব সংস্থাপন হইতে পারে, যে সভা বিভিন্ন জাতীয় বিবাদের হেতু জানিয়া বিনা যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধের মূলকারণ কিছুতে যাইবার নহে। সুতরাং তাহা একেবারে, মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।"[১৪]

৪। বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা রহিত হওয়া সম্পর্কে ভূদেবের মত— "কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি জাতীয়ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া পুনর্বার সম্মিলিত শাসন প্রণালী গ্রহণপূর্বক প্রদেশ প্রমাণ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং ক্ষমতাশীল লোকেরা আবার বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে। পরার্থপরতার সহস্র বৃদ্ধিতেও ঐ কার্যের নিবারণ হইবে না।"[১৫]

৫। শিক্ষা এবং শাসনের ভার যাজকবর্গের হাতেই আছে। কেবল প্রটেস্টান্ট-মতবাদী দেশগুলিতে যাজকদের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক আর সব ধর্মেই যাজকবৃন্দই শিক্ষাদান করে থাকেন। "অতএব যাহা পূর্বে ছিল, এখনও আছে, তাহা পরেও থাকিবার সম্ভাবনা।"[১৬]

শাসনকার্যের ভার অবশ্য ক্রমশ যাজকদের হাত থেকে সরে আসছে।

৬। রাজ্যের লোক যাজক, শাস্তা ও শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সম্পর্কে ভূদেব বলেন—"স্থূলতঃ ঐ প্রকার বিভাগই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরেও ঐ বিভাগ বলবৎ থাকিবারই সম্ভাবনা।"[১৭]

৭। মানবহৃদয়ে পরার্থপরতার সম্যক স্ফুরণ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য—স্বার্থবোধ আর পরার্থবোধ মানবজীবনে পরস্পর অনুস্যূত। "বস্তুতঃ যদি মানবমন একেবারেই স্বার্থবোধশূন্য হয়, তাহা হইলে উহা পরার্থবোধেও অক্ষম হইয়া পড়ে—তখন মানুষ পরের উপকার কিসে তাহা জানিতেই পারে না। কোমটিও ঐরূপ স্বার্থশূন্যতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।"[১৮] কোঁতের উদ্দেশ্য ছিল একান্ত স্বার্থবোধসম্পন্ন ইউরোপীয়দের মনে পরার্থবোধের উন্মেষ ঘটানো।

উপসংহারে ভূদেব লিখেছেন—"মনুষ্যসমাজের প্রতি আন্তরিক হিতৈষা প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর সুতীক্ষ্ণধী অগস্ট কোমটি যেরূপে ভবিষ্যগণনা করিয়া

গিয়াছেন তাহা কিয়ৎপরিমাণে তথ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য। তিনি ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা মনুষ্যসমাজের প্রতি যে সকল শক্তির কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং অনেকটা সংযতচিত্ত হইয়াও বিচার করিতে পারিয়াছিলেন।"[১৯] তবে তিনি (কোঁৎ) নিতান্ত তাড়াতাড়ি করে একটা মতবাদ গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন বলেই তাঁর মতবাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারেনি—এই হলো ভূদেবের অভিমত।

এইভাবে অগস্ট কোঁতের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান হয়েও ভূদেব তাঁর মতামতকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

৫

ভূদেবের দৃষ্টিতে ইংরেজ জাতি ও ইংরেজ শাসন

ইংরেজ চরিত্র

ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ভূদেব ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাই তাঁদের চরিত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। 'সামাজিক প্রবন্ধে' 'ইংরেজ সমাগম' প্রবন্ধে তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"ইংরাজ কার্যতৎপর, কার্য-কুশল অহঙ্কারী এবং লোভী"[২০] 'স্বার্থপরতা' প্রবন্ধে লিখেছেন—'ইংরাজের স্বার্থ বড়ই সঙ্কীর্ণ পদার্থ—ইংরাজের বিষয়জ্ঞতা অধিক, ইংরাজ নানা দিগ্দেশে গমন করেন, নানা প্রকার সমাজ দেখেন, বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্তু তিনি যেমন আপনার রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে একান্ত দৃঢ়সম্বদ্ধ এমন আর কোন জাতি নয়। তিনি নিজেও কাহারও হইতে পারেন না, কাহাকেও আপনার করিতে পারেন না।..

"...ইংরাজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী।"[২১] কিন্তু তারপরই তিনি বলছেন—ইংরেজদের এই স্বার্থবোধ তাদের চরিত্রের পক্ষে ততটা দুষণীয় হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ভূদেব লিখেছেন—"ইংরাজের স্বার্থবোধ অতি গাঢ়তম তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাঁহার মনের যাবতীয়ভাব ঐ স্বার্থবোধে নিমজ্জিত। যেটিতে তাঁহার স্বার্থ, সেটি তাঁহার মনে চিরকাল ধর্মজ্ঞানের অবিরোধীরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে ইংরাজ একেবারেই সহানুভূতিশূন্য। তিনি বুঝিতেই পারেন না যে যাহাতে তাঁহার স্বার্থ

সেটি কেমন করিয়া ধর্মব্যাঘাতক অথবা অপরের অনিষ্টজনক হইতে পারে, তিনি যাহাতে সুখী, সমুদয় জগৎ তাহাতেই সুখী নয় কেন—এইরূপ একটি বালসুলভ মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান।"[২২]

(পাশ্চাত্যভাব—স্বার্থপরতা)

ইংবেজের এই স্বার্থবোধ আরো একটি কারণে কিছুটা গুণও অর্জন করেছে—লেখক তাও লক্ষ্য করেছেন। তিনি লিখছেন—"কিন্তু ইংরাজের স্বার্থজ্ঞানে একটু সতেজ রজোগুণের মিশ্রণ আছে। ইংরাজ আপনার জাতিব স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থে অনেকটা অভিন্নতা দেখিতে পায়।...ইংরাজ সর্বদাই স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানে মনোযোগী স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ ও উদ্যতপ্রহরণ।"[২৩]

(পাশ্চাত্যভাব—স্বার্থপরতা)

এইভাবে ইংবেজ চরিত্রের গুণাগুণ নির্ণয় কবে ভূদেব বলছেন—ইংরেজচরিত্র সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুব চরিত্রের বিপবীত। কারণ "হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচেতা।"[২৪] (পাশ্চাত্যভাব—ইংরাজসমাগম)। তাই ইংরেজের কাছে হিন্দুর শিক্ষা করার একমাত্র বিষয় হলো কার্যকুশলতা। আর একটি শিখবার বস্তু হলো ইংরেজের স্বজাতিবাৎসল্য। এই স্বজাতিবাৎসল্য জাগাতে পারলে ভারতবাসীর অনেক দুঃখ দূর হবার সম্ভাবনা। তাই বলছেন—হিন্দুর ইংরেজের মতো স্বার্থপর হয়ে কাজ নেই কারণ সহজাত পরচিন্তজ্ঞতা এবং পরের ইষ্টানিষ্টবোধসম্পন্ন হিন্দুর পক্ষে স্বার্থপরতা হবে জ্ঞানকৃত, তমোগুণসম্পন্ন ইংরেজের মতো অজ্ঞানকৃত নয়। "অজ্ঞানকৃত পাপেব প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—উহার অবশ্যম্ভাবী ফল অধঃপতন।"[২৫] (পাশ্চাত্যভাব—স্বার্থপরতা)। তাই—"হিন্দু যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদোষপ্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।"[২৬]

(পাশ্চাত্যভাব—স্বার্থপবতা)

এই হলো ইংরেজ চরিত্র এবং ইংরেজের চরিত্র থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ভূদেবের অভিমত।

স্বদেশপ্রেম এবং স্বজাতিপ্রীতি—ইংরেজের কাছ থেকে এই দুটি জিনিস ভারতবাসীর শিক্ষা করা উচিত।

ইংরেজশাসন

ইংরেজ চরিত্রের অনুকরণ সম্পর্কে ভূদেব যতটা বিরোধী ছিলেন, ইংরেজশাসন সম্পর্কে ততটা নয়। বৈদেশিক শাসক হিসাবে তিনি ইংরেজকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তিনি লিখেছেন—"ইংলণ্ড কেবলমাত্র পরাক্রমেই যে অপর সকল ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতম তাহা নহে। অপর সকল ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজের ধৈর্য এবং গাম্ভীর্য অধিকতর এবং তাঁহার ন্যায়ানুগামিতা স্থিরতর। অতএব যখন ভারতবাসীর অবস্থা এমন যে—তাঁহাকে অপরের অধীন হইতেই হয়, তখন আর কাহারও না হইয়া যে ইংরাজের অধীন হইয়াছেন ইহা সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকৃত।"[২৭] (ভবিষ্যবিচার—উপসংহার)। তাই ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ইংরেজশাসনকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

ইংরেজশাসনকে মেনে নেবার কারণগুলি ভূদেবের ভাষায় নিম্নরূপ—

"প্রথমতঃ। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসও বলে যে ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বহু পূর্বকাল হইতে ইহার মধ্যে একটি সম্মিলন প্রবণতাও জন্মিয়া আছে।... ইংরাজ কর্তৃক দেশের ঐ সম্মিলন প্রবণতা সম্যক প্রকারেই সিদ্ধ হইয়াছে। দেশটি যেমন এক হইতে চাহিতেছিল, তাহাই হইতে পাইয়াছে।

"দ্বিতীয়তঃ। ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পূর্ণতা জন্মিয়াছে।

"তৃতীয়তঃ। ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত এবং বর্ত্মাদির বাহুল্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় এবং সম্মিলন জন্মিতেছে। আযশাস্ত্রকারেরা যে কার্য সম্পাদনের জন্য নানা স্থানে তীর্থের এবং মেলাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইংরাজ কর্তৃক শান্তিস্থাপনে তাহা শতগুণে এবং অতি উৎকৃষ্টরূপেই নির্বাহিত হইতেছে।

"চতুর্থতঃ। ইংরাজ মাহাত্ম্যে ভারতবর্ষের প্রতি অপরাপর বিজিগীষু জাতির আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে।...

"অতএব ভারতবর্ষ যেদিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবাপন্ন হইতে চাহিতেছিল, ইংরাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়া গিয়াছেন এবং সেই ভাবাপন্ন করিয়াছেন। সেইজন্যই ভারত আপনাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া আছে।"[২৮] (ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বণিকভাব)

ইংরেজ শাসক ভারতের ধর্ম, আচার এবং ব্যবহারশাস্ত্রের উপরে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেননি। ভূদেবের মতে এটি ইংরেজের একটি বড়ো গুণ এবং আর্যশাস্ত্রের অনুকূল। "অতএব মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাহার গন্তব্যপথে লইয়া আসিয়াছেন—ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা এবং ধীরতা সহকারে প্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন না—এইজন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন।"[২৯] (ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বণিকভাব)

ইংরেজশাসন সম্পর্কে এমন উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা সত্ত্বেও ভূদেব ইংরেজশাসনের দোষ সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। এজন্য তিনি ইংরেজ চরিত্রের তিনটি বিশেষ ভাবকে দায়ী করেছেন। সেগুলি—ইংরেজের বণিকভাব, রাজভাব এবং বৈদেশিকভাব।

বণিকভাবের বশে ইংরেজ সর্বদাই নিজের লাভ-লোকসানের হিসাব নিয়েই ব্যস্ত, অন্যদিকে মন দেবার অবকাশ তাঁদের নেই।

ইংরেজের যে রাজভাব তার সঙ্গে ভারতের চিরপ্রচলিত রাজভাবের সম্পূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজের বিচারে রাজশক্তি ত্রিধা বিভক্ত। ব্যবস্থা প্রণয়ন, ধর্মাধিকরণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ বিশেষ রক্ষণকায সম্পাদন রাজশক্তির অধীন। ভারতবর্ষে ব্যবস্থা প্রণয়ন রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাছাড়া ইংরেজের রাজনৈতিক শাস্ত্র সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্যের বিচার নিয়েই বিব্রত। সেখানে রাজশক্তির যথেচ্ছ প্রসারণ প্রজাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ভারতবর্ষে এভাব অপরিচিত। তাই রাজশক্তির যথেচ্ছ প্রসার এখানে অবারিত। এইভাবে রাজায় প্রজায় এখানে একটা গভীর মানসিক ব্যবধান রচিত হয়েছে। তাই ভূদেব লিখেছেন—

"অতএব ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্যে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতাবিস্তারের সীমা একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়া এবং প্রজাব্যূহের জন্মভূমিতে আপনার স্বত্ব আরোপ করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে করাদানের মুখ বিস্তৃত করিয়া ইংরাজরাজ ভারত-বাসীর হৃদয়ে এমন একটি ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন যে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিত এবং প্রজারক্ষণে কৃতকার্য হইলেও তাহার ভাবান্তর হইতে পারে নাই। তিনি গৌরবের আস্পদ হইয়া আছেন কিন্তু প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই।"[৩০] (ইংরাজাধিকার—ইংরাজের রাজভাব)

ইংরেজচরিত্রে বৈদেশিক ভাবটি অতি প্রবল। "বস্তুত ইংরাজ ইংলণ্ডকেই মনের সহিত ভালোবাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করেন।"[৩১] আবার এই ইংরেজ জাতই পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড়ো উপনিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছেন। এ থেকে ভূদেবের সিদ্ধান্ত—"ইংরাজ বিদেশ-বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা।"[৩২] অর্থাৎ তাঁরা যেখানে যান সেই স্থানকে সর্বতোভাবে স্বদেশের অনুরূপ করে তুলতে পারলে তবেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন—তা না হলে "বিদেশপ্রবাসে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্টানুভব হয় তিনি বিদেশেব রাজাসন অপেক্ষা স্বদেশের ফাঁসিকাষ্ঠও ভালো মনে করিতে পারেন।"[৩৩] ইংরেজ চরিত্রের বৈদেশিকভাবের আরেকটি পরিচয় তাঁর প্রচণ্ড আত্মগৌরব। ইংরেজের মনোভাব এই "তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমি ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"[৩৪] "এই প্রবল বৈদেশিকভাবের জন্য—সাধারণতঃ ইংরাজের মনে ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃত মমতা ও ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি একান্ত অসাধ্য।"[৩৫] তাই ভারতশাসনে ইংরেজ যতই ন্যায়ানুগামী হতে চান না কেন ওই তীব্র বৈদেশিকভাবের জন্য সে শাসনে অনেক ত্রুটি এসে গেছে। ভূদেব তার দশটি সাধারণ লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের যা কিছু সংস্কার, প্রতিকার বা সৎকার করা প্রয়োজন, ইংরেজ মনে করেন সে সব সমস্যার একমাত্র সমাধান তাঁর নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে। রাজকার্যে অধিকতর ইংরেজ নিয়োগ এবং শাসনকার্যে অধিকতর ক্ষমতালাভ করতে পারলেই হলো। ইংরেজের মনে বৈদেশিকতাভাবের সঙ্কোচ না হলে এর কোনো প্রতিকার নেই।

ইংরেজশাসন ও ভারতের ভবিষ্যৎ

ইংরেজশাসনের ফলে ভারতের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সে সম্পর্কে ভূদেব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনা কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত। যেমন উপনিবেশযোগ্যতা, ধর্মপ্রণালী, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, আর্থিক অবস্থা, জৈবনিক অবস্থা।

ভূদেবের মতে, ভারতে ইংরেজের চিরস্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠার পক্ষে দুটি প্রধান বাধা হলো ভারতীয় জনসংখ্যার বিপুলতা ও আবহপ্রকৃতির বিভিন্নতা। তাছাড়া পৃথিবীতে কোনো জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই কখনো চিরস্থায়ী হয় নি।

ভারতসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আসতে পারে ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি, আর্থিক ও জৈবনিক ক্ষেত্রে। ধর্মপ্রণালীতে খুব বড়োরকম পরিবর্তন ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে আর্যধর্মের চেয়ে উদারতর ধর্ম আর কিছু নেই। "আর্যধর্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও নাই"।[৩৬] তাছাড়া ইংরেজ পরধর্মপীড়ক নন। সুতরাং রাজশক্তির চাপে জনগণের ধর্মপরিবর্তনের কোনো ভয় নেই। আর ভারতে হিন্দুরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে এতো বিপুল যে তাদের সকলকে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব নয়। মুসলমান শাসনেও তা সম্ভব হয়নি।

ভূদেব বলছেন—"মনুষ্যশিশুর পক্ষে পিতামাতাও• যাহা, মনুষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজেব স্থিতি এবং পুষ্টি হয়।"[৩৭] (ভবিষ্যবিচার—ভাবতবর্ষেব কথ্য ভাষা বিষয়ক) এ থেকেই মানবসমাজেব পক্ষে ভাষাব মূল্য কতখানি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংবেজী ভাষার প্রসাবতাব ফলে ভাবতীয় প্রধান ভাষাগুলির পরিবর্তনের বিশেষ কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব ভাষা যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়াও "রাজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতব হইতে থাকিবে। মুসলমানদিগের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল ইংরাজের আমলেও সেই সকল ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে এবং তাহা স্বল্পতরকালে এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটিবে।"[৩৮] কারণ মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, শিক্ষার বিস্তার, যাতায়াতের সুবিধা এবং স্বদেশীয় ভাষার চর্চা ভারতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারকে আরও ঐশ্বর্যশালী করে তুলবে। যেমন আরবী ফারসী এসেছিল তেমনি ইংরেজীও আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে তার নিজস্ব হয়ে উঠবে। এতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার একতা বৃদ্ধি পাবে। "ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি—হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমান-দিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে। (ভাষাবিষয়ক)।"[৩৯]

"আমাদের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা—জাতিভেদ।···

"···ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণভেদের নিরতিশয় আধিক্য।···ব্যবসায়ভেদের সহিত ঐ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া গিয়াছে।···ব্যবসায়ভেদ সাহজিক বর্ণভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ

সুদৃঢ় এবং অত্যধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।...সংকর বিশেষতঃ বিলোমসংকর উৎপাদনে আর্যশাস্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি।...

"আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থূল ও মূল কথা এই।"[৪০]

এজন্যই এখানে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। শুধুমাত্র ব্যবসায়ভেদের উপর তা গড়ে উঠলে, এখানেও তা এতদিনে উঠে যেত। কারণ জীবনধারণের জন্য জাত্যন্তরের ব্যবসা গ্রহণ এদেশে স্বীকৃত। জাতিভেদের মুখ্য তাৎপর্য বিবাহভেদ। বিবাহভেদের মূলকথা সুসন্তান লাভ। "ক্ষেত্রে বীজের বৈষম্য হইতে পূর্বপুরুষের দোষাদি সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সম্ভাবনা—এইটি মৌলিক তথ্য।

"জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপরেই সংস্থাপিত।"[৪১] সুতরাং অসময়ে তাড়াতাড়ি জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত করার চেষ্টা হলে তা ক্ষতিকর হবে।

ইংরেজ অধিকারে ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পের চরম দুর্দশা ঘটেছে। সেখানে বিলিতি জিনিসের আমদানী ও আধিপত্য দিনে দিনে বাড়ছে। এমনিতেই ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। তার মধ্যে দেশীয় শিল্পের অবনতির ফলে কৃষিই প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠছে। "ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা। ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল।"[৪২] ভারতবর্ষে উৎপাদন আমদানী রপ্তানী প্রভৃতির পরিসংখ্যানগত হিসাব দিয়ে ভূদেব এই অবনতির চিত্র প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

আর্থিক অবস্থার অবনতি এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—এই দুই কারণে ভারতবাসীর স্বাস্থ্য এবং আয়ু দুয়েরই অবনতি হচ্ছে, যুক্তি এবং তথ্যের দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতের বিবাহপ্রণালী এজন্য দায়ী নয়।

এই ধর্মহীনতা এবং জীবনক্ষীণতার প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং দেশীয় জনগণের প্রকৃত উদ্যোগে এই অবনতি দূর করার চেষ্টা হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন।

আমাদের দেশের নবীন সমাজসংস্কারকগণ ইউরোপের সামাজিক জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করে সেই আদর্শেই ভারতসমাজের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। ভূদেব এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারেননি। কারণ তাঁর মতে—"সকল দেশের সমাজগঠন প্রণালী একরূপ নহে। ইউরোপীয় সমাজসকল যে প্রকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, আসিয়া খণ্ডের বিভিন্ন সমাজগুলি ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আসিয়া খণ্ডে ধর্মশাসনের প্রাবল্য।

ইউরোপে বৈষয়িক ভোগবাসনার আতিশয্য। আসিয়া খণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তিতিক্ষার শিক্ষা, ইউরোপে স্বার্থরক্ষার শিক্ষা ও অভ্যাস।"[৪৩] ইউরোপীয় এবং এশীয় তথা ভারতীয় সমাজের এই যে মূলগত পার্থক্য এই পার্থক্যের কথা মনে রেখেই এই দুটি সমাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

ভূদেবের মতে—"পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়া চলে না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বিজাতীয়ের অনুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন সমাজের সম্যক্ শুভসাধন হইতে পারে না। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি পারিবারিক সকল ব্যবস্থাই কিছু কিছু পৃথক হইয়া আছে এবং পৃথক থাকাই ভালো।"[৪৪]

তাই ইউরোপের অনুকরণে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্পর্কে ভূদেব সমর্থন জানাতে পারেননি। গতানুগতিকতাবশতই ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ ওই প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে তাঁর অনুমান। ইউরোপে অনেকেই বৈবাহিক বন্ধনকেও যে চুক্তির মধ্যে নিয়ে আসা পারিবারিক শুভসাধন বলে মনে করেন ভারতবর্ষেও তার অনুকরণ তাঁর মতে নিন্দনীয়। যে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত হতে গেলে আগে চিন্তা করে কর্তব্য স্থির করতে হবে, তারপর কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। সমাজ সংস্কারের কাজেও চিন্তা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। ভারতসমাজ দিন দিন হীনতার পথে নেমে চলেছে। কোন কোন বিষয়ে এই হীনতা, তার প্রকৃত কারণ কি, এই হীনতা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং হীনতাবৃদ্ধির অভিমুখ কোন দিকে সর্বপ্রথমে তা নির্ধারণ করতে হবে। "এই সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির হইলেই কর্তব্যনির্ণয়টি যথাযথরূপ হইতে পারে। নচেৎ কেবল উদ্বেগ, অধৈর্য, অস্থৈর্য এবং বিড়ম্বনা সার হয়।"[৪৫] ভারতীয়দের মধ্য থেকেই কোনো একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হবেই যিনি ভারতসমাজকে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবেন। "তাবৎকাল আমরা ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক ভারত গভর্ণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকৃতকার্য হইব না। এতদ্দেশাগত বেসরকারী ইংরাজ রাজনৈতিকদিগের আন্দোলন প্রণালী আমাদের অবস্থা এবং প্রকৃতির উপযোগী নহে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলিতে আমাদের মিশ্রিত হওয়া যেমন অকর্তব্য, বেসরকারী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের কোন অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে আন্দোলন করিতে যাওয়া তেমনি মূর্খতার কার্য।"[৪৬]

তাছাড়া ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং বিদেশীশক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইংরেজ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে যাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না, ইংরেজ তার প্রতি প্রীতিসম্পন্নও হতে পারেন না। এই ভাব থেকে একটি মঙ্গল হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে একপ্রকার স্বচেষ্টার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংসিদ্ধের মতো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে আজো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে বেসরকারী ইংরেজের সহায়তা তাঁদের অবলম্বন হয়েছে। ভূদেবের মতে এই অবলম্বনের ত্রুটি দুটি। এক—এতে অনুকরণ-প্রবণতা দেখা দেয়। দুই—ইংরেজ অধিনেতা তাঁর নিজের সমাজের উপযোগী যে আন্দোলনের পথ তাই জানেন। কিন্তু সে-পথ ভারতসমাজের অনুপযোগী। তাই ইংরেজ শাসনে —একমাত্র দেশীয় নেতার অধীনেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সুফলপ্রসূ হতে পারে।

ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী

মুখ্যত যাঁদের মনে রেখে ভূদেবের এই সামাজিক প্রবন্ধ রচনা তারা হলেন ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী। এঁদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই সমস্ত স্বদেশী-ভাবকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে এঁরা সম্পূর্ণ অন্ধ। এটি ভূদেবের কাছে একটি গভীর বেদনার কারণ। তাই তিনি নিরপেক্ষ কিন্তু আন্তরিকভাবে এর মূল অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। 'ইংরাজ সমাগম' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি অগ্রপশ্চাৎ বোধশূন্য, চিত্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্যবোধ-বিরহিত এবং ব্যবহার অবিনীত হয় তাহার কারণ কি, ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।"[৪৭]

'সামাজিক প্রবন্ধে'র বিস্তৃত অংশ জুড়ে তিনি এই সমস্যার কারণ এবং এ থেকে পরিত্রাণের পথ কি তার অনুসন্ধান করেছেন।

ইংরেজ শাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর অবধারিত ভাবেই এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও প্রচলন হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে নানা স্কুল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বয়ং ভূদেবও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রসমাজের মনোভাব এবং আচরণ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

আসলে ইংরেজ সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য গভীর। ভূদেবের ভাষায়—"হিন্দুসমাজের প্রকৃতি শান্তিপ্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগসুখানু-

সন্ধানে কার্য-তৎপরতা। হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপজীবী, ইংরাজ প্রধানতঃ শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী। হিন্দুসমাজ মিলিতস্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংরাজসমাজে বয়োধিক্যে বিবাহই নিয়মিত। হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্বস্কুশ করিতে উন্মুখ। ভারতবর্ষে এই দুইটি পরস্পর ভিন্নধর্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।"[৪৮] এ থেকেই বোঝা যায় ইংরেজদের সামগ্রিক জীবনটাই ভারতের কাছে একটা অভিনবরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। আর যাঁরা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হয়েছেন তাদের কাছে তো ইংরেজের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের জগৎ তার বিচিত্র রূপের জৌলুস নিয়ে দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব এবং ইহজীবনমুখীনতা সহজেই তাদের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। পাশ্চাত্যজীবনের গতিময়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছে। লেখকের মতে শিক্ষার সর্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ আর অনুকরণ করতে গেলে দোষ আর গুণের মধ্যে দোষের অনুকরণই সহজে হয়। ইংরেজী শিক্ষিতদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ইংরেজী শিক্ষিতদের সম্পর্কে লেখকের অভিমত—

"প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অপরিসীম ইংরাজভক্ত। তাহাদিগের ভক্তিটি মুখের নহে—অন্তরের অন্তস্তল ভাগের ভক্তি।"[৪৯] তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজই তাঁদের আদর্শ—তাই ভারতীয় কোনো কিছুই তাদের ভালো লাগে না। পাশ্চাত্য যে সব ভাবকে তাঁরা মহান বলে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন লেখক সেই সব ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে দেখিয়েছেন তার কোনোটি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের কাছে নতুন নয়, কোনোটি আদৌই ভালো নয়, আর যা ভালো আর কিছুটা নতুন, এদেশে তার যথাযথ বিকাশ হয় নি।

ভূদেব স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা ঐহিকতা ও স্বাতন্ত্রিকতা এই কটি পাশ্চাত্যভাবকে সমর্থন করতে পারেননি। এগুলি সংকীর্ণ মনোভাব।, তবে ভারতবর্ষে যখন স্বদেশ এবং স্বদেশীয় সব কিছু সম্পর্কে একটা অসাড়তা দেখা যাচ্ছে তখন দেশের উন্নতির জন্যে—ইংরেজের মতো স্বজাতিবৎসল, স্বজাতি পক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদোষপ্রচ্ছাদক হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে।

সাম্যবাদও ভারতবর্ষে নতুন নয়। পাশ্চাত্যদেশে সাম্যবাদীরা মানুষে মানুষে সমান একথাই প্রচার করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা শুধু সর্বমানবের নয়

সচেতন অচেতন সর্বজীব এবং সর্ববস্তুতে একটি মৌলিক একত্ববোধের কথা অনুভব ও প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এ তো দর্শনতত্ত্বের কথা। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবজীবনে সাম্য কোথাও নেই। মানুষ একান্তই স্বার্থপর এবং সর্বদাই সে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে চায়। তাই সর্বজাতি এবং সর্বমানব নির্বিশেষে সমদর্শিতা কখনো জাগা সম্ভব নয়। সামাজিক বৈষম্য ধনভিত্তিক না হয়ে গুণভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। কারণ ধনভিত্তিক সাম্যবাদ লোভ, ঈর্ষা, শঠতা আব অস্থৈর্য বৃদ্ধি করে।

তবে বিজ্ঞান সাধনায় ইউরোপ নিঃসন্দেহে ভারতের চেয়ে অগ্রগামী। প্রত্যক্ষ এবং প্রমাণেব ভিত্তির ওপর বিজ্ঞানবিদ্যা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যেভাবে ইংরেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে এই প্রত্যক্ষ আর প্রমাণেরই অভাব। এখানে ইউবোপীয়দের অর্জিত বিজ্ঞানবিদ্যা পরোক্ষ পদ্ধতিতে মুখের কথায় মুখস্থ করানো হয় মাত্র। এ শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এতে সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে না। অসম্পূর্ণ বিদ্যা বুদ্ধিকে বিকৃত কবে মাত্র। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের পরীক্ষা এবং প্রয়োগকে যদি সম্ভব কবে তোলা যায় তাহলেই বিজ্ঞান-শিক্ষা এদেশে সার্থক হবে।

ইউরোপে রাজশক্তিব স্থান সবার উপরে। রাজা সেখানে সমাজের প্রতিভূ। আমাদের দেশের আদর্শ রাজদণ্ডবিধিই প্রকৃত বাজা, ব্যক্তি বাজা প্রজাব মঙ্গল-সম্পাদক মাত্র। সুতরাং রাজার সমাজপ্রতিভূ কাযত আমাদের দেশেও স্বীকৃত।

এভাবেই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন—ইংরেজী শিক্ষিতরা অতিভক্তিতে ইংরেজের সবকিছুকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেন, কোনো বিচার করেন না। এটা ঠিক নয়। তাঁর মতে যা কিছু মানুষকে কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয়, তার প্রতিই তার একটা দুর্বলতা থাকে। ইংরেজী শিক্ষা এমনি অনেক পরিশ্রমের কাজ। তারই ফলে এই বিচারহীন অন্ধতা। এতে বুদ্ধি এবং বিচারশক্তির আলস্য জন্মে। এই আলস্যপরায়ণতা অনুকৃতি আর নিশ্চেষ্টতার আকব। কিন্তু নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুর পূর্বরূপ। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর এখন সেই নিশ্চেষ্টতা পবিহারের একান্ত প্রয়োজন।

ভূদেবের মতে এই নিচেষ্টতা দূর করতে হলে, স্বদেশ সম্পর্কে সহানুভূতি জাগাতে হলে প্রয়োজন ইংবেজীর সঙ্গে সংস্কৃতভাষারও সমান শিক্ষাদান। সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হবে। তখনই এ দুয়ের মধ্যে বিচার করার প্রবণতা জাগবে।

আর এক পদ্ধতি হলো যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির বলে ইংরেজ আজ এত

বিস্ময়ের পাত্র সেই বিজ্ঞানের সাধনায় উন্নতি করা। ইংরেজও তার এই বিজ্ঞান-বিদ্যায় অনেকখানি আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ থেকে শিখেছেন। আমরাও যদি ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতির কাছে বিভিন্ন যন্ত্রাদির নির্মাণ ও প্রয়োগ-কৌশল শিখে নিতে পারি তাহলে ইংরেজের সম্পর্কে যে মোহময় ধারণা আমাদের মনে রয়েছে তার অনেকটা হ্রাস পেতে পারে ও অহেতুক ইংরেজ ভক্তিও কমতে পারে। প্রাচীন ভারত জয় করেছিল অন্তর্জগৎকে আর ইউরোপ জয় করেছে বাহ্যজগৎকে। অন্তর্জগৎকে জয় করাই কঠিন। বাহ্যজগৎকে জয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। একথা মনে রাখলে তবেই ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত বিচার সম্ভব হবে।

৬

কর্তব্যনির্ণয় ও তার রূপায়ণ

ভারতবাসী দিন দিন যে হীনতার পথে নেমে যাচ্ছে ভূদেব তার দুটি কারণ নির্ণয় করেছেন। প্রথম কারণ ভারতবাসীর সম্মিলনশক্তির অভাব আর দ্বিতীয় কারণ স্বজাতীয়ের প্রতি অসূয়াবোধ। এই দুটিই ভারতবাসীর সকল অধঃপতনের মূল-কারণ। তার মতে "স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত।"[৫০] এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রয়োজন ভারতবাসীর মধ্যে এই সম্মিলনশক্তি জাগিয়ে তোলা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি অসূয়াবোধ দূর করা।

ইংরেজের কাছ থেকে ভারতবাসী এই সম্মিলন প্রবণতা লাভ করতে পারে। সম্মিলনশক্তি অনেক উচ্চতম সদ্‌গুণেরই প্রকাশক। ঐ শক্তিটিকে লাভ করার জন্য বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন। "যদি সম্মেলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয়ভাবের পরিবর্ধন অতি অনায়াসেই হইতে পারে। বস্তুতঃ জাতীয়ভাব সম্মিলনপ্রবণতার নামান্তর অথবা পরিপাক।"[৫১] তবে এই সম্মিলনশক্তির অক্ষমতা দূর করা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র কোনো স্বদেশীয় মহাপুরুষের পক্ষেই তা করা সম্ভব। আর এই স্বদেশীয় পুরুষের আবির্ভাবকে সম্ভব করতে হলে ভারতবাসীর অসূয়াবোধ ত্যাগ করতে হবে। স্বদেশের যে কোনো শুভকাজে অন্যকে সাহায্য করতে হবে এবং স্বদেশীয় যে কোনো সম্মানার্হ ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে।

যে মহাপুরুষের পক্ষে ভারতবাসীর প্রকৃত নেতা হওয়া সম্ভব হবে ভূদেব সেই মহাপুরুষের কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। নেতৃ-প্রতীক্ষায় তিনি বলছেন :

"১। তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি-প্রয়াসী হইবেন।

২। তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলনসাধনেই উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন।

৩। তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন।

৪। তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে।

৫। তিনি সূর্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্বাপিত করিবেন না।

এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর তেজোগুণেরই সম্মিলন থাকিবে।"[৫২] যার মধ্যেই এসব গুণ দেখা যাবে তারই গৌরববৃদ্ধি করতে হবে। তাই ভূদেব লিখেছেন—

"আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষসাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন এবং হৃদয়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতি মধ্যে একজন নেতৃমহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক।"[৫৩] তাহলেই ভারতবাসীর কার্যকলাপ, ব্যবহার প্রণালী এবং মনের ভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করবে। কারণ "একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয় সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকাদেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উঠে নাই।"[৫৪]

বেসরকারী ইংরেজের সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হবে একথা ভূদেব স্বীকার করেননি। কারণ ইংরেজের কাছে যা কিছুই শেখা হোক না কেন তা হবে অনুকরণসঞ্জাত আর অনুকরণ বাহ্যবস্তু। কিন্তু ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন যে ইংলণ্ডের অনুকরণে

তার সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতবাসীকেই তার সমস্যার সমাধান উদ্‌ভাবন করতে হবে। কারণ—উদ্‌ভাবন আভ্যন্তরিক। আর তা সম্ভব উপযুক্ত সময়ে সর্বজনমান্য কোনো এক স্বদেশীয় নেতৃপুরুষের দ্বারা—এই ভূদেবের দৃঢ় বিশ্বাস।

(প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গান্ধীজীর কথা। ভূদেব কল্পিত নেতৃপুরুষের লক্ষণ-গুলির সঙ্গে তার কী আশ্চর্য মিল !) ।

কর্তব্যনির্ণয়—অতথ্য পরিহার

ভারতবাসীর সকল দোষের মূল কারণ লেখকের মতে ধর্মহানি। কলহপ্রবণতা, অসূয়াপরবশতা, সম্মিলন শক্তির অভাব, বিদ্যাহীনতা, ধনহীনতা, আয়ুর স্বল্পতা সব কিছুর গভীরতম উৎস ধর্মহীনতা। ধর্মহীনতা তিনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এক—পারলৌকিক স্বার্থপরতা অর্থাৎ পারলৌকিক ক্ষেত্রে অপরের কৃত পুণ্যপাপ বা অপরের ভুক্তিত সুখদুঃখসম্বন্ধে উদাসীনতা। সকলেই ব্যক্তিগত ধর্মসাধনে মগ্ন অন্যের সম্পর্কে একান্ত অমনোযোগী। লেখকের মতে—"এই ঔদাসীন্যই পাপ। সেইজন্য আর্যধর্ম ক্রমশঃ নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে, দেশমধ্যে সহানুভূতি দিন দিন স্বল্পতর হইতেছে এবং সম্মিলনশক্তি ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া যাইতেছে।"[৫৫] সুতরাং লোকের শিক্ষা ও সমাজের হিতসাধনের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

দুই—অভেদে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ ধর্মসাধনায় কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিনটি বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা। ভক্তি না হলে কাজে প্রবৃত্তি জাগে না, কাজ না হলে শিক্ষা হয় না, শিক্ষা না হলে জ্ঞান জন্মায় না আর জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। কিন্তু এই বোধ এখন নেই বললেই চলে।

তিন—ধর্মের ব্যাপকত্ব লোপ অর্থাৎ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ থেকে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত সারাদিনব্যাপী—আমাদের যা কিছু কাজ তার সবটাই যে ধর্মসাধনা তা আর মনে করা হয় না। ধর্মসাধনাকে এখন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ করা হচ্ছে। ধর্মভাবকে জীবনের সমস্ত কাজে জাগিয়ে রাখাই আর্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রেত সাধনেই ভারতবাসী আবার তার গৌরব অর্জন করতে পারে।

ধর্ম বলতে ভূদেব কর্মকেই মনে করছেন। যার যা কাজ তা সুষ্ঠুভাবে একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করাই ধর্মসাধনা।

কর্তব্য নির্ণয়—সূত্র নির্ধারণ

বুদ্ধি দু'ভাবে কাজ করে—সংকলন ও বিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যষ্টীভূত পদার্থ সকলের সমষ্টিসাধন করে প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের সৃষ্টি করা হয় আর বিকলনের দ্বারা সমষ্টিভূত বস্তুর বিচার করে তার উপাদানসমূহকে আবিষ্কার করা হয়। সমাজের অবস্থাভেদে যখন দ্রব্য এবং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, তখন সংকলনশক্তি প্রাধান্য পায়। আর সমাজে ভাবান্তর উপস্থিত হলে যখন সংঘটিত ভাব এবং বস্তুর সম্বন্ধে চিন্তার আধিক্য হয়ে ওঠে তখন বিকলনশক্তি গুরুত্ব লাভ করে। সংকলনশক্তির কাজ সংঘটন আর বিকলনশক্তির কাজ বিচার। বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতার তারতম্যকে ভূদেব এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতসমাজেও যুগে যুগে কখনো সংকলনশক্তি কখনো বা বিকলনশক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতসমাজের বর্তমান অবস্থায় সংকলনশক্তিরই কার্যকারিতা প্রবল হওয়া উচিত। যা আছে এবং নতুন যা এসেছে তাদের মিলিয়ে বর্তমানের উপযুক্ত কার্যসূত্র নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে লেখক মনে করেন। তাঁর মতে এখন কর্মেরই প্রয়োজন। প্রত্যেকটি গৃহস্থের যা নির্দিষ্ট কর্তব্য তা আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করাই কর্ম, সেই কর্মই ঈশ্বরপূজা, সেই কর্মই ধর্মসাধনা। পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজন, স্বদেশী এবং বিদেশী প্রতিবেশী রাজা রাজপুরুষ, বহিরাশ্রমিক সকলের প্রতিই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য এবং ব্যবহার সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার এবং সব কাজে সহযোগিতা করা, ছোটবড়ো সব কাজেই রাজার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা না করা, বিদেশী রাজপুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে নম্র কিন্তু নির্ভীক সত্যবাদিতা বজায় রাখা, দেশীয় রাজপুরুষের প্রতি উপযুক্ত সম্ভ্রম প্রকাশ করা, রাজার জাতীয় লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও সত্যবাদিতা বজায় রাখা এখনকার কর্তব্য।

কর্তব্যনির্ণয়—সূত্রের ব্যাখ্যা

নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে সমাজই ধর্মের মূল। কিন্তু আর্যশাস্ত্রমতে ব্রহ্মই ধর্মের মূল বলে স্বীকৃত। অনেকে একথা স্বীকার করতে না চাইলেও ধর্মই যে সমাজের স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নেই। "ধর্মই সামাজিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা।"[৫৬]

দুর্বল ভারতসমাজেরও বলবৃদ্ধির একমাত্র উপায় ধর্মবৃদ্ধি। ধর্ম বলতে কর্মকেই বোঝায়। "যে যে কার্যদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, পরার্থপরতা

প্রবল হইবে, সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মসংযম বর্ধিত হইবে এবং পাশবভাবের ন্যূনতা হইবে, তাহাতেই সমাজের বলবৃদ্ধি হইবে। যিনি যাহাই বলুন, নিজ সমাজমধ্যে সহানুভূতি বিস্তারের ব্যাঘাতক, মনের সংকীর্ণতা সাধক এবং বিলাস বাসনার উত্তেজক কোন অনুষ্ঠানই ধর্মকার্য হইতে পারে না।"৫৭

ধর্মসাধনার দ্বারা সুখলাভ হয়—একথা কিন্তু ঠিক নয়। প্রকৃত ধর্মসাধনার পথ শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। ধর্মের সঙ্গে সুখের যে সম্পর্ক তা দূর সম্পর্ক, কখনো কখনো বহু অনুসন্ধানেও তা দেখা যায় না। ধর্ম থেকে রক্ষা হয়, অধর্ম থেকে বিনাশ। "ধর্ম ধারণ করে বা রক্ষা করে হাতে হাতে সুখ দেয় না।"৫৮

"অতএব ধর্মাধর্ম সুখদুঃখের কথা নয়, থাকিবার বা না থাকিবার কথা। এখন ভারতসমাজেরও বাঁচিবার মরিবার কথা দাঁড়াইয়াছে, ইহার সুখের বা দুঃখের কথা অতি দূরগত হইয়াছে। সেইজন্য যে একমাত্র শক্তি সর্বশক্তির মূল, যে শক্তি রক্ষণকার্যে সমর্থ যাঁহার সহায়তায় সকল বিঘ্ন বিপত্তি দূর হয়, তাহারই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।"৫৯

সুখবোধই ধর্মসাধনার প্রকৃত লক্ষণ এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে ইউরোপে একটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। তাকে বাংলায় 'হিতবাদ' বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সুখ হয় তাই ধর্ম, আর যাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ দুঃখ হয় তাই অধর্ম। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মতবাদ অপেক্ষা এই 'হিতবাদ' অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ মতবাদটি ঠিক সমীচীন নয়। কারণ অধিক পরিমাণ সুখ বা অধিক সংখ্যক লোক এসব কথার ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত দুরূহ। প্রয়োগকালে হিতবাদীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিজের নিজের মনঃকল্পিত জিনিসকেই লোকের হিতকর বলে ব্যাখ্যা করেন। যাই হোক, ধর্ম কারো মনগড়া হয় না এবং সুখবোধও ধর্মের লক্ষণ বলে নির্দিষ্ট হতে পারে না। বরং ধর্মের ব্যবহার অভ্যস্ত হয়ে উঠলে চরিত্রের উন্নতি হয় কিন্তু ধর্মকার্যের সুখানুভব লঘু হয়ে যায়। ধর্মকার্যে সুখানুভব অল্প হওয়া চরিত্রের উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু পাপকার্যে দুঃখানুভব কম হওয়া চরিত্রের অপকর্ষের পরিচায়ক। সুতরাং সুখদুঃখকে ধর্মাধর্মের লক্ষণ বলে নির্দেশ করা ভুল।

যে ধর্মসাধনা বলতে অধ্যাত্মসাধনা বোঝায় ভূদেব তারও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

কর্তব্যনির্ণয়—সূত্রের প্রয়োগ

ভারতসমাজের পক্ষে বর্তমানে বিশেষ ভয়ের কারণ দুটি। এক বিদ্যাহীনতা, দুই ধনহীনতা।

বিদ্যাহীনতা—শিক্ষা দু'প্রকার—প্রাথমিক ও উচ্চ। ইংরেজ শাসনে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ কোনোই উন্নতি হয়নি। বরং শিক্ষার গভীরতা কমেছে। আগে যে শ্রেণীর লোকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত এখনও তারাই করে। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ও রকম শিক্ষার হ্রাসবৃদ্ধিতে ভারত-সমাজের কিছুই হিতাহিত হতে পারে না।

ইংরেজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষার স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষার শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে দেশীয় ভাষার চর্চা কমে এসেছে। তবে যেসব শ্রেণীর লোকে আগে উচ্চশিক্ষা নিত না এখন তাদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করেছে। তবে যে বিজ্ঞানবিদ্যা ইউরোপীয় বিদ্যার সারাংসার আমাদের দেশে তার আলোচনা নেই বললেই চলে। এখানে বিজ্ঞানের গল্প শোনানো হয় মাত্র। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত প্রসার হলে আর্যশাস্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণারও নিরসন হতো। কারণ আর্যশাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধনচেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে অপরাপর দেশের ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্যশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিজ্ঞান আরও অনেকদূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌছিতে পারিবেন।"[৬০]

দেশের বিদ্যাহীনতা দূর করার জন্য ভূদেব সমাজের পক্ষে কি করণীয় তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—

"বিদ্যাহীনতার পরিহারার্থে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় শাস্ত্রে শিল্পাদির প্রগাঢ় চর্চা, (২) ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, (৩) শাস্ত্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (৪) রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন।"[৬১]

১) দেশের শিক্ষকদের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত হীনতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁরা তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হয়েছেন। তাঁদের পুনঃসংস্থাপন ও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প প্রভৃতি যা আজো সজীব আছে তার শিক্ষা এবং রক্ষার জন্য যত্ন করতে হবে।

২) ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজন। "সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে সাধিত হইলে উহা একটি প্রকৃত ধর্মকার্যই হইবে।"[৬২] শাস্ত্রে আছে—"অবর লোক হইতেও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যার গ্রহণ করিবে। সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্প বিদ্যার সমানয়ন করিবে।"[৬৩] দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দু'ভাবে হতে পারে।

"এক, স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহাতে বেতনভোগী শিল্প বিজ্ঞানবিদ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকের দ্বারা দেশীয়দিগের শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া। অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা।"[৬৪]

ভূদেবের মতে তারাই বিদেশগমনের উপযুক্ত "যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য সুনির্বাহ করিতে পারিবে।"[৬৫] তিনি বলছেন শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিদেশযাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোনো প্রকার প্রকৃত সৎকাজের বাধাত্মক নয়। উপযুক্ত লোক পাওয়া না গেলে বিদেশী কারুকরদের এদেশে আনাই প্রশস্ত।

৩) "বিজ্ঞানের অনুশীলনে তথ্যোপলব্ধি তেজস্বিনী হয়। এইজন্য সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদি শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন হওয়া অত্যাবশ্যক।"[৬৬]

৭) রাজকার্য শিক্ষার জন্য রাজনৈতিক সভা প্রভৃতির অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। ঐসব সভায় রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনীতির আলোচনাতেই বিশেষ ফল হবে। এর ফলে অকারণ ইংরেজপ্রীতি কমে যাবে।

ধনহীনতা—ধনহীনতা পরিহার করার উপায় তিনটি। "এক, ব্যয়ের লাঘব, দ্বিতীয় ক্ষতির নিবারণ, তৃতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন।'[৬৭]

এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন "(১) বিলাসিতার লাঘব, (২) অকার্যে অর্থব্যয় পরিহার, (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব, (৪) দেশীয় সালিশের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, (৫) যৌথকারবারের দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি।"[৬৮]

ভারতবাসী সাধারণভাবে বিলাসী না হলেও ভারতাগত ইংরেজদের বিলাসবহুল জীবনের অনুকরণে এবং তাঁদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য অযথা অর্থব্যয় করে

থাকেন। "দেশীয় জনগণের এই ক্ষুদ্রাশয়তা এবং চিত্তদৌর্বল্য ছাড়িতে হইবে। তাঁহারা যদি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতি বিস্তারের যত্ন করেন, তাহা হইলেই ইউরোপীয় অনুকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারিলে ইংরাজ জাতির চক্ষেও গৌরবান্বিত হইবেন। ধীরপ্রকৃতিক ইংরাজ স্বভাবতঃ খোসামোদ ভালোবাসিতে পারেন না। এবং ধনিগণ তাঁহাদের মন রাখিবার জন্য যেরূপে নিজদেশের পূর্ব-পুরুষদিগের এবং শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া চলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি মনে মনে তাচ্ছিল্যই করিয়া থাকেন।"[৬৯] "সুতরাং এ ধরনের অর্থব্যয় লাঘব করা একান্ত প্রয়োজন।

দেশীয় শিল্পের রক্ষা এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করাও আশু কর্তব্য। বিদেশী বিলাসদ্রব্য একেবারে কেনা উচিত নয়। তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, পুস্তকাদি, যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায়, তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া উচিত।"[৭০]

মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারেও অযথা রাজদ্বারে না গিয়ে দেশীয় সালিশের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করলে অকারণ অর্থব্যয় অনেক কম হয় বলে ভূদেব মনে করেন।

অন্তর্বাণিজ্যেও ক্রমশ বিদেশী প্রাধান্য বাড়ছে। এ ব্যাপারেও দেশীয় জনগণের তৎপর হয়ে সম্মিলিত প্রয়াসে অগ্রসর হওয়া দরকার। এতে সমাজের বল রক্ষা হবে।

দেশীয় ধনিকসম্প্রদায়ের উচিত একত্রে সম্মিলিত হয়ে অংশীদারী কারবার চালু করা। বিদেশী কারিগর ও যন্ত্রপাতি এনে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করলে সুফল পাওয়া যাবে। তা না হলে এ ব্যাপারেও ইউরোপীয়রাই অগ্রসর হবেন এবং দেশীয় সম্পদ বিদেশে চলে যাবে। বিশেষ করে ইংলণ্ডে শ্রমিকের মজুরী দিন দিন বৃদ্ধির মুখে। এই অবস্থায় এদেশে যখন স্বল্পব্যয়ে মজুর পাওয়া যায়, তখন ইংরেজরা এখানে কারবার খুলতে বেশি আগ্রহী হবেন। আর ভারতীয় জনগণ মজুরদার হয়েই থাকবেন।

আয়ুর খর্বতা—ভারতবাসীর আয়ুর খর্বতার প্রধান কারণ দারিদ্র্য, লেখকের মতে দ্বিতীয় কারণ আচারভ্রষ্টতা, দেশীয় আচার রক্ষা করে চলাই এদেশীয় লোকের পক্ষে শ্রেয়। আচার অর্থে ব্রত পূজাদি উপবাস নয়, বিধিপালন। এতে শরীর মন দুই দৃঢ় হয়ে ওঠে, আয়ুর বৃদ্ধি হয় এবং সুসন্তান লাভ হয়।

সমাজ সংস্কার—"সমাজ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের

পরিবর্ত করিয়া নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের প্রবর্তনকে সমাজের সংস্কার বলে।"৭১ ভারতে আগেও এ ধরনের সংস্কার হয়েছে কিন্তু সে সংস্কার অন্ধ অনুকরণমূলক নয়। ভূদেবের মতে সমাজ সংস্কারের চেষ্টাটি—"(১) সমাজের রক্ষার নিমিত্ত, অতএব রক্ষাকার্যের অনুকূল যে ধর্ম তাহার অনুগত হওয়া আবশ্যক, এবং (২) মহাত্মগণের অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির অনুমোদিত সুতরাং কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত নয় এবং পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ সংস্কারের ব্যবস্থা বেদের সদৃশ মান্য হইবে।"৭২

বর্তমান সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার দোষ হলো—

"(১) প্রবৃত্তিমার্গে বিদেশীয় রীতির অনুকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে,

(২) ব্যক্তি বিশেষের বাহাদুরীর প্রখ্যাপন হয়।

(৩) দেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই তাহার একটি মুখ্য অঙ্গ। তদ্ভিন্ন বৈদেশিক রাজার সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নব্য সংস্কারকদিগকে অতিশয় লালায়িত হইতেই দেখা যায়—সুতরাং আত্মসমাজের সংরক্ষণ ঐসকল সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না।"৭৩

ভূদেব সেজন্য এ ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন নি।

"কিন্তু স্বদেশীয় বিদ্যার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রচার, কল কারখানার প্রতিষ্ঠা, যৌথকারবারের বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তার, সালিশী প্রণালীর সম্বর্ধন, সদাচার পালন এইরূপ বিষয়গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজ সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের রক্ষা সাধন হয়।"৭৪ সুতরাং এ ধরনের সংস্কার ভূদেবের অভিপ্রেত।

কর্তব্য নির্ণয় প্রসঙ্গে ভূদেবের বক্তব্যের সার হলো—স্বদেশ এবং সমাজ সম্পর্কে ভারতবাসী হিন্দুদের মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। ইংরেজী বিদ্যার অন্ধ অনুকরণ না করে তার মধ্যে যা প্রকৃত শিক্ষণীয় আন্তরিকভাবে তার চর্চা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মে উদ্যোগী হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে আশু কর্তব্য। সেজন্য যেমন প্রয়োজনে বিদেশ যাওয়া উচিত তেমনি দেশেও নানা প্রচেষ্টা শুরু করা দরকার।

'সামাজিক প্রবন্ধে'র পঞ্চম অধ্যায়ে—'ভবিষ্যবিচার—সাধারণ কথা'য় ভূদেব বলেছেন,

"মানসদৃষ্টি কাযকারণ সম্বন্ধে প্রাতনিযত এবং স্থিরতররূপে সম্বন্ধ রাখিলে অনুরাগ, বিরাগ, আসক্তি, বিদ্বেষ, প্রসাদ এবং গ্লানি প্রভৃতিভাবের ন্যূনতা হইয়া প্রকৃত তথ্যোপলব্ধির পথ পরিষ্কৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর বিচারে মনের ঐ সকল ঘটনার সহিত আপনাদের সুখদুঃখের এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব, উহারা বাল্য সংস্কাররূপে মনের এমন সারভূত হইয়া থাকে এবং উহাদিগের সহিত উচিত্যানৌচিত্য ধর্মাধর্ম এবং যোগ্যাযোগ্য প্রভৃতি বোধসকল এমন সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত হইয়া যায় যে, বোধ হয় কোনো ব্যক্তিই একান্ত পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া সমাজ তত্ত্বের বিচারে কৃতকার্য হইতে পারেন না।"

এরপর তিনি বলেছেন—'আমি ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার কোনো কথাই আমার অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছি।"

'সামাজিক প্রবন্ধে'র বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, 'একান্ত পক্ষপাতপরিশূন্য' হয়ে সামাজিক ঘটনাবলীর বিচারের দুরূহতাকে ভূদেব অতিক্রম করতে পেরেছেন।

ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার এবং তার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে ভূদেবের সুচিন্তিত অভিমত এবং সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যকে বিশেষভাবেই বৃদ্ধি করেছে। ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছেন তার কোনোকিছুই তাঁর অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক হয়নি, বরং তার দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা এবং স্বচ্ছতা বিজ্ঞমনের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাংলার প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে 'সামাজিক প্রবন্ধ' নিঃসন্দেহে মনীষী ভূদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও নানা জাতি নানা মত, নানা ভাষা-ভাষী অধ্যুষিত সুবিশাল ভারতসমাজকে প্রেক্ষাপটে রেখে এই প্রবন্ধমালা রচিত হয়েছে, তবুও তা একান্তভাবেই রাজনীতিনির্ভর। ভবিষ্যবিচার—সাধারণ কথায় (পঞ্চম অধ্যায়) ভূদেব বলেছেন—"ভূত বিষয়গুলির বিচার করিয়াই ভাবী ব্যাপারের অনুভব হয় এবং সেই অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানের কর্তব্য অবধারণ করা যায়।" এখানে ভূদেব যে কর্তব্যের কথা বলতে চেয়েছেন তা রাজনৈতিক কর্তব্যেরই কথা। তাই ভূদেবের স্বদেশচেতনার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত 'সামাজিক প্রবন্ধে'র প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ছিল 'রাজনৈতিক প্রবন্ধ'—এই আমাদের অভিমত।

সামাজিক প্রবন্ধ	এডুকেশন গেজেটে প্রকাশের তারিখ :			
১। জাতীয়ভাব	২৪শে পৌষ	১২৯৩	৭ই জানুয়ারি	১৮৮৭
২। জাতীয়ভাব : অধিকারী ভেদ	৯ই মাঘ	„	২১শে জানুয়ারি	„
৩। জাতীয়ভাব : ইহার উপাদান	১৬ই মাঘ	„	২৮শে জানুয়ারি	„
৪। জাতীয়ভাব : ভারতবর্ষে মুসলমান	২৩শে মাঘ	„	৪ঠা ফেব্রুয়ারি	„
৫। জাতীয়ভাব : ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান	৩০শে মাঘ	„	১১ই ফেব্রুয়ারি	„
৬। জাতীয়ভাব : ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি	১৭ই ফাল্গুন	„	২৫শে ফেব্রুয়ারি	„
৭। জাতীয়ভাব : কর্তব্য নির্ণয়	২১শে ফাল্গুন	„	৪ঠা মার্চ	„
৮। হিন্দুসমাজ	২৮শে ফাল্গুন	„	১১ই মার্চ	„
৯। হিন্দুসমাজ ও অপরাপর সমাজ	৫ই চৈত্র	„	১৮ই মার্চ	„
১০। হিন্দুসমাজ : বৈজ্ঞানিক ইতিহাস	১৯শে চৈত্র	„	১লা এপ্রিল	„
১১। হিন্দুসমাজ : উপমাত্মক সমাজতত্ত্ব	৩রা বৈশাখ	১২৯৪	১৫ই এপ্রিল	„
১২। হিন্দুসমাজ : ব্যবস্থাসূত্র	১০ই বৈশাখ	„	২২শে এপ্রিল	„
১৩। হিন্দুসমাজ : বিজিত রাজ্যশাসন	৩১শে বৈশাখ	„	১৩ই মে	„
১৪। হিন্দুসমাজ : ইংরাজি সমাগম	৭ই জ্যৈষ্ঠ	„	২০শে মে	„
১৫। পাশ্চাত্যভাব : স্বার্থপরতা	১২ই কার্তিক	„	২৮শে অক্টোবর	„
১৬। পাশ্চাত্যভাব :				

	উন্নতিশীলতা	২৪শে অগ্রহায়ণ	„	৯ই ডিসেম্বর	„
১৭।	পাশ্চাত্যভাব :				„
	উন্নতিশীলতা	৯ই পৌষ	„	২৩শে ডিসেম্বর	„
১৮।	পাশ্চাত্যভাব :				
	সাম্য	২৩শে পৌষ	„	৬ই জানুয়ারি	১৮৮৮
১৯।	পাশ্চাত্যভাব :				
	ঐহিকতা	১৪ই পৌষ	১২৯৫	২৮শে জানুয়ারি	„
২০।	পাশ্চাত্যভাব :				
	স্বাতন্ত্রিকতা	২১শে পৌষ	„	৪ঠা জানুয়ারি	১৮৮৯
২১।	পাশ্চাত্যভাব :				
	বৈজ্ঞানিকতা	২৮শে পৌষ	„	১১ই জানুয়ারি	„
২২।	পাশ্চাত্যভাব :				
	বৈজ্ঞানিকতা	৬ই মাঘ	„	১৮ই জানুয়ারি	„
২৩।	পাশ্চাত্যভাব :				
	বৈজ্ঞানিকতা	১৩ই মাঘ	„	২৫শে জানুয়ারি	„
২৪।	পাশ্চাত্যভাব :				
	রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব	২০শে মাঘ	„	১লা ফেব্রুয়ারি	„
২৫।	পাশ্চাত্যভাব :				
	তাহার উপসংহার	২৭শে মাঘ	„	৮ই ফেব্রুয়ারি	„
২৬।	ইংরাজাধিকার :				
	বণিকভাব	১২ই ফাল্গুন	„	২২শে ফেব্রুয়ারি	„
২৭।	ইংরাজাধিকার :				
	রাজভাব	১৫ই ভাদ্র	১২৯৬	৩০শে আগষ্ট	„
২৮।	ইংরাজাধিকার :				
„	বৈদেশিকভাব	২৯শে ভাদ্র	„	১৩ই সেপ্টেম্বর	„
২৯।	ভবিষ্যবিচার :				
	সাধারণ কথা	১২ই আশ্বিন	„	২৭শে সেপ্টেম্বর	„
৩০।	ভবিষ্যবিচার :				
	ইউরোপের কথা	২রা কার্তিক	„	১৮ই অক্টোবর	„

৩১। ভবিষ্যবিচার :
ভাবতবর্ষের কথা
উপনিবেশযোগ্যতা ৯ই কার্তিক ১২৯৬ ২৫শে অক্টোবর ১৮৮৯

৩২। ভবিষ্যবিচার :
ভারতবর্ষের কথা
ধর্মপ্রণালীবিষয়ক ২৩শে কার্তিক „ ৮ই নভেম্বর „

৩৩। ভবিষ্যবিচার :
ভাবতবর্ষের কথা
ভাষাবিষয়ক ১লা অগ্রহায়ণ „ ১৫ই নভেম্বব „

৩৪। ভবিষ্যবিচার :
ভারতবর্ষের কথা
সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ক
৮ই অগ্রহায়ণ „ ২২শে নভেম্বর „

৩৫। ভবিষ্যবিচাব :
ভারতবর্ষের কথা
আর্থিক অবস্থাবিষয়ক ১৫ই অগ্রহায়ণ „ ২৯শে নভেম্বর „

৩৬। ভবিষ্যবিচাব :
ভারতবর্ষের কথা জৈবনিক অবস্থাবিষয়ক
২২শে অগ্রহায়ণ „ ৬ই ডিসেম্বব „

৩৭। ভবিষ্যবিচার—তাহার উপসংহার
২৯শে „ „ ১৩ই „ „

৩৮। কর্তব্যনির্ণয়—নেতৃপ্রতীক্ষা
৬ই পৌষ „ ২০শে ডিসেম্বর „

৩৯। কর্তব্যনির্ণয়—অতথ্য পরিহার
১৩ই পৌষ „ ২৭শে ডিসেম্বর „

৪০। কর্তব্যনির্ণয়—সূত্র নির্ধারণ
২০শে পৌষ „ ৩রা জানুয়ারি „

৪১। কর্তব্যনির্ণয়—সূত্রের ব্যাখ্যা
২৭শে পৌষ „ ১০ই জানুয়ারি „

৪২। কর্তব্যনির্ণয়—সূত্রের ব্যাখ্যা

	৫ই মাঘ	১২৯৬	১৭ই জানুয়ারি ১৮৮৯
৭৩। উপসংহার	১২ই মাঘ	„	২৪শে জানুয়ারি „

পারিবারিক প্রবন্ধ

গ্রন্থপরিচয়

রচনাকাল ১২৮২-৯৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৬-৮৬ খ্রীস্টাব্দ। প্রবন্ধগুলির বেশিরভাগ প্রথমে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশকাল ১৮৮২ খ্রী। প্রথম সংস্করণ—প্রবন্ধসংখ্যা ত্রিশ।

ভূদেবের জীবৎকালে শেষ সংস্করণ প্রবন্ধসংখ্যা সাঁইত্রিশ। ভূদেবের মৃত্যুর পরে শেষ সংস্করণ প্রবন্ধসংখ্যা ৪৮। ১৩৫৬ সনের শ্রাবণ মাসে চুঁচুড়া বুধোদয় প্রেস থেকে প্রকাশিত পারিবারিক প্রবন্ধের প্রবন্ধসংখ্যা ৪৮। এই গ্রন্থে সংকলিত অতিথিসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পশ্বাদিপালন, ভাইভগিনী, নিবপত্যতা, শিক্ষাভিত্তি, চিরকৌমার, শয়ন এবং নিদ্রাদি, দলাদলি, এই কয়টি প্রবন্ধ ভূদেব-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়নি। তিনটি পর্যায়ে (২৪+৭+৮+) মোট ৩৯টি প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে ভূদেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করার সময় ৮ই মাঘ ১২৮২, ২১শে জানুয়ারি ১৮৭৬ খ্রী, ভূদেব এডুকেশন গেজেটে লেখেন—

'বঙ্গীয় পরিবার ব্যবস্থা এবং ব্যবহার সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রবন্ধ'—এই শিরোনামাঙ্কিত একখানি হাতের লেখা বহি আমাদিগের নিকট রহিয়াছে। যাঁহারা ঐ পুস্তকের কোন কোন অংশ দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অনুরোধ করিয়াছেন প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হয়। ঐ অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমরা ঐ পারিবারিক প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ এডুকেশন গেজেটে যথাস্থানে প্রকাশ করিতে দিলাম। পাঠকবর্গ দেখিবেন প্রবন্ধগুলি একজন গৃহস্থ ব্যক্তির পারিবারিক অভিজ্ঞতাজনিত প্রকৃত মনোভাবের পরিচায়ক।"

দ্বিতীয় পর্যায়ে পারিবারিক প্রবন্ধ রচনা শুরু হলে, ১১ই মাঘ ১২৯১ সন, ২৩শে জানুয়ারি ১৮৮৫, এডুকেশন গেজেটে লেখা হয়—

'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামক পুস্তকের রচয়িতা কোন আত্মীয় বিশেষের অনুরোধে এবং তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতামূলক অপর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, এবং মূল গ্রন্থখানি যেরূপে প্রথমতঃ

এই পত্রিকায় 'প্রাপ্ত স্তম্ভে' মুদ্রিত হইয়াছিল, এই নূতন রচিত প্রবন্ধগুলিও সেইরূপ 'প্রাপ্ত স্তম্ভে' মুদ্রিত হইতে দিয়াছেন।"

পারিবারিক প্রবন্ধ প্রথম পর্যায় :

১। পাবিবারিক প্রবন্ধঃ (১২৮২ সন, ১৮৭৬ খ্রী—প্রথম পর্যায়)

১ম।	বাল্যবিবাহ	৮ই মাঘ,	২১শে জানুয়ারি
২য়।	দাম্পত্য প্রণয	১৫ই মাঘ,	২৮শে জানুয়ারি
৩য়।	উদ্বাহসংস্কাব	২২শে মাঘ,	৪ঠা ফেব্রুয়ারি
৪র্থ।	স্ত্রীশিক্ষা	২৯শে মাঘ,	১১ই ফেব্রুয়ারি
৫ম।	গহনা গডান	৭ই ফাল্গুন,	১৮ই ফেব্রুয়ারি
৬ষ্ঠ।	গৃহিণীপনা	১৪ই ফাল্গুন,	২৫শে ফেব্রুয়াবি
৭ম।	সতীর ধর্ম	২১শে ফাল্গুন,	৩রা মাচ

[পবেব সপ্তাহে আছে নবম প্রবন্ধ, অষ্টম প্রবন্ধের উল্লেখ নেই

৯ম।	সৌভাগ্যগর্ব	২৮শে ফাল্গুন,	১০ই মার্চ
১০ম।	দম্পতি কলহ	৫ই চৈত্র,	১৭ই মার্চ
১১শ।	চাকব প্রতিপালন	১২ই চৈত্র,	২৪শে মার্চ
১২শ।	কৃত্রিম স্বজনতা	১৯শে চৈত্র,	৩১শে মার্চ
১৩শ।	কুটুম্বতা	২৬শে চৈত্র,	৭ই এপ্রিল
১৪শ।	জ্ঞাতিত্ব	৩রা বৈশাখ ১২৮৩,	১৪ই এপ্রিল ১৮৭৬
১৫শ।	পিতামহ ঠাকুর	১০ই বৈশাখ „	২১শে এপ্রিল „
১৬শ।	পিতামাতা	১৭ই বৈশাখ „	২৮শে এপ্রিল „
১৭শ।	পুত্রকন্যা	২৪শে বৈশাখ „	৫ই মে „
১৮শ।	পুত্রবধূ	৩১শে বৈশাখ „	১২ই মে „
১৯শ।	জেঁযাচ	৭ই জ্যৈষ্ঠ „	১৯শে মে „
২০শ।	গৃহশূন্যতা	১৪ই জ্যৈষ্ঠ „	২৬শে মে „
২১শ।	দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ	২১শে জ্যৈষ্ঠ „	২রা জুন „
২২শ।	বহুবিবাহ	২৮শে জ্যৈষ্ঠ „	১১ই জুন „
২৩শ।	ধর্মচর্চা	৩রা আষাঢ় „	১৬ই জুন „
২৪শ।	সন্তান পালন	১০ই আষাঢ় „	২৩শে জুন „
২৫শ।	সন্তানের শিক্ষা	১৭ই আষাঢ় „	৩০শে জুন „

প্রথম পর্যায় 'পারিবারিক প্রবন্ধ' রচনা শেষ। পরপর দু'সপ্তাহে সপ্তম ও নবম প্রবন্ধ রচিত হয়। তারপরে ক্রমধিক থাকে। অথচ অষ্টম প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়নি।

পারিবারিক প্রবন্ধ দ্বিতীয় পর্যায়

১।	ডাক্তার দেখান	১১ই মাঘ	১২৯১	২৩শে জানুয়ারি	১৮৮৫
২।	কাজ করা	১৮ই মাঘ	„	৩০শে জানুয়ারি	„
৩।	একান্নবর্তিতা	৩রা ফাল্গুন	„	১৩ই ফেব্রুয়ারি	„
৪।	চিনিতে পারিলেন না	১০ই ফাল্গুন	„	২০শে ফেব্রুয়ারি	„
৫।	আচার রক্ষা	১৭ই ফাল্গুন	„	২৭শে ফেব্রুয়ারি	„
৬।	লজ্জা অতিপবিত্র পদার্থ	২৪শে ফাল্গুন	„	৬ই মার্চ	„
৭।	পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ	১লা চৈত্র	„	১৩ই মার্চ	„

পারিবারিক প্রবন্ধ তৃতীয় পর্যায়

১।	কন্যাপুত্রের বিবাহ	১লা জ্যৈষ্ঠ	১২৯৩,	১৪ই মে	১৮৮৬
২।	বৈধব্যব্রত	১৫ই জ্যৈষ্ঠ	„	২৮শে মে	„
৩।	রোগীর সেবা	২২শে জ্যৈষ্ঠ	„	৪ঠা জুন	„
৪।	গৃহে ধর্মাধিকরণ	২৯শে জ্যৈষ্ঠ	„	১১ই জুন	„
৫।	গৃহকার্যের ব্যবস্থা	৫ই আষাঢ	„	১৮ই জুন	„
৬।	অর্থসঞ্চয়	১২ই আষাঢ	„	২৫শে জুন	„
৭।	ভোজনাদি	১৯শে আষাঢ	„	২রা জুলাই	„
৮।	গৃহে মৃত্যুঘটনা	৯ই আশ্বিন	„	২৪শে সেপ্টেম্বর	„

সূচীপত্র

বিষয়

পারিবারিক প্রবন্ধ

সূচনা [লেখকের বক্তব্য]

"আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যেজন্যে এবং যেরূপে ভাল লাগিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন হীনবীর্য অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা চিরন্তন বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রণালীই বল আর ধর্মপ্রণালীই বল আর সামাজিকপ্রণালীই বল আর শাসনপ্রণালীই বল এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানভূত।

"আমাদিগের পারিবারিক সুখ অধিক—এটী নিতান্ত অল্প কথা নয়। যদি

পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্মও অধিক আর ধর্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমশালিতাও জন্মিতে পারে।"[১]

মন্তব্য

পারিবারিক প্রবন্ধ লিখতে লিখতেই ভূদেবের মনে সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করার ইচ্ছা জাগে। কারণ পারিবারিক ভিত্তির ওপরই সমাজের বিরাট সৌধ গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে ভূদেবের নিজের স্বীকৃতি আছে।[২]

নামকরণ থেকেই বোঝা যায় সংকলন গ্রন্থটির আলোচ্যবিষয় বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক জীবন। স্বধর্মনিষ্ঠ বাঙালী ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শাস্ত্রনির্দেশিত জীবনচর্যার একটি আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধের পাতায় পাতায় তাঁর সেই ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা নানা স্মৃতি বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই মতের মিল থাক আর না থাক, বক্তব্যের আন্তরিকতা সম্পর্কে পাঠকের মনে কোনো সংশয় থাকে না।

আলোচ্য গ্রন্থে ভূদেব বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলি দীর্ঘ সময় ধরে রচিত হলেও পরিবার সম্পর্কে ভূদেবের ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি—একথা লক্ষ্য করা যায়। বরং বলা চলে এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে পর্যালোচনা করে তাঁর মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই তিনি প্রবন্ধাকারে রূপ দিয়েছেন।

বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পিতামাতা, পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, অন্যান্য আত্মীয় সম্বন্ধ, পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য—কোনো কিছুই ভূদেবের দৃষ্টির বাইরে পড়েনি। পারিবারিক জীবনে মোটামুটিভাবে রক্ষণশীল হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

ভূদেব বাল্যবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয়সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা এ পথেই সম্ভব। বাল্যবিবাহ, দাম্পত্য প্রণয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি একথাই বলেছেন। পুরুষ কিংবা নারী কারোরই দ্বিতীয় বিবাহের তিনি একান্তবিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এতে চিত্তের অসংযম বোঝায়। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় নরনারীর জীবনকে কতটা সার্থক করে তোলে 'সৌভাগ্যগর্ব' এবং 'গৃহশূন্যতা'য় সে কথাই বলা হয়েছে। দাম্পত্যসম্পর্কের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভূদেব নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

পারিবারিক কর্তব্য সম্পর্কে ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গি উদার। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং

ন্যায়পরায়ণ হয়ে গৃহকর্তাকে এইসব কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। ভূদেবের মতে সংসারের সমস্ত কর্তব্য গৃহকর্ত্রীকে স্বয়ং সম্পাদন করতে হবে, গৃহকর্তা সর্বোপরি সে সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ রাখবেন। সন্তানের শিক্ষায় লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যেন সর্বতোভাবে প্রকৃত মানুষ হয়। পিতামাতাকে সেজন্য আদর্শচারী হতে হবে। বড়ো সংসারে গৃহকর্তাকে অকৃত্রিম অপক্ষপাতী এবং ন্যায়ানুগামী হতে হবে। এমনকি বিধবা মার সংসারে যেখানে পুত্র কর্তা সেখানে প্রয়োজন হলে পুত্রকে মাব ত্রুটিগুলি সসম্মানে সংশোধন করে দিতে হবে। গৃহে ধর্মাধিকরণ, গৃহকার্যের ব্যবস্থা, সন্তান পালন, প্রভৃতি সম্বন্ধে এই হলো তাঁর বক্তব্য। ভূদেব একান্নবর্তী সংসারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। তাঁব মতে একান্নবর্তিতাব মূল কারণ দরিদ্রতা। এর ফলে একজনের ওপর নির্ভবশীলতা জন্মায় এবং পবিবারের অন্যান্যের মধ্যে উপার্জন করার ইচ্ছা কমে আসে। তবে একান্নবর্তিতার গুণ হলো—এর ফলে বশ্যতা, ত্যাগশীলতা সমদর্শিতা জন্মায। তবু সবদিক বিবেচনা করে তিনি একান্নবর্তিতাকে খুব সমর্থন জানাতে পারেন নি। তাব মতে "…বাঙালীরা পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং পৃথগন্নবর্তী পরিবারেব নিন্দা করিযা থাকেন। এরূপ হইবার কারণ আর যাহাই থাকুক, এতদ্দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য দশা যে একটি তাহার মধ্যে মুখ্য, তদ্বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ হয় না। যদি বাঙালীদের প্রতি পরিবারে একজন মাত্র কৃতী এবং উপায়ক্ষম না হইয়া অনেকেই কৃতী এবং উপায়ক্ষম হইত তাহা হইলে পৃথগন্ন হইয়া থাকিতে কষ্ট অল্প হইত, এবং পৃথগন্নবর্তিতা, পরিবারের সম্পত্তিশালিতা এবং বলবত্তার পরিচালক বলিয়া নিন্দনীয় না হইয়া বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। বস্তুত পৈতৃক ধনবিভাগের সৌকর্য, সকল ভাইগুলির কিছু কিছু উপার্জন ক্ষমতা, তাঁহাদিগের পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিবার অধিকার এগুলি দেশের মঙ্গল এবং উন্নতির পক্ষে অতীব প্রার্থনীয়। এই সকল ভাবিয়া আমার ইচ্ছা হয় যে লোকে পৃথগন্নবর্তিতার নিন্দা না করিয়া বরং তাহার প্রশংসাই করিতে শিখে।"[৩]

(একান্নবর্তিতা)

'চাকর প্রতিপালন', 'পশুপাখির প্রতিপালন', 'অতিথিসেবা' 'গৃহকার্যের ব্যবস্থা' 'রোগীর সেবা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সংসারী মানুষের ওই সব কর্তব্যের যথাযথ অনুশীলন সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় 'ধর্মচর্যা'। 'ধর্মচর্যা' নামক প্রবন্ধে তিনি এ

বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল হলেও অন্ধ নন। তাঁর মতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হলে চিরন্তন ধর্মকেই অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে এমন নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগরিত রেখে যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রকে বুঝে তবে তা মানতে হবে। নিজের মনকে কোনো কিছু সম্পর্কেই বিদ্বেষ দূষিত হতে দিতে নেই। পরিবারে কারো মনে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে তা প্রকাশ করার সাহস দিয়ে, যুক্তি দ্বারা সে সন্দেহ দূর করা উচিত। ধর্মসম্পর্কে প্রকৃত মনোভাব গোপন করাব চেষ্টা অবৈধ। তাছাড়া সমাজে কোন প্রকৃত কাবণ না থাকলে শুধু শুধু ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হবে কেন?

এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

"প্রকৃত দোষ না থাকিলে কখনই কোন বিপ্লবের বীজ সমাজমধ্যে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। বাস্তবিক আমাদিগেব সনাতন ধর্মপ্রণালীতে কতগুলি অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে অনেকস্থলেই কেবল আচারের আঢ়াআটি বাড়িয়া ধর্মভাবেব অন্তঃসারশূন্যতা জন্মিয়াছে, আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কতকগুলি কুসংস্কার সমাজের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কর্তব্য যে, কায়মনোবাক্যে ঐসকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন।"[৪]

(ধর্মচর্যা)

বাঙালীব সামাজিকজীবনে দুটি বড়ো সম্পর্ক জ্ঞাতিত্ব এবং কুটুম্বতা। ভূদেব জ্ঞাতিত্ব প্রবন্ধে বলছেন—ইহলৌকিক স্বার্থ সম্বন্ধই জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ককে অবনত করে তোলে—সম্পত্তিই সেই স্বার্থ। তাই সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই উচিত। একে জ্ঞাতিপালনে পরাঙ্মুখতা বলা চলে না। তেমনি কুটুম্বতা। এ সম্পর্কটি বড়ো জটিল, এর সমাধান কন্যাসম্প্রদাতা এবং কন্যাগ্রহীতা দুই কুটুম্বকেই সমান চোখে দেখা। কুটুম্বরা কুটুম্বের গৌরব চান—তাই গৌরববৃদ্ধিকারক কাজে সর্বদা কুটুম্বদের সঙ্গে পরামর্শ করে চললেই এ সম্পর্ক বজায় থাকে। 'কুটুম্বতা' প্রবন্ধে, এ হলো ভূদেবের সযৌক্তিক অভিমত।

পারিবারিক প্রবন্ধের আলোচনা থেকে বোঝা গেল দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে ভূদেব অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। ভূদেবের সমস্ত অভিমতের মূল কথা যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করা। যে-সব ক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষণশীল বলে বোঝা যায়, সেখানেও তিনি যুক্তি

দ্বারাই তা দেখাতে চেয়েছেন। তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মানসিকতারও সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে ভূদেবের মতামত আজ আর সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় কন্যা-সন্তানের প্রতি তাঁর মনোভাব। তিনি মনে করতেন পিতৃধনে কন্যার অধিকার থাকা উচিত নয়। কিন্তু আজকের দিনে আইনের চোখে পুত্র আর কন্যা সমান সমান। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁব বক্তব্য আজকেব দিনেও কমবেশি প্রযোজ্য। বিশেষ কবে একান্নবর্তী পবিবারেব সম্পর্ক আজকের দিনে তো ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

পারিবারিক প্রবন্ধেব সাহিত্যিক মূল্য ভাষার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে, বক্তব্য প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী প্রাঞ্জলতায। ব্যক্তিগত স্মৃতি কখনো বা কৌতুক রচনার আকর্ষণ বাড়িয়েছে। 'দাম্পত্যকলহে' তাঁব কৌতুকবোধ বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি দাম্পত্যকলহ নিরসনেব পাঁচটি নিয়ম নির্দেশ কবেছেন। তাব পঞ্চম নিয়মটিতে তিনি বলছেন' ''যতক্ষণ বিবাদ না মিটে অনন্যকর্মা হইয়া থাকিও। সংসাব উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদভঞ্জন না হইবে ততক্ষণ কোন কাজই করা হইতে পারে না, অপব কাহারও সহিত কথা হইতে পাবে না, খাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পাবে না—বিশেষত ঘুমানটি কোনক্রমেই হইতে পাবে না।

"উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মই গুরুতর বিশেষত পঞ্চম নিয়মটি এবং তাহার শেষ ভাগের কথাটি সকল নিয়মের সার নিয়ম।"

ভূদেব মানসের অনুসন্ধানে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য চাবিকাঠি। পারিবারিক প্রবন্ধের ভূমিকায় ভূদেবেব সুখী ও সার্থক দাম্পত্যজীবনের চিত্রটি অন্তবঙ্গ অনুভূতির সঙ্গে আঁকা হয়েছে। এবও মূল্য কম নয়।

আচার প্রবন্ধ

গ্রন্থ পরিচয়

রচনাকাল ৩১।১।১৮৯০ থেকে ৮।৯।১৮৯৩ পর্যন্ত এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়, পুস্তাকাকারে প্রকাশকাল ১৮৯৫ খ্রীঃ-এর ২রা ফেব্রুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩০১।

সূচীপত্র

বিষয়

আচার প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে ভূদেব লিখেছেন "দেশীয় পরম পবিত্র সদাচার পালন ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্যকর, তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সজ্ঞান ও সভক্তিক শাস্ত্রশিক্ষার ত্রুটিতে দেশমধ্যে ন্যূন হইবার উপক্রম হইতেছে। শাস্ত্রজ্ঞানের ও সদাচার পালনের সংজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদেরই পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই পরমধন তোমাদের মধ্যে অবিকৃতভাবে থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও বালকবৃন্দের আচার শিক্ষার আনুকূল্যে এবং স্বজাতীয় পরমপবিত্র শাস্ত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধির সাহায্যে এই আচার প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি।"[১]

উপরোক্ত এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আচার প্রবন্ধ' রচনায়

উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রচর্চা আর সদাচার পালনকে তিনি পরমধন বলে বিশ্বাস করেছেন এবং তাকে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে চেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে ভূদেবের এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃঢভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাচীন আর্যসমাজের শাস্ত্রীয় আচারবিধিকে তিনি অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেছেন এবং তার আনুকূল্যে সযৌক্তিক সমর্থন জানিয়েছেন।

আচার প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে তারিখ পাওয়া যাচ্ছে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ খ্রীঃ। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। সেই সময় বাংলা দেশে খ্রীষ্টান মিশনরীদের ধর্মপ্রচার প্রয়াস অনেকটা প্রশমিত হয়েছে, ব্রাহ্মধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীশক্তিতে হিন্দুধর্মও নতুন প্রাণোদ্বেলতায় উদ্বোধিত হয়েছে। ভূদেব এমনই এক সময়ে হিন্দুর পুরাতন আচারবিধিকে পুনঃপ্রবর্তিত করতে চেয়েছেন।

'আচার প্রবন্ধ' মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগে নিত্যাচার প্রকরণ, আর একভাগে নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ। নিত্যাচার প্রকরণে হিন্দু গৃহস্থের দৈনন্দিন করণীয় কর্মের তালিকা ও তার বিশ্লেষণ এবং নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে 'কোনো হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয়' তার আলোচনা করা হয়েছে। আচার প্রবন্ধ সাধারণভাবে হিন্দু গৃহস্থের জন্যে লেখা হলেও এতে প্রধানত ব্রাহ্মণ্য আচারবিধির কথাই আলোচিত হয়েছে। কারণ হিন্দু সমাজের সৎজীবন যাপনের যে আদর্শ প্রচারিত হয়েছে 'ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই সেই জীবন্ত আদর্শ হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।"[২] ভূদেবের মতে "আর্যশাস্ত্র মনুষ্যকে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সমস্ত উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং তাহার প্রকৃত পথগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিয়া এই বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদর্শিত পথে যতদূর যাইতে পারিবে, সেই পরিমাণেই সে ব্যক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবে। ...... আর্যশাস্ত্র আদর্শ নির্দেশের দ্বারাই লোকের শিক্ষাসাধন করেন। কেহ আদর্শের অবিকল অনুরূপ না হইলেই একেবারে তাহার প্রত্যাখ্যান করেন না। এই তথ্যের অবগতি হইলে অনেকটা ভ্রমপ্রমাদের নিরসন হয় এবং লোকে বহু পরিমাণে আশ্বস্ত এবং শঙ্কাশূন্য হইয়া গন্তব্যপথে স্থির লক্ষ্য হইয়া চলিতে পারে।"[৩]

ভূদেব শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আচারকেই অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করণীয় অনুষ্ঠানের সময়সূচীর যে কিছু পরিবর্তন,

আবশ্যক হতে পারে একথাও বলেছেন। কিন্তু তা বলে সেগুলিকে বর্জন করার কথা বলেননি। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন এবং রাত্রি সমস্ত দিনরাত্রিকে এই পাঁচভাগে ভাগ করে বিভিন্ন সময়ে যে সব করণীয় অনুষ্ঠান, তার সমর্থনে তিনি যা বলেছেন, তাতে রক্ষণশীল মনোভাবটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূদেব যখন এই প্রবন্ধগ্রন্থটি রচনা করেন তখন উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে। তারপর আজ বিংশ শতাব্দীও প্রায় শেষের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, যে রূপান্তর সে লাভ করেছে তা অতি বিস্ময়কর। প্রায় আশীবছর আগেকার সমাজমানসের সঙ্গে আজকের সমাজমানসের পার্থক্য আকাশ পাতাল। তাই 'আচার প্রবন্ধে' উক্ত সমস্ত বিধান এবং অনুষ্ঠেয় কর্মকে আজকের দিনে বিনাবিচারে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নির্দেশ বলে মেনে চলা আর সম্ভব নয়। শাস্ত্রোক্ত আদর্শ ব্রাহ্মণ আজকের দিনে কোটিকে গুটিক। অন্যধর্মের সঙ্গে আর্যধর্মের তুলনা করার সময় ভূদেবের রক্ষণশীল মনোভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে শ্রাদ্ধকৃত্যের উপসংহারে তিনি বলছেন—"আর্যধর্মের একাঙ্গমাত্র এবং অন্যান্য ধর্মপ্রণালীর সমস্ত লইয়া তুলনা করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে আর্যধর্মই পূর্ণ, অপর সকল আংশিক এবং কোনো কোনোটি অতি ভাবুকতা দোষে ধর্মের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে।"[৪] তবে নৈমিত্তিকাচার প্রকরণে হিন্দুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করণীয় অনুষ্ঠানের যে ব্যাখ্যা ভূদেব করেছেন তা সত্যই সুন্দর। কারণ এতো পরিবর্তন সত্ত্বেও সামাজিক হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে), বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ শাস্ত্রনির্দেশিত পথেই চলেছে। আর্যদৃষ্টির সম্পূর্ণতা এই সব অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমস্ত শুভকর্মের সূচনায় বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের যে স্মরণ অনুষ্ঠান তার আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকার না করলেও এর যে একটি বিশেষ হার্দিক মূল্য আছে একথা অনস্বীকার্য। মনে হয় এই জন্যেই এই সব অনুষ্ঠানের যে ধারাবাহিকতা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তা আজও অক্ষুন্ন।

'পারিবারিক প্রবন্ধে'র মতো 'আচার প্রবন্ধে'র ভাষাও সহজ এবং প্রাঞ্জল। বক্তব্যে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রবন্ধকারের অন্যতম প্রধান গুণ বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের ধারণার স্বচ্ছতা ভূদেবের রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আচার প্রবন্ধ' লেখকের পরিণততম ভাষার সাক্ষ্য দান করে।

একটি উদাহরণ—

"ভগবান ভাষ্যকার বলেন—শাস্ত্রোদ্‌ভাসিত ইন্দ্রিয়গণ দেবতা আর স্বাভাবিক বা তমোগুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণ অসুব। উহাদিগের যুদ্ধক্ষেত্র মনুষ্যশরীব। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির তমোগুণ নির্জিত হইলেই দেবতাব জয় হয় অর্থাৎ শাস্ত্রাচারেব ফল হয়। সেইজন্য ধর্মই শাস্ত্রাচাবের মূল।

(উপক্রমণিকাধ্যায—ধর্মোংস্য মূলানি)

পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষাবিদ ভূদেব কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও বচনা কবেন।

ইতিহাস এবং বিজ্ঞানেব উপব এই সব গ্রন্থ রচিত।

বিজ্ঞান বিষযক · প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১ম, ২য ভাগ ক্ষেত্রতত্ত্ব।

গ্রন্থ পরিচয :

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগ ১৮৫৮ খ্রী-এ বচিত ও প্রকাশিত।

বিষযসূচী · জডেব গুণ, গতিব নিযম, ভাবসাম্য।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২যভাগ ১৮৫৯ খ্রী-এ বচিত ও প্রকাশিত।

বিযযসূচী : যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয যন্ত্র।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দুইখণ্ড একত্রে সংযুক্ত সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রী।

ক্ষেত্রতত্ত্ব	১৮৬২ খ্রী প্রকাশিত। নর্ম্যাল স্কুলে কাজ করার সময় এটি বচিত। ভূদেব ১৮৫৬ খ্রী-এব জুন মাসে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাহলে গ্রন্থটি ১৮৫৬-৬২ খ্রী-এর মধ্যে রচিত। ইউক্লিডের প্রথম তিন অধ্যায · টীকা ও অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা সমেত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায অনূদিত ইউক্লিডের গ্রন্থকে অবলম্বন করে রচিত।

ইতিহাস

১। পুরাবৃত্তসার	১৮৫৮ খ্রী প্রকাশিত।
(প্রাচীনকালের বিবরণ)	প্রথমবারেব বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় নানা ইংরেজী পুস্তক থেকে 'পুরাবৃত্তসার' সংকলিত। পশ্চিমে মিশর-দেশ থেকে পূর্বদিকে পারস্যসাম্রাজ্য পর্যন্ত নানা জনপদ-বাসী কতকগুলি প্রধান প্রধান জাতীয় লোকের প্রাচীন-কালের বিবরণ এতে সংক্ষেপে দেওয়া হয়।

		২য় সংস্করণে গ্রীসের ইতিহাস এবং ৫ম সংস্করণে রোমের ইতিহাস এই সঙ্গে যুক্ত হয়। ভূদেবের জীবৎকালে গ্রন্থটির চৌদ্দটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংস্করণেই কিছু কিছু নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করা হয়। চতুর্দশ সংস্করণ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯০ খ্রী) প্রকাশিত হয়।
২।	রোমের ইতিহাস	১৮৬৩ খ্রী পুরাবৃত্তসার থেকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত। গ্রীসেব ইতিহাসও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়।
৩।	ইংলণ্ডের ইতিহাস	১৮৬২ খ্রী প্রথম প্রকাশিত। ১ম সংস্করণে ১৮৫৭ খ্রী পর্যন্ত, ৫ম সংস্করণে ১৮৮৬ খ্রী পর্যন্ত, ষষ্ঠ সংস্করণে ১৮৯১ খ্রী পর্যন্ত বিবরণ আছে। ষষ্ঠ সংস্করণে ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাব সঙ্গে সমসাময়িক ভারতবর্ষীয় এবং অন্যান্য দেশেরও কিছু বিবরণ সংযোজিত।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়—

"ফলতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের রাজকার্যসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারা গিয়াছে।"

বাঙ্গালার ইতিহাস

তৃতীয়ভাগ	'বাংলার ইতিহাস' প্রথমভাগ নবাব আলিবর্দি খাঁব শাসনকাল পর্যন্ত লেখেন রামগতি ন্যায়রত্ন, দ্বিতীয় ভাগ লর্ড বেণ্টিকের শাসনকাল পর্যন্ত—রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তৃতীয়ভাগ—ভূদেব রচনা করেন। আটটি অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থে—স্যার চার্লস মেটকাফ থেকে শুরু করে স্যার জন লরেন্স—বীডন-এর কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণিত। পরিশিষ্টে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিববরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকা এবং সূচীপত্র দেওয়া হলো। তা থেকেই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানা যাবে।

পুরাবৃত্তসার

প্রথমভাগ

(প্রাচীনকালের বিবরণ)

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

"বাঙ্গালাভাষায় ইতিহাসগ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্য-জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিপ্রায়ে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্বদিকে পারস্যসাম্রাজ্য পর্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপয় প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব বিবরণ সমুদায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা, আর মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ধন এবং পরিবর্তনশীল, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যয়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছি কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত হ্যাণ্ড সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয় এবং ইহার মুদ্রণকালে হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়াতে এবারে সেই সকল অংশ পরিত্যাগ এবং গ্রীক জাতির বিবরণ নতুন সংযুক্ত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবমবারের বিজ্ঞাপন

প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন কথার এবং নূতন নূতন বিষয় লইয়া কয়েকটি নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দশমবারের বিজ্ঞাপন

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

ত্রয়োদশবারের বিজ্ঞাপন

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করিয়া এবং পঞ্চম প্রকরণে একটি নূতন অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

পঞ্চদশবারের বিজ্ঞাপন

পুরাবৃত্তসারের প্রথম তিনটি প্রকরণ বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে মিশরীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়দিগের এবং গ্রীস ও রোমের ইতিহাস একত্রে (প্রকরণগুলির সংখ্যামাত্র পবিবর্তিত করিয়া) ডিমাই আট পেজি (ভূদেব গ্রন্থাবলীর অপর পুস্তকগুলির ন্যায় একই) আকারে মুদ্রিত করা হইল। মধ্যে কিয়দ্দিন পুরাবৃত্তসার হইতে গ্রীস এবং রোমের ইতিহাসভাগ বিশেষরূপে বিদ্যালয় সকলে পঠিত হয় দেখিয়া, ঐ দুইটি ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল।

চৈত্র ১৩২৩

গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস

(পুরাবৃত্তসার হইতে)

সপ্তদশবার মুদ্রিত

সন ১৩০১

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন—পুরাবৃত্তসারের প্রথম বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়ায় এবারে সেইসকল অংশ পরিত্যাগ এবং গ্রীকজাতির বিবরণ নূতন সংযুক্ত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবমবারের বিজ্ঞাপন

প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন নূতন বিষয় লইয়া কয়েকটি নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দশমবারের বিজ্ঞাপন

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দ্বাদশবারের বিজ্ঞাপন

এবারে পুরাবৃত্তসারের মূল্য বার আনা হইতে ন্যূন করিয়া আট আনা করা গেল।

ত্রয়োদশবারের বিজ্ঞাপন

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করিয়া এবং পঞ্চম প্রকরণে একটি নূতন অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

পঞ্চদশবারের বিজ্ঞাপন

পুরাবৃত্তসার হইতে গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস ভাগই বিশেষরূপে বিদ্যালয় সকলে পঠিত হয় দেখিয়া ঐ দুইটি ইতিহাস এইবারে স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রিত করা গেল এবং পুস্তকের মূল্যও ন্যূন করা গেল।

রোমকজাতির বিবরণ

প্রথম অধ্যায় : ইটালিদেশের প্রকৃতি ও বিভাগ—ঐ দেশনিবাসী প্রাচীন জাতীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—রোমের পূর্বাবস্থা—উহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা—শাসনপ্রণালী—বিবিধ প্রকার সাধারণী সভা—ধর্মপ্রণালী—রাজতন্ত্রভার নাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপন—লাটিন জাতীয়দিগের পরাভব—পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দিগের মধ্যে বিবাদারম্ভ—ট্রিবিউন প্রভৃতি কর্মচারীদিগের নিয়োগ—কোরাইওলেনস—ভূমি-বিভাগ-বিষয়িনী ব্যবস্থা—প্লিবীয়দিগের বলবৃদ্ধি—শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত—নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব।

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা—দিসেম্বর নিয়োগ—পুনর্বার কন্সল নিয়োগ—বিয়াইনগর জয়—গল জাতীয় লোকের দ্বারা রোমের দাহ—লিসীনীয় ব্যবস্থা—প্রিটরের নিয়োগ—প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি—লাটিন ও সাম্নাইট জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—পিরহসের সহিত যুদ্ধ—ইটালির লোকবিভাগ—শাসনপ্রণালী।

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম পুনিকযুদ্ধ—রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি—কার্থেজীয়দিগের কর্তৃক স্পেনদেশ অধিকার—

হ্যানিবল—দ্বিতীয় পুনিকযুদ্ধ—ম্যাসিডনরাজ, ফিলিপের সহিত যুদ্ধ—গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ—রোমীয়দিগের মধ্যে অর্থলোভের প্রবেশ।

পঞ্চম অধ্যায় : রোমীয় নাগরিকদিগের অবস্থা এবং চরিত্র—দুর্বৃত্ত-লোকের সাহায্যে আঢ্যদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা—টাই-বিরিয়স গ্রাকস কেইয়স গ্রাকস—নুমিডিয়ার যুদ্ধ—টিউটন এবং কেন্দ্রীয় লোকের সহিত যুদ্ধ—ইটালীয়দিগের বিদ্রোহ—সেই বিদ্রোহ শান্তি—মিথিডেটিসের সহিত যুদ্ধ—মেরাইয়স এবং সলা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : পম্পী—জুলিয়স সীজর—সিসিরো—দলপতিত্রয়ের সাম্রাজ্য শাসন—সিজরের কীর্তিকলাপ—পম্পীর ঈর্ষা—উভয়ের যুদ্ধ—সিজরের সর্বকর্তৃত্ব—তাঁহার অপমৃত্যু—ব্রুটস এবং ক্যাসিয়স—আণ্টনি এবং অক্টেবিয়সের সর্বকর্তৃত্ব—শেষোক্তের অগস্টস নাম পরিগ্রহ।

সপ্তম অধ্যায় : অগস্টসের সাম্রাজ্য শাসন—তাৎকালিক ধর্মপ্রণালী, খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার—রোমীয় অঙ্গনাদিগের দুষ্টাচার—টাইবিরিয়স—কালিগুলা—ক্লডিয়স—নিরো।

অষ্টম অধ্যায় : গালক—ওথো—বিটেলিয়স—বেস্পেসিয়ান—টাইটস—ডোমিসিয়ান।

নবম অধ্যায় : কমোডস—পার্টিনাকস—জুলিয়ানস—সেপ্টিমস সিবিয়স—কারাকাল্লা—মেক্রাইনস—ইলাগেবানস আলেকজাণ্ডার সিবিরস—মাকাসিমিন—মাকাসাইমস বালবাইনস—গাডিয়ান—ফিলিপ—ডিসিয়স—গালস এমোলিয়ানস—ভালেরিয়ান—গালিএনস—ত্রিংশদ্দুরাচারের অধিকার ক্লাডিয়াস—আরলিয়ান জিনোবিয়া—টাসিটস—ফ্লোরিয়ান—প্রোবস—কেরস—নুমিরিয়ানস—কোরিনস—ডাইওক্লিসিয়ান।

দশম অধ্যায় : ডাইওক্লিসিয়ান—অগস্টসদ্বয় এবং সীজরদ্বয়ের মিলিত রাজা—কনস্টানশুস—কনস্টাণ্টাইন—জুলিয়ান, জোবিয়ান—বালেনটিনিয়ানস—প্রোসিয়ান—থিওডোয়াস।

গ্রীসের ইতিহাস

স্চীপত্র

ইংলণ্ডের ইতিহাস

ষষ্ঠ সংস্করণ

১২৯৮ সাল

বিজ্ঞাপন

এক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আমাদিগের এমত নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে যে,

অনেকাংশেই উভয়জাতির সুখ-দুঃখ সমৃদ্ধি, হ্রাস গৌরব ও অপমান একই কারণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উভয়েরই উভয়ের গুণদোষ পরিচিত হওয়া সবিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন দেশীয় লোকের জাতীয় প্রকৃতি তজ্জাতীয় ইতিবৃত্তদ্বারা যেমন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, আব কোন উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় না। বিশেষত ইংলণ্ডীয় ইতিহাস পাঠদ্বারা যে রাজনিয়ম ও রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী সমস্ত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, ইহা সকলেই স্বীকাব করিয়া থাকেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তৎসংক্রান্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক।

যে সকল জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের প্রযত্নে ইংলণ্ডীয় ভাষা ইহার আধুনিক পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে সকল ক্ষমতাবান এবং বুদ্ধিজীবি (?) ব্যক্তিব্যূহের কৌশলে ইংলণ্ডের শিল্পকার্য অন্য সর্বদেশের শিল্পকার্য অপেক্ষা সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছে যেরূপে কালক্রমে ক্রমশঃ ইংলণ্ডীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার সমস্ত সম্বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুমাত্র বর্ণন করিতে পারা যায় নাই বলিলেই হয়। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের রাজকার্যসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু ইহা পাঠ কবিলেও ইতিহাস পাঠের অন্ততঃ প্রথমোল্লিখিত উদ্দেশ্যটি সাধন হইতে পাবিবে, এই আশয়ে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা গেল।

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন

ইংলণ্ডের ইতিহাস সংশোধিত এবং দুইটি নূতন অধ্যায়ের সংযোগে পরিবর্ধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। পূর্ব পূর্ব সংস্করণে ঐতিহাসিক বিবরণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসিয়াছিল এক্ষণে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আসিল।

ষষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন

ইংলণ্ড ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার সমসাময়িক ভারতবর্ষীয় এবং অপরাপর দেশীয় কতকগুলি বিবরণ টীকাকারে নিবেশিত এবং শেষভাগে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ সংযুক্ত করিয়া এই পুস্তক ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইল। মূল্য ১ টাকা হইতে ।।৹ আনা করা গেল।

বাঙ্গালার ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

সূচীপত্র

বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)

নাটক সমালোচনা—

"বিবিধ প্রবন্ধ" প্রথমভাগে তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তিনটিই সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা। ভবভূতির উত্তরচরিত, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী এবং শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক আলোচনার বিষয় হয়েছে। সাহিত্যরসিক ভূদেবের অন্তর্লোকের দ্বারোদ্‌ঘাটনে এই সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি বিশেষ সহায়ক। তিনটি প্রবন্ধই প্রথমে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়।

উত্তরচরিত—	এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় ১২৮৭, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে।
রত্নাবলী—	একই পত্রিকায়, ১২৮৭, ৯ই আশ্বিন থেকে ৫ই

অগ্রহায়ণের মধ্যে, আবার ১২৯০, ১২ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে।

মৃচ্ছকটিক— একই পত্রিকায় ১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ থেকে ১১ই চৈত্রের মধ্যে।

ভূদেবের মৃত্যুর পরে, ১৩০২ সালে, ইংরেজী ১লা জুন ১৮৯৫, তিনটি প্রবন্ধ একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভূদেব চরিত—৩য় ভাগ' পৃষ্ঠা ২১৪ থেকে এই সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম ভাগ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠ এ বিষয়ে সহায়ক হয়েছিল। তারই ফলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে নতুন করে বিচার করার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। বিদ্যাসাগর[১] রাজেন্দ্রলাল[২] প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তবে এঁরা দুজন বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করেন নি। এঁরা ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের আলোকেই প্রাচীন সাহিত্যকে দেখেছেন। সাহিত্যে এঁরা স্বভাবানুকারিতার পক্ষপাতী। কিন্তু সমালোচনার যে আধুনিক রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত অর্থাৎ সাহিত্যকে ভেঙে ভেঙে না দেখে সামগ্রিকভাবে তাকে উপভোগ করা, সে রীতির প্রথম দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা। এই সমালোচনাটি ভবভূতির উত্তররামচরিতের ওপর রচিত।[৩] বঙ্কিমচন্দ্রও স্বভাবানুকারিতাকে স্বীকার করেছেন কিন্তু তাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেননি।' বলেছেন 'সৃষ্টিচাতুর্য' থাকা চাই। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে ভবভূতির সেই সৃষ্টিচাতুর্যের দোষগুণ নির্ণয় করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পথেই অগ্রসর হয়েছেন।

ভূদেবের 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেবের পরলোকগমনের পরে এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৪] সাহিত্যরসিক ভূদেবের একটি অপূর্ব পরিচয় এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় সাহিত্যেই ভূদেবের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে এক আশ্চর্য

সেতুবন্ধন ঘটেছিল তাঁর মনে। আর তারই ফলে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁর সমালোচনায় তিনি কোথাও কোনো ভারতীয় আলংকারিক বা পাশ্চাত্য সমালোচকের মতবাদের উল্লেখ করেননি। কিন্তু তবুও এই দু-এর মধ্যে একটি সামঞ্জস্যবোধ তাঁর রচনায় সহজেই অনুভূত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' সমালোচনার (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) আটবছর পরে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ভূদেবের প্রথম সমালোচনা 'উত্তরচরিত' প্রকাশিত হয়। ভূদেবের সমালোচনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমালোচনার উত্তর বলা চলে।[৫] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ককে কাব্য হিসাবে অপূর্ব বলে স্বীকার করেও সমগ্র নাটকের পক্ষে তাকে অনাবশ্যক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ভূদেবের আলোচনা এই তৃতীয় অঙ্কটিকে নিয়েই। দাম্পত্য জীবনরসের শ্রেষ্ঠ কবি ভবভূতির আশ্চর্য মানবচিত্তাভিজ্ঞতা কিভাবে এই তৃতীয় অঙ্কটিকে উজ্জ্বল এবং সমগ্র নাটকের পক্ষে অপরিহার্য করে তুলেছে, অপূর্ব সহৃদয়তায় ভূদেব তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভূদেবের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রত্নাবলী'। রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এই নাটকটির অনন্যতাকে ভূদেব উপলব্ধি করেছেন। পাশ্চাত্য মতে নাটকের স্থান, কাল ও নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য থাকা চাই। আর সেই সঙ্গে থাকা চাই স্বাভাবিকতা। সাধারণ জীবনে আমরা অস্বাভাবিক আচরণকে বলে থাকি নাটকীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটকের পাত্রপাত্রীর আচরণে বাস্তবসুলভ স্বাভাবিকতা না থাকলে তার নাট্যগুণ নষ্ট হয়। সংস্কৃত সব নাটকেই এই দুটি গুণের অভাব দেখা যায়। এদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম 'রত্নাবলী'। ভূদেব রত্নাবলীর এই বিশিষ্টতা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নরনারীর দাম্পত্যজীবনে প্রকৃত প্রণয়বন্ধন শিথিল হলে স্বামীস্ত্রীর আচরণ কেমন আতিশয্যপূর্ণ হয় দাম্পত্য জীবনের সেই সূক্ষ্মতাকে ভূদেব পাঠকের প্রত্যক্ষগোচর করেছেন। রত্নাবলীর রাজা উদয়নের মনে মহিষী বাসবদত্তা সম্পর্কে প্রকৃত প্রেমানুরাগের অভাব ছিল। নাট্যকার সেই অভাবকে কেমন শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন ভূদেব তা বিশ্লেষণ করেছেন। আর তারই পাশাপাশি সাগরিকার উদ্দেশ্যে উদয়নের উক্তিতে যে আন্তরিকতা অনুভূত হয়েছে প্রবন্ধকার প্রথমটির সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। এইভাবে যে মানবচিত্তাভিজ্ঞতা ভূদেব উত্তরচরিতে দেখেছেন, তা-ই আর একভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রত্নাবলীতে।

তৃতীয় প্রবন্ধ শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকে'র ওপর রচিত। মৃচ্ছকটিকে ভূদেব প্রাধান্য

দিয়েছেন চরিত্রকে। এই নাটকের নায়ক চারুদত্ত এবং দ্বিতীয় প্রধানচরিত্র শর্বিলকের মধ্যে তিনি যথাক্রমে হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় ছাঁচের জীবনাদর্শকে আবিষ্কার করেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব।

এইভাবে এই তিনটি সমালোচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-সমালোচক ভূদেবের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিস্তারিত আলোচনায় এই উক্তির যথার্থতা বিচার করা যাবে।

উত্তরচরিত

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব

উত্তরচরিতের প্রথম সার্থক আধুনিক সমালোচক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভূদেবের উত্তরচরিত সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনার উত্তর, একথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনাটিকে বিশেষভাবে বিচার করার প্রয়োজন আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র উত্তরচরিত নাটকটিরই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রাধান্য দিয়েছেন তৃতীয় অঙ্কটিকে। ভবভূতির কবিত্বশক্তি সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রথম অঙ্ক আলেখ্যদর্শন এবং তৃতীয় অঙ্ক ছায়ায় তার পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তৃতীয় অঙ্কে তা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে—'কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।' তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভবভূতির চরিত্র-সৃজনক্ষমতাও প্রশংসনীয়। বাসন্তী, চন্দ্রকেতু, লব, তমসা, মুরলা, গঙ্গা, পৃথিবী সার্থক সৃষ্টি। ভবভূতির আরেকটি ক্ষমতাও অপরিসীম। যখন যে রস উদ্‌ভাবনের ইচ্ছা করেছেন তখনই তার চরম দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'তাঁহার লেখনীমুখে স্নেহ উছলিতে থাকে, শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে ... কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। ...রসোদ্‌ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটিমাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত।' (পৃ.১৮৫)। সবশেষে ভবভূতির ভাষাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'সে ভাষা অতি চমৎকারিণী', কিন্তু এতো প্রশংসা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির সামগ্রিক সৃষ্টিক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা করতে পারেননি। তাঁর মতে 'উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেকদূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার

সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্রসৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোনো নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতিমাত্র। রামের চরিত্র রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে। ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতকদূর পাইয়াছেন।' (পৃ.১৮৪)। এই প্রসঙ্গে 'আলেখ্যদর্শনে' রামচরিত্রের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। 'তাঁহার (রামচন্দ্রের) চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন তাহাই ইহার উদাহরণস্থল।' (পৃ. ১৬৪)।

তৃতীয় অঙ্কের কাব্যত্বের প্রশংসা করলেও নাটকের সামগ্রিক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র এই অঙ্কটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। বাল্মীকির রামায়ণে সীতা-বিসর্জনের পরে রামসীতার পুনর্মিলন হয়নি। কিন্তু ভবভূতির নাটকে রামসীতার পুনর্মিলন ঘটেছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রামসীতার পুনর্মিলন তাহার সঙ্গে ইহার কোনো সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোনো হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোনো অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য ও পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনা কৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে'। (পৃঃ ১৭৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুটি উক্তি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ভবভূতির এই নাটকটির মূল বিষয় কি? একদিকে রামসীতার অতুল্যপ্রেম —দুঃখ দুর্বিপাক সুদীর্ঘ বিচ্ছেদেও যা দুর্বল হয় না, অন্যদিকে লোকাপবাদ। এই লোকাপবাদ যেমনি কঠোর তেমনি অনতিক্রম্য। এই দু-এর সংঘর্ষই এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। নাটকটির সর্বত্র এই লোকমতের দুর্বার শক্তি অনুভূত হয়েছে। সীতাবিসর্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিন্দা করেছেন অনেকে, কিন্তু লোকমত অগ্রাহ্য করে সীতাকে ত্যাগ না করাই যে তাঁর পক্ষে উচিত হতো একথাও কেউ জোর করে বলতে পারেননি। সমস্ত তৃতীয়াঙ্ক জুড়ে সেই দুর্নিবার লোকশক্তির কাছে

অনির্বাণ প্রেমের পরাজয়ের বেদনাই রামচন্দ্রের আকুল কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে। মানবজীবনাভিজ্ঞ কবি ভবভূতি দাম্পত্য-প্রেমেরও শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁর সেই সৃষ্টিশক্তিরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৃতীয়াঙ্কের রামচন্দ্র—যিনি মহাকাব্যের বীরনায়ক নন —যিনি নাটকের এক কোমল-হৃদয় মানুষ, যিনি প্রেমিক স্বামী। যে পঞ্চবটী বনে তিনি একদিন সীতার সঙ্গে আনন্দময় দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন সেই বনের পশুপাখী, গাছপালা, সীতার লালিত করীশাবক, তাঁদের বিশ্রম্ভালাপের স্মৃতিপূত শিলাতল, লতাকুঞ্জ, সেই গোদাবরী আর সীতার প্রিয়সখী বাসন্তী এইসব মিলে সুদীর্ঘ বারো বছরের পুঞ্জীভূত বেদনার রুদ্ধদ্বার খুলে দিল। এখানে রাজসভা নেই, সভাসদ নেই, প্রজাবৃন্দ নেই। এখানে একদিকে প্রেমের সহস্র-স্মৃতি আর একদিকে বিরহী প্রেমিক। এমন অবস্থায় এমন পরিবেশে যা মানায় তা কান্না। তাই তৃতীয়াঙ্কে রামচন্দ্রের কান্না তাঁর চরিত্রকে মহিমাচ্যুত করেনি, বরং তাকে মানবিকরসে সিঞ্চিত করেছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র মন্তব্যকে মেনে নেওয়া সহজ নয়। ভূদেব সুদীর্ঘ আলোচনায় রামচন্দ্র ও ছায়াসীতার প্রতিটি আচরণ ও উক্তিকে বিশ্লেষণ করে এই মানবিকরসকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় বক্তব্য, সমগ্র নাটকটির পক্ষে তৃতীয়াঙ্ক অপরিহার্য নয়। ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যেরও সরস উত্তর দিয়েছেন। প্রথমত তিনি সমস্ত ঘটনা এবং সংলাপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ছায়াসীতা মোহগ্রস্ত রামের ভ্রম মাত্র। রামের নিজের উক্তিতেই তার প্রমাণ আছে—'অথবা কুতঃ প্রিয়তমা। নূনং সঙ্কল্পাভ্যাস পাটবোৎপাদ এষ রামভদ্রস্য ভ্রমঃ।' 'অথবা কোথায় প্রিয়তমা? ইহা রামের কল্পনাভ্যাস পটুতাজনিত ভ্রম।' এ প্রসঙ্গে ভূদেব লিখেছেন—'মৃত-বন্ধুক ব্যক্তিরা যে সময়ে সময়ে বিশেষত স্বপ্নাবস্থায় আপনাদিগের হৃদয়মধ্যেই সেই সেই বন্ধুর ইঙ্গিত পরামর্শাদি গ্রহণে কৃতার্থমন্য হইয়া থাকেন, ছায়াময়ী সীতা রামের প্রেমময় হৃদয়ের সেই অবস্থার পরিচায়ক'। (পৃঃ ৩৮)। কারণ ছায়া-ময়ীর ও রামের পঞ্চবটী প্রবেশ, তথায় অবস্থান এবং সেখান থেকে যাওয়া একই সময়ে ঘটেছিল। ভূদেব রাম সীতা এবং তমসা ও বাসন্তীর প্রতিটি উক্তি প্রত্যুক্তি এবং আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তার সবই রামচন্দ্রের মনোগত-ভাবের প্রকাশ মাত্র। ভূদেব তৃতীয়াঙ্ককে তাই রূপক বলে নির্দেশিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন—'তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যেই নিষ্পন্ন, এবং তৃতীয়াঙ্কের উক্তি প্রত্যুক্তি সকল এক রাম হৃদয়েরই বিলোড়নস্বরূপ এমন ভাবে

আভাসিত। সুতরাং সমুদয় তৃতীয়াঙ্কটি রামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণনায় পর্যবসিত, এরূপ মনে করা অসংগত হইতেছে না।' (পৃ. ৩৮)।

এখন এই ছায়াসীতার অবতারণার নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি কি, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রেমময়ী সাধ্বী স্ত্রী অনুরাগের গাঢ়তার জন্যই স্বামীর প্রেমের পরিচয় পেতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রীর বিরহে স্বামীর প্রকৃত অবস্থা কি রকম হয়েছে এটি জানায় সাধ্বীর তৃপ্তি। তাই ছায়াসীতার অবতারণা। সীতাকে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করেছিলেন, সেকথা রামচন্দ্র সীতাকে জানাননি। এক্ষেত্রে রামচন্দ্রের অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, সীতা-বিসর্জনের জন্য তাঁর আন্তরিক অনুতাপের এবং লোকলজ্জা নিবারক কোনো প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ছাড়া পরিত্যক্তা সীতা সামান্য মাত্র আত্মগৌরব থাকতে পরিত্যাগকারী স্বামীকে গ্রহণ করতে পারেন না। ভূদেব নারীহৃদয়ের এই দিকটি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'সাধ্বীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবলভাবেই বিরাজ করে। তাঁহারা যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জনে প্রবণা এবং আত্মবিলোপে সক্ষমা হউন, তাঁহাদিগের সাধ্বীতাটিই জ্বলন্ত হুতাশনস্বরূপ। জগতীতলে সাধ্বীপ্রতিমা সীতাও সুতরাং একটি অগ্নিশিখা।' (পৃঃ ৪১)। স্বর্ণসীতা প্রসঙ্গে সীতার উক্তিতে এই আত্মগৌরববোধের কিভাবে চরম প্রকাশ ঘটেছে, ভূদেব তা বিশ্লেষণ করেছেন। সেজন্যে রামসীতার পুনর্মিলনের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে রামের দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখ আর অনুতাপ প্রকাশ করলেই চলবে না, সীতারও তা জানা চাই। তাই ছায়াময়ীর কল্পনা। ভূদেব বলেছেন—'রামসীতার পুনর্মিলন সম্বন্ধে ভবভূতি কোনো খুঁত রাখেন নাই। তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশোক বর্ণনাবসরে রামসীতার পুনর্মিলনের পথ সম্যক্‌রূপেই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।' (পৃঃ ৬১)। তাই সপ্তম অঙ্কে মূর্ছিত রামচন্দ্রের চেতনা সম্পাদনে অরুন্ধতীর অনুরোধে সীতা রামচন্দ্রকে গিয়ে যখন স্পর্শ করে বললেন—'সমসসসদু অজ্‌জউত্তো' 'আর্যপুত্র সমাশ্বস্ত হও' তখন তা—কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হলো না। 'কিন্তু যদি তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত রামের বিলাপাদি পূর্বে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ কথা এবং ঐ কার্যটি বড়োই বিসদৃশ বোধ হইত।' (পৃ. ৪৪)।

'অতএব ভবভূতির পক্ষে সীতাকে গতপ্রাণবস্তুবৎ করিয়া রামের বিরহদুঃখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল।' (পৃঃ ৪৪)।

বিশেষ করে উত্তরচরিত নাটক। তাই কিভাবে বর্ণনা করলে রামের প্রতি

দর্শকের বিরূপতা দূর হবে এবং সীতাও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে রামের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবেন ভবভূতি তার সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এই তৃতীয় অঙ্কেই। দাম্পত্যমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার ভবভূতির সৃষ্টি এই 'ছায়া' নামাঙ্কিত তৃতীয় অঙ্কটি তাই সমগ্র নাটকের পক্ষে অপরিহার্য। শুধুমাত্র কবিত্বগুণই এর একমাত্র গুণ নয়।

উত্তরচরিত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সৌন্দর্যসৃষ্টিই সেই উদ্দেশ্য। সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি-ক্ষমতার মানদণ্ডেই তিনি ভবভূতির রচনার মূল্যায়ন করেছেন। ভূদেব এদিক দিয়ে বিচার করেননি। ভবভূতি কি উদ্দেশ্যে বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ না করে নাটকে রামসীতার পুনর্মিলন ঘটিয়েছিলেন—ভূদেব তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাল্মীকির আশ্রমে অভিনয়ের সময় সীতা-বিসর্জন দৃশ্যের নির্মমতা সহ্য করতে বলছেন তাঁর ঐ 'পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব' উক্তি রামায়ণ পাঠকসাধারণের হৃদ্গত শোকের পরিচায়ক। তিনি বলছেন 'রামায়ণ পাঠকের মনে এই ভাব উদয় হয় যে সীতার ন্যায় গৃহিণী এবং রামের ন্যায় গৃহীর সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে সংসার-সুখের বাসনা আর কে করিবে? সুতরাং তাহাদের মতে রামায়ণের নির্বহনকার্য অন্যরূপ হইলে ভালো হইত। ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এইজন্যই তিনি বাল্মীকির হইয়া রামসীতার পুনর্মিলন সাধনপূর্বক সেই শোক নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন।' (পৃ. ৪০)।

এই বিচার ভূদেবের সহৃদয় হৃদয়ের সংবাদই প্রকাশ করে। সমগ্র নাটকটির আলোচনায় ভূদেবের যে মনটি প্রকাশ পেয়েছে তা যেমন সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, তেমনই মানবহৃদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গের উত্থানপতন সম্পর্কে সচেতন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যেমন শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব নাটকের আলোচনায় কালিদাসের দৃষ্টিতে দাম্পত্যজীবনের আদর্শচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে, আসলে নিজেরই সৃষ্টি-শক্তির ও আশ্চর্য সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, ভূদেবও তেমনি ভবভূতির মানব-চিত্তাভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নিজেরই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় রেখেছেন। দাম্পত্যজীবনের নানা ভাবলহরী, তার সূক্ষ্ম অনুভূতির নানা রূপ সম্পর্কে ভূদেব বিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র নানা প্রবন্ধেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তাঁর সেই রসোপলব্ধির সূক্ষ্ম চারুতা আমাদের মুগ্ধ করে। সহানুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব

এইসব ভাব কেমন করে রামসীতার পারস্পরিক প্রেমকে উন্মোচিত করে নাটককে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিল, ভূদেব তার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা অতুলনীয়। সাহিত্যরসিক ভূদেবের এই দুর্লভ প্রকাশ প্রবন্ধটিকে একটি নূতন মূল্য দিয়েছে।

[বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমালোচনার উদ্ধৃতি যোগেশচন্দ্র বাগল-সম্পাদিত 'বঙ্কিমরচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড' থেকে সংকলিত]

রত্নাবলী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে আধুনিক সমালোচনার একটি প্রধান লক্ষণ সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা। এতে একটি অখণ্ড রসোপলব্ধি পাঠকের মনকে ভরে তোলে। রসোপলব্ধির সেই অখণ্ডতা ভূদেবের প্রথম দুটি সমালোচনা উত্তরচরিত ও রত্নাবলীকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। দুটি নাটকেই পাত্রপাত্রীরা রাজার ঘরের। দুটি নাটকেই দাম্পত্যজীবনের চিত্র রূপায়িত। কিন্তু সে জীবন এক নয়। উত্তরচরিতে দাম্পত্যপ্রেমের একনিষ্ঠতা এবং গভীরতা আর রত্নাবলীতে তার একান্ত অভাব। উত্তরচরিতে দ্বাদশ-বৎসরের বিচ্ছেদেও সে প্রেম অনির্বাণ শিখায় প্রোজ্জ্বল আর রত্নাবলীতে নিত্যমিলনের মধ্যেও নায়কের মনে অন্য কোনো বিরহিণীর প্রণয়াস্পদ হবার আকাঙ্ক্ষা। যদিও রত্নাবলী সমালোচনার শেষে সমালোচক উদয়নের একাধিক পত্নী গ্রহণের পক্ষে শাস্ত্র থেকে সমর্থন খুঁজেছেন, তবুও দাম্পত্যজীবনের রহস্যকে অনুভব করবার মতো স্পর্শসচেতনতা যে তাঁর ছিল, তা পাঠকের মুগ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। উত্তরচরিতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু রত্নাবলীতে নাটকের দোষগুণেরও বিচার আছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব' অধ্যায়ে উত্তরচরিতের এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে রত্নাবলীর বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

'রত্নাবলী' আলোচনায় ভূদেব প্রথমেই 'নান্দী' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে নান্দী রচনায় শ্রীহর্ষ অতুলনীয়। বলেছেন– 'নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদয় গ্রন্থের আভাস প্রদান-পূর্বক নান্দীর সার্থকতা সম্পাদন, একমাত্র কবি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন। এবং তাঁহার দুইখানি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্তীকালে প্রণীত রত্নাবলীতে ঐ বিষয়ে অভূতপূর্ব নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন।'[৬] রত্নাবলীর প্রস্তাবনাও যে সার্থক তারও সুন্দর আলোচনা করেছেন। রত্নাবলীতে স্থান কাল আর নাট্যক্রিয়ার ঐক্য আবিষ্কার ভূদেবের গ্রীক নাটকবিচারের আদর্শ সম্পর্কে

সচেতনতার পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলা কিংবা ভবভূতির উত্তররামচরিতের রচনায় যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় ভূদেব তারও উল্লেখ করেছেন।[৭] রত্নাবলী-প্রসঙ্গে তাই তিনি লিখেছেন 'রত্নাবলীয় তদীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যাপার সমস্তের সংঘটকাল এবং সংঘটনস্থান একোত্তমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের উপযোগী হয় এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। রত্নাবলী নাটিকার চারিঅঙ্কে বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্যপরম্পরা একদিবসের সন্ধ্যাব প্রাক্কাল হইতে পরদিবসের রাত্রিশেষেব মধ্যে সম্পন্ন এমন মনে করা যাইতে পারে, এবং সেই ঘটনাবলীর স্থান উক্ত নাটিকার নায়ক রাজা উদয়নের বাটী এবং তাঁহার প্রমোদোদ্যান মাত্র। অভিনেয় বস্তুব সহিত অভিনয়ের এরূপ সন্নিহিত সংগতিরক্ষা আর কোনো সংস্কৃত নাটকেব রচনায় দৃষ্ট হয় না। আবার অভিনীত বস্তুর স্বাভাবিকতাও রত্নাবলীতে দেখা যায়। বত্নাবলীর অভিনযদর্শক যে প্রকৃত ব্যাপাবই দর্শন করিতেছেন, এই ভ্রমের সুখস্বাদ তাঁহার আরো একটি কারণে লব্ধ হইতে পাবে। বত্নাবলীর ঘটনাবলী বাজা রাজডার ঘরে যেরূপ উপকরণ লইয়া যেরূপভাবে সচরাচর সংঘটিত হয় বা হইতে পারে শুনা যায়, সেইরূপেই সম্পাদিত।'[৮] দেশকাল পাত্র এবং নাট্যক্রিয়ায় ঐক্য ছাড়াও আর একটি গুণে রত্নাবলী মণ্ডিত। নাটক মুখ্যত অভিনয়ে দেখবার—আলংকারিকের ভাষায় দৃশ্যকাব্য, শ্রব্যকাব্য নয়। তাই পাত্রপাত্রীগণের কার্যই নাটকে মুখ্য, তাদের সংলাপ নয়। ভূদেব একথার উল্লেখ কবে পরে বলছেন—'কার্যগুলি দেখা যায় এবং যাহা দেখা যায় মানসচিত্রে তাহাব অঙ্কন যেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় যাহা কানে শুনা বা মনে মনে অনুমানমাত্র করা যায় তাহার বোধ সেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। ফলতঃ উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টিলভ্য কার্যপরম্পরাই নাটক বা দৃশ্যকাব্যের জীবনস্বরূপ। সেই জীবন রত্নাবলী নাটিকায় যেরূপ নিপুণতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অপর কোনো সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় নাই।···বস্তুত আমাদিগের বিবেচনায় নাট্যাংশে রত্নাবলীর তুল্য নাটক সংস্কৃতে দ্বিতীয় নাই।'[৯] ভূদেবের এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

রত্নাবলী নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্যও ভূদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তা হলো বাসবদত্তার চরিত্র। সব নাটকেই যেমন দেখা যায় নায়িকা কোমলা সরলা দুর্বলা মুগ্ধা, বাসবদত্তা তেমন নয়। তাঁর মধ্যে আত্মদমন, উপেক্ষা এবং গাম্ভীর্য প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্য ভূদেবের মতে এই বৈশিষ্ট্য রত্নাবলী নাটকের মূল কথাসরিৎসাগরেই নিহিত। কিন্তু সে যাই হোক, এই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষণীয়।

রত্নাবলী সমালোচনায় ভূদেবের কবিমনের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে উত্তরচরিত, শকুন্তলা ও রত্নাবলীর একত্র আলোচনায়। ভূদেবের মতে সমজাতীয় বস্তু ছাড়া তুলনা চলে না। এ তিনটি নাটকেও চলে না। তাঁর মতে তিনটি তিন বিষয়ে প্রধান: 'উত্তরচরিত গাম্ভীর্যে, শকুন্তলা বৈচিত্র্যে এবং রত্নাবলী পারিপাট্যে।'[১০] ফুলের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন 'একটি পদ্ম, একটি গোলাপ এবং একটি নবমল্লিকা। পদ্মটি গভীর সরসীর নির্মল জলে অধিষ্ঠান করে, আপনার স্বচ্ছকান্তির ছায়ায়, আপনি হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে এবং জগদ্বিধাত্রী ভগবতী চরণে সর্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পায়। গোলাপটি রাজোদ্যানে মধ্যস্থলে বিরাজ করে। বাগরঙ্গনে সকলের নয়নাকর্ষী হয়, ফুলের তোড়ার সর্বোপরি ভাগে উঠে এবং বিলাসভবনে সমাদরে পরিগৃহীত হয়। নবমল্লিকাটির স্থান বিভবশালীর আরাম, নায়কনায়িকার নিভৃত পর্যটনের অবসরই ইহার ফুটিবার সময়, এ অন্যের অনুবর্তী এবং ইহার মালা কামিনীর কবরীবন্ধনে অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এ তিনটি কুসুমের মধ্যে একটি পূজার একটি আমোদের এবং একটি আদরের সামগ্রী। প্রথমটিকে লইয়া নির্জনে বসিলে তাহার মৃদুল অন্তরপ্রসারী সৌরভে জীবাত্মা প্রসিক্ত হয়, দ্বিতীয়টির দিগন্তব্যাপী সৌরভ স্ববন্ধুবান্ধব উল্লাসপূর্ণ হওয়া যায়, তৃতীয়টিকে সঙ্গে করিয়া বিশেষ দুইজনে না বসিলে উহার সুস্নিগ্ধ আমোদের সম্যক্‌ উপলব্ধি হয় না। সহৃদয়পাঠক ইহা অবশ্যই বোঝেন যে প্রকৃতরূপে উত্তরচরিতের রসগ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে সুগভীর চিন্তায় অবগাহন করিয়া যাইতে হয়, শকুন্তলার রসগ্রহণ পাঠকমাত্রেরই সহজে হইয়া থাকে, এবং রত্নাবলীর রসে আপ্লুত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা পাঠ করিয়া নিজ প্রিয়তমাকে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিনখানি গ্রন্থই তিন প্রকার, তিনটিই স্বতন্ত্ররূপে নিজগুণে প্রশংসনীয়।'[১১]

রত্নাবলীতে নাট্যকারের পরিমিতিবোধ ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় সাগরিকার বিরহবর্ণনা এবং নায়কের সেই বিরহের পরিচয়লাভের ঘটনায়। শকুন্তলা নাটকে বিরহিণী শকুন্তলার পদ্মপত্রে শয়ন দুষ্মন্ত আড়াল থেকে দেখেছিলেন। ভূদেবের মতে এতে রুচির সূক্ষ্মতা রক্ষিত হয়নি। অপরপক্ষে রত্নাবলীতে কদলী-গৃহে সাগরিকার পদ্মপত্রে শয়নের চিহ্ন এবং তাঁর অঙ্কিত উদয়নের চিত্র দেখে রাজার মনে প্রেমের জাগরণ হলো এবং বিদূষক বসন্তকের কাছে তাঁর সেই অনুরাগের প্রকাশ আড়াল থেকে সাগরিকা নিজে শুনলেন। শকুন্তলার মতো

সহজেই তিনি নিজেকে ধরা দেননি। ভূদেব এই বর্ণনাকে নাট্যকারের সুরুচির পরিচায়ক বলে মনে করেছেন।

রত্নাবলীতে ভূদেবের রসোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উদয়নের মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। শারিকার মুখে সাগরিকার মনোব্যথার কথা শুনে উদয়ন যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর অন্তরে অন্য প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়েছে। তারপর নানা আচরণে কেমন করে তা সার্থক হলো সে বিশ্লেষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

তবে সমালোচনার শেষে ভূদেব যেভাবে শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে উদয়ন বাসবদত্তা এবং রত্নাবতীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে উদয়নের একাধিক পত্নীকতার পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাতে ভূদেবের বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতও বটে। কিন্তু এতে সহৃদয় রসিকের উজ্জ্বল সত্তাটি একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। উত্তরচরিতকে যেমন বিশুদ্ধ রসালোচনা বলা যেতে পারে, রত্নাবলীকে ঠিক সেভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবে সামগ্রিক বিচারে রত্নাবলীতে সমালোচক ভূদেবের একটি সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃচ্ছকটিক

উত্তরচরিত ও রত্নাবলীর সমালোচনায় ভূদেবের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় মৃচ্ছকটিকে তা অনুপস্থিত। তাঁর বিচারশক্তির সূক্ষ্মতা ও বিশ্লেষণশক্তির প্রাঞ্জলতা মৃচ্ছকটিকে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানে কাব্যের রসাস্বাদন বড়ো হয়ে ওঠেনি, সমাজজীবন ও চরিত্রের প্রতিফলন নাটকে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—সমালোচক তার বিচারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যুগধর্ম এখানে সমালোচকের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। ভূদেবের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (৭ই মাঘ - ১১ই চৈত্র), ১৮৮৮ খ্রী (জানুয়ারি—মার্চ), এডুকেশন গেজেটে। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে ও মুখ্যত 'প্রচার' পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জীবনাদর্শের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভূদেবের এই প্রবন্ধটিতে যে তারই প্রভাব পড়েছিল, একথা মনে করা অসমীচীন নয়। ভূদেবের আরো দুটি প্রবন্ধ উত্তরচরিত ও রত্নাবলীর বিচাররীতির সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের বিচাররীতির পার্থক্য থেকে একথা অনুমান করা সহজ। ব্যক্তিগত জীবনে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুসারী হলেও ভূদেবের মধ্যে যে একটি রসপিপাসু কবিমন ছিল প্রথম দুটি সমালোচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু তৃতীয়টিতে সেই কবিমনটিকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এখানে সাহিত্যের রসাস্বাদন নয়, আর্যহিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

ভূদেবের মতে সংস্কৃতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক। শূদ্রক কোন সময়ে কোথায় রাজত্ব করতেন, সেকথা জানা যায় না। ভূদেবও শূদ্রকের রাজত্বের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি। এ বিষয়ে য়ুরোপীয়দের অভিমতকে তিনি অস্বীকার করেছেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—

'যিনিই যাহা বলুন মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্পদিনের বস্তু নয়। উহা রামায়ণ ও মহাভারতের পরবর্তী তো বটেই, রাজা চন্দ্রগুপ্তেরও কিছু পরবর্তী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনোরূপেই প্রমাণিত হয় না। তবে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে মৃচ্ছকটিকের আর্যকনামক পুরুষটি যীশু খ্রীস্টের ছায়া হইতে প্রাপ্ত। যদি ওরূপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত তাহা হইলে বিচার করা যাইত। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রন্থাদি প্রণয়নের কাল নির্ণয় বাহিরের সহিত মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরিক ঘটনামাত্র লইয়া তাহাদিগের পূর্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা গোলযোগ হয় না।'

ভূদেব বলছেন মৃচ্ছকটিক প্রাচীন বলেই তার রচনারীতি সরল। বিষয়টিই বড়ো, বর্ণনাকৌশল বড়ো নয়। তবে ভাষার পারিপাট্য না থাকলেও মৃচ্ছকটিক রচনাকৌশলশূন্য নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পের গুণই হলো তার শিল্পধর্মকে গোপন করা। মৃচ্ছকটিকের শিল্প এমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত যে শিল্পকৌশল আছে বলেই মনে হয় না।

ভূদেব এই শিল্পকৌশল ব্যাখ্যা করতে প্রথমে নাটকের নান্দীভাগের আলোচনা করেছেন। তারপর প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা করেছেন। রত্নাবলীর সমালোচনাতেও ভূদেব নান্দী ও প্রস্তাবনার আলোচনা করেছিলেন এবং নান্দী বিচারে রত্নাবলীর এবং প্রস্তাবনা রচনায় মুদ্রারাক্ষসের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছিলেন। নাটকের নান্দীতে তার মূলভাব এবং প্রস্তাবনায় সমগ্র নাটকের উপস্থাপ্য বিষয়ের আভাস সূচিত হয়। তাই প্রাচীন নাটকের কলাকৌশল বিচারে নান্দী ও প্রস্তাবনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৃচ্ছকটিকের নান্দীতে দুটি শ্লোক আছে। তার প্রথমটিতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্যঙ্কবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দৃঢ়ীকৃত, দ্বিতীয় শ্লোকে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্যামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জ্বল গৌর ভুজলতার

অবস্থান। প্রথম শ্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যাননিমগ্ন, সমাধিস্থ, জগৎশূন্য, সংসারশূন্য। দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎপূর্ণ সংসার জাজ্বল্যমান। ভূদেব বলছেন—'সমুদায় নাটকটিতেই ঐ দুই কথা। এককথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্বশূন্যত্ব, দ্বিতীয় কথা তাঁহার প্রেমিকা প্রেয়সী লাভ এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক সুখপ্রাপ্তি। অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটির বীজ নিহিত হইয়া আছে।' (পৃঃ ১১৪)।

প্রস্তাবনায় প্রারম্ভে আছে রচয়িতার আত্মপরিচয়। তাঁর নাম শূদ্রক, তিনি রাজা ও দ্বিজনখ্যাতম। ঋগ্বেদে এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ, তিনি শতবর্ষ এবং দশদিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্যদান পূর্বক চিতারোহণে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন (পৃঃ ১১৫)। ভূদেব বলছেন এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত। এরকম অনুমানের কারণ হিসাবে বলছেন, তৎকালীন সমাজবর্ণনার উদ্দেশে নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করেন। সমাজ বর্ণনাকারী লেখকগণ প্রায়ই নিজের নাম গোপন করে থাকেন। অতএব কোনো নাটকরচয়িতা সমাজের বৃহত্তম ভাগ যে শূদ্রজাতি তার নাম গ্রহণ করে আপনাকেই ক্ষত্রিয়গুণ এবং ব্রাহ্মণগুণ সমন্বিত এবং সমগ্র দেশের রাজা বলে বর্ণনা করে গেছেন। আর আয়ুষ্কাল একশত বৎসর দশদিন বলার অর্থ—সমালোচকের মতে —এক একটি সমাজ প্রতিরূপের বয়স একশত বৎসর ধরা হয় এবং দশদিন হলো অশৌচকাল। সেই একশত দশ দিনের পরে সমাজ প্রতিরূপ পূর্বগত সমাজ প্রতিরূপের পুত্ররূপ আবির্ভূত হয় (পৃঃ ১১৫)।' শূদ্রক নাম ও তার পরিচয় সম্পর্কে ভূদেবের বিশ্লেষণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

নাটকের বক্তব্য বিষয়টি বিশদীভূত হয়েছে প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্ধের একটি গানে। গানটির শেষ চরণ 'সবং শূন্যং দারিদ্রস্য' নায়ক চারুদত্তের জীবনে কিভাবে মিলে গেল নাট্যকার তার সার্থক রূপ অঙ্কন করেছেন। সমাজে দরিদ্ররাই সংখ্যায় বিপুল। সমাজচিত্রণে তাই দরিদ্রতার চিত্রণ আবশ্যিক। নাট্যকার তাই দরিদ্র চারুদত্তকে তার নাটকের নায়ক করেছেন।

চারুদত্ত দরিদ্র কিন্তু আদর্শ চরিত্র। সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, সুভদ্র, কর্তব্যপরায়ণ, সমাজসেবী, আত্মসুখবিমুখ, পরের মঙ্গলের জন্যই তাঁর এই দারিদ্র্যবরণ। দারিদ্র্যকে চারুদত্তের কোনো ভয় নেই। শুধু দুঃখ এই দরিদ্রের গৃহে অতিথি আসে না, সুহৃদজনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, দারিদ্র্য থেকে নানাবিধ দোষের জন্ম হয়, এই চিন্তাই চারুদত্তের দুঃখের কারণ। কিন্তু এত দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর পূজার্চনা

অব্যাহত আছে। বয়স্য মৈত্রেয় এ নিয়ে শ্লেষ করলে চারুদত্ত উত্তর দেন তপস্যা মন বাক্য ও বলিদ্বারা দেবপূজা গৃহস্থের নিত্যবিধি।

ভূদেবের মতে এখানেই মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত আর্য প্রকৃত হিন্দু। পৃথিবীর অপর সকল জাতি ধর্মচর্যা করে ফললাভের আশায়। কেবল 'হিন্দু বিনা ফলাভিসন্ধিতেই ধর্মাচরণে শিক্ষিত। তিনি বিধি পালনেরই কর্তব্যতা জানেন।' (পৃঃ ১২২)। ভূদেব চারুদত্ত চরিত্রের এই আর্যত্ব আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র শর্বিলকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়। দুজনেই বহুগুণান্বিত কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কিন্তু দুজনের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। শর্বিলক প্রত্যুৎপন্নমতি পুরুষসিংহ। ইনি রাজার কারাগৃহ থেকে ভাবী নৃপতিকে মুক্ত করে আনেন, ইনি রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনি পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। কিন্তু ভূদেবের দৃষ্টিতে শর্বিলকের স্থান চারুদত্তের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ দুর্বিষহ দুঃখ এবং কঠিন বিপদের মধ্যে পড়েও চারুদত্ত কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় নেননি বা ধর্মাচরণে বিরত হন নি। কিন্তু শর্বিলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে কোনো পথ অবলম্বনে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। ভূদেবের মতে তিনি ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্বিলক রাজসিক পুরুষ। শর্বিলকের শৌর্য আত্মগৌরব-মূলক রজোগুণসম্ভূত। কিন্তু চারুদত্তের শৌর্য সত্ত্বগুণপ্রধান, তার মূলে যশোলিপ্সা, আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা নেই—আছে বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞান। চারুদত্তের চরিত্রটিই সেই শৌর্যের প্রতীক। ভূদেব অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করে এই চারিত্রিক শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিপৎকালেও মিথ্যা বলেন না, শরণাগতকে ত্যাগ করেন না, এমন কি যার মিথ্যা ষড়যন্ত্রে বসন্তসেনা হত্যার অপরাধে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, মুক্তিলাভের পরে সেই ব্যক্তিকেই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করেন। ভূদেব বলছেন—

'আর্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্মপ্রভাবে বিশ্বাস এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এই সাত্ত্বিক বীরতা। এই বীরতার প্রকৃতি আর কোনো জাতি এমত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।' (পৃঃ ১৩৭)।

শুধু তাই নয়, ভূদেব মৃচ্ছকটিক নাটকে ভারতীয় জীবনের সাত্ত্বিক ইতিহাসের লক্ষণও আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে ইউরোপীয়রা রজোগুণপ্রধান, কামক্রোধের একান্ত বশীভূত, পরধর্মদ্বেষী, যুদ্ধবীরই তাদের কাছে বীর। কিন্তু ভারতীয়েরা

ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার গুণে রিপুদমনে সমর্থ, মতবিরোধ ঘটলে মারামারি, কাটাকাটি, পরপীড়ন বা নির্যাতন ঘটে না। ইংরেজীশিক্ষিত নব্যেরা যে মনে করেন সনাতন হিন্দুরা বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেছিলেন—মঠ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন ভূদেবের মতে এ ধারণা সত্য নয়। মৃচ্ছকটিকে প্রমাণ আছে হিন্দু এবং বৌদ্ধরা পরস্পর অবিরোধেই বাস করতেন। ভূদেব বলেন 'সর্বেশ্বর মতবাদ হইতে পরধর্মবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উত্থিত হয় না। ভারতবর্ষে জালুস্বভাব এবং একেশ্বরবাদী মুসলমানেরাই আসিয়া ধর্মবিদ্বেষের আগুন ক্রমে ছড়াইয়া দেয়। তাহারাই মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নির্মাণ করে এবং তাহাদেরই দেখাদেখি শিখেরা যখন প্রবল হইয়াছিল তখন কোথাও কোথাও মসজিদ ভাঙিয়া মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিল।' (পৃঃ ১৩৯)।

এই অভিমত 'সামাজিক প্রবন্ধের' রচয়িতা ভূদেবের ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচায়ক।

বসন্তসেনার রূপ ও জীবিকার মধ্যেও ভূদেব সেযুগের সামাজিক চিত্রটি তুলে ধরেছেন। বসন্তসেনা রূপোপজীবিনী হলেও চারুদত্তে সমর্পিতপ্রাণা এবং মাতৃ ব্যবসায়ে অনিচ্ছাবতী। তাই মাতাকর্তৃক পুরুষান্তরগ্রহণে আদিষ্ট হলে বলেন— 'জই মং জীঅংতীং ইচ্ছসি তা এব্বং ন পুণেব অহং অজ্জাও অণবি দন্তা' (অর্থাৎ 'যদি আমাকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে মাতাকর্তৃক যেন আর এরূপ অনুজ্ঞাতা না হই।'

এ হেন নায়িকা নিশ্চয় সাধারণ রমণী নন। ভূদেব বলছেন সেযুগের সমাজে রূপোপজীবিকা একটা বৃত্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং রূপোপজীবিনীরা নানা বিদ্যা-পটীয়সী, শিক্ষিতা এবং মাননীয়া ছিলেন। বসন্তসেনার রূপের বর্ণনায় বোঝা যায় তিনি নিম্ননাসা এবং কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। সুতরাং তিনি অনার্যবংশীয়া ছিলেন। সেযুগে রূপোপজীবিনীরা সাধারণত অনার্যই হতেন।

সাহিত্য সমাজজীবনের মায়াদর্পণ। সেই মায়াদর্পণে ভূদেব তৎকালীন জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব দেখেছেন। অবশ্য ভূদেবের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উত্তর-চরিতের সমালোচনায় বাল্মীকির রামের সঙ্গে ভবভূতির রামের তুলনাকালে রাম-চরিত্রে সেযুগের জীবনধারার প্রভাবের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাকে এমন বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে ভূদেবের রচনার তুলনায় 'সমালোচনা সাহিত্যে'র সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —ভূদেবের আলোচনা বঙ্কিমের মতো সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও মননশীলতাপ্রধান নয়।

তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য গভীর অনুপ্রবেশে নয় ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতায়। তাঁর এই অভিমত সর্বথা সমর্থনযোগ্য নয়। উত্তরচরিত ও রত্নাবলীর সমালোচনায় ভূদেবের সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করে তিনি নাটক দুটির মর্মকথা ব্যাখ্যা করেছেন। আর মৃচ্ছকটিকেও তিনি নাটকের গভীরেই প্রবেশ করেছেন। সমালোচনার সূচনাতেই শূদ্রকের উক্তি উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজরূপের চিত্রণই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। ভূদেব সেই সমাজরূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের চরিত্রের মধ্যে 'আর্য হিন্দু' এবং 'ইউরোপীয় আর্যে'র স্বরূপ সন্ধান করেছেন। সেই সঙ্গে আরো একটি উদ্দেশ্যকেও তিনি সিদ্ধ করেছেন। সামাজিকগণকে ব্যবহার-জ্ঞান ও অশিববিনাশে প্রেরণা দান করাও যে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, ভূদেব সেই উদ্দেশ্যের প্রতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারত-ধর্মের তথা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও নবীকরণের যে চেষ্টা তখন চলেছিল এখানে ভূদেবের সাহিত্য-বিচারের সেই বৈশিষ্ট্যটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি ভারত-সাহিত্যে ভারত-ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন। তাই মৃচ্ছকটিকের সমালোচনা সাহিত্যগুণের বিচার না হয়েও সাহিত্যবিচারের আর একটি নতুন মানদণ্ড রচনা করেছে।

বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ

ভূদেবের মৃত্যুর পরে ১৩১১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিভিন্ন সময়ে ভূদেব নানাবিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখতেন তারই কিছু কিছু বেছে নিয়ে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হয়। এর বেশিরভাগ প্রবন্ধ শিক্ষাদর্পণ ও এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগের 'গ্রন্থের আভাস'-এ বলা হয়েছে :

(১) পুরাবৃত্তসারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা গেল।

(২) সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্বে সমাজসম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই। উহা তাঁহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষয়ে মিল আছে বটে কিন্তু কোনো কোনো বিষয় একটু বিশদভাবে বর্ণিত থাকায় সেই প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

(৩) তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময় টুকিয়া

রাখিয়াছিলেন মাত্র ; সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই ; অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সভক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল।

গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে পুরাবৃত্তের কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজের কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে তন্ত্রের কথা। গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করলেও চলে। শুধু তৃতীয় অধ্যায়টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে তিনি তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উল্লেখপঞ্জী

ক সামাজিক প্রবন্ধ

১. ভূদেব চরিত ৩য় ভাগ, পৃ ৩৪৭
২ 'পারিবারিক প্রবন্ধই আমাকে সামাজিক প্রবন্ধগুলির বিবরণে প্রবৃত্ত করিতেছে।' ভূদেব চরিত, ২য় ভাগ, পৃ ৮৪
৩. প্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত ভূদেব রচনাসম্ভার (২য় সংস্করণ) পৃ. ৪০
৪ তদেব পৃ. ৪০
৫. তদেব পৃ ১৪
৬ তদেব পৃ. ৪২২
৭. তদেব পৃ. ৪২২
৮. তদেব পৃ. ৩৫২
৯. তদেব পৃ. ১৫
১০. তদেব পৃ. ১১-১২
১১. তদেব পৃ ১৫৫
১২. তদেব পৃ. ১৫৫
১৩. তদেব পৃ. ১৫৬
১৪. তদেব পৃ. ১৫৭
১৫. তদেব পৃ. ১৫৮
১৬. তদেব পৃ: ১৫৯
১৭. তদেব পৃ. ১৫৯
১৮. তদেব পৃ. ১৬০
১৯. তদেব পৃ. ১৬০
২০. তদেব পৃ. ৬৩
২১. তদেব পৃ. ৬৯
২২. তদেব পৃ. ৬৯-৭০
২৩. তদেব পৃ. ৭
২৪. তদেব পৃ ৬৩
২৫. তদেব পৃ. ৭৩
২৬. তদেব পৃ. ৭৩
২৭. তদেব পৃ ২২৭
২৮. তদেব পৃ. ২৩২-৩৩
২৯. তদেব পৃ ১৩৫
৩০. তদেব পৃ. ১৩৯
৩১. তদেব পৃ. ১৪৪

৩২. তদেব পৃ. ১৪৪
৩৩. তদেব পৃ. ১৪৪
৩৪. তদেব পৃ. ১৪৭
৩৫. তদেব পৃ. ১৪৯
৩৬. তদেব পৃ. ১৮০
৩৭. তদেব পৃ. ১৮৬
৩৮ তদেব পৃ. ১৯২
৩৯ তদেব পৃ ১৯৩
৪০. তদেব পৃ. ১৯৩-৯৪
৪১. তদেব পৃ. ২০২
৪২. তদেব পৃ ২১১
৪৩. তদেব পৃ. ২২৩
৪৪. তদেব পৃ. ২২৪
৪৫. তদেব পৃ. ২২৫
৪৬. তদেব পৃ ২২৬
৪৭. তদেব পৃ. ৬৫
৪৮. তদেব পৃ. ৬৩
৪৯. তদেব পৃ. ৬৫
৫০. তদেব পৃ ২৩০
৫১. তদেব পৃ. ২২৯
৫২. তদেব পৃ. ২৩১
৫৩. তদেব পৃ. ২৩২
৫৪. তদেব পৃ. ২৩৩
৫৫. তদেব পৃ. ২৩৭
৫৬. তদেব পৃ. ২৪৭
৫৭. তদেব পৃ. ২৪৭
৫৮. তদেব পৃ. ২৪৮
৫৯. তদেব পৃ. ২৪৯
৬০. তদেব পৃ. ২৫৩
৬১. তদেব পৃ. ২৫৬
৬২. তদেব পৃ. ২৫৩
৬৩. তদেব পৃ. ২৫৩
৬৪. তদেব পৃ. ২৫৩-৫৪
৬৫. তদেব পৃ. ২৫৪
৬৬. তদেব পৃ. ২৫৫

৬৭. তদেব পৃ. ২৫৩

৬৮. তদেব পৃ. ২৬০

৬৯. তদেব পৃ. ২৫৭

৭০ তদেব পৃ. ২৫৮

৭১. তদেব পৃ. ২৬১

৭২. তদেব পৃ. ২৬১

৭৩. তদেব পৃ. ২৬১

৭৪. তদেব, পৃ, ২৬২

খ. পারিবারিক প্রবন্ধ (দ্বাদশ সংস্করণ)

১. পারিবারিক প্রবন্ধ, সূচনা পৃ ।০

২ ভূদেব চরিত – ২, পৃ ৮৩-৮৪

৩. পারিবারিক প্রবন্ধ. পৃ ২০৪

৪. তদেব পৃ ৭৩

৫. তদেব পৃ ৩২ ৩৩

গ. আচার প্রবন্ধ (পঞ্চম সংস্করণ)

১. উৎসর্গপত্র—পৌত্র ও দৌহিত্রগণের উদ্দেশে।

২. প্রকরণের উপসংহার—৮ম পরিচ্ছেদ পৃ. ১১৬

৩. তদেব পৃ. ১১৮

৪, শ্রাদ্ধকৃত্যের উপসংহার পৃ. ১৯৫

ঘ. বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ

১. "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব।" 'ভারতীয় ভাষায় লিখিত সর্ব-প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। নিবন্ধটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীটন (Bethune Society) সোসাইটিতে পঠিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দুইশত কপি মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতারিত হইয়াছিল। এই বইটিতে বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা পাইলাম।'

—বাংলা সাহিত্যে গদ্য। সুকুমার সেন। পৃ ৬৪

২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (১৮৫১ খ্রী) পুস্তক সমালোচনা শুরু হয়। ১৭৭৪ শকাব্দ থেকে শুরু করে ১৭৮১ শকাব্দ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

৩. বঙ্গদর্শন, ১২৭৯, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

৪. 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ গ্রন্থের 'নামপত্র'। ভূদেবের মৃত্যুর পরে ১৩০২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

৫. 'উত্তরচরিত' 'প্রবন্ধের সূচনা।' 'অনেকদিন হইল বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় মহাকবি

ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা তাহাই অবলম্বস্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিমতি প্রকাশ করিব।' —বিবিধ প্রবন্ধ 'উত্তর চরিত'– পৃ ১

৬.	বিবিধ প্রবন্ধ	রত্নাবলী	পৃ ৭৭
৭.	ঐ	ঐ	পৃ. ৬৫
৮.	ঐ	ঐ	পৃ ৬৫
৯.	ঐ	ঐ	পৃ ৬৬
১০.	ঐ	ঐ	পৃ. ৬৭
১১	ঐ	ঐ	পৃ. ৬৭ ৬৮
১২.	ঐ	ঐ	পৃ. ১০০ ১০১

[বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত ভূদেব গ্রন্থাবলী—৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'বিবিধপ্রবন্ধ' ১ম ভাগ থেকে উদ্ধৃতিসমূহ সংকলিত হয়েছে।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূদেবের স্বদেশচেতনা

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

গ্রন্থ পরিচয়

এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের কার্তিক মাস থেকে প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায় করে প্রকাশিত হয় (ইংরাজী ২২।১০।১৮৭৫ থেকে ২৪।১২।১৮৭৫ পর্যন্ত)।

পুস্তকাকারে প্রকাশ কাল—১৩০২ বঙ্গাব্দ

১৮৯৫ খ্রী অক্টোবর ৫

(মৃত্যুর পর)।

সর্বশুদ্ধ দশটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ—পানিপথের যুদ্ধ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সাম্রাজ্যের পরিবর্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মূল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপকসভা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—উন্নতির পথ মোচন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠী

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বারাণসীর বিদ্যালয়

অষ্টম পরিচ্ছেদ—বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিষয়ক

নবম পরিচ্ছেদ—আতিথ্য উৎসবাদি-বিষয়ক

দশম পরিচ্ছেদ—আভ্যন্তরিক অবস্থা

'সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার (১৮৮৭ জানুয়ারি থেকে ১৮৮৯ জানুয়ারি) এগারো বৎসর পূর্বে (১৮৭৫ অক্টোবর—ডিসেম্বর) 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচিত হয়। ভূমিকায় ভূদেব লিখেছেন—'আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাঁহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া আমি ঐ পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যেদিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ

নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আনুপূর্বিকক্রমে মনে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি কয়েকখণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের লেখা হইবে। কখন বোধ হয় আমার না হইতেও পারে। ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার যো নাই।'[১] সেই 'কয়েকখণ্ড কাগজ'-ই হলো 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যরূপ দেখার আকাঙ্ক্ষা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন সেই রূপই এই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

সাহিত্যিক গুণবিচারে বা রচনারীতির দিক দিয়ে এই গ্রন্থখানির অভিনবত্ব বিশেষ নেই, তবে ভূদেব-মানস নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভূদেব মনেপ্রাণে ছিলেন স্বদেশপ্রেমী। স্বদেশের মঙ্গল কিসে, এই ছিল তাঁর চিন্তা। স্বপ্নলব্ধ এই ইতিহাস সেই চিন্তারই রূপায়ণ। স্বপ্নলব্ধ এই কাহিনীতে যা তিনি কল্পনাকে আশ্রয় করে সংক্ষেপে বলেছেন, তাই প্রজ্ঞাপ্রসূত প্রবন্ধরূপ লাভ করেছে 'সামাজিক প্রবন্ধে'। তাই এটিকে সামাজিক প্রবন্ধের পূর্ববঙ্গ বলা যেতে পাবে।

স্বপ্নলব্ধ এই কাহিনীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণ থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক শাসনপদ্ধতি এবং তার পররাষ্ট্রনীতি, তার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থাই ভূদেবের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান ভূদেব এ দেশের ভবিষ্যশাসন ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন চেয়েছিলেন। এই রাজতন্ত্রে রাজাকে প্রজার কল্যাণকারী বলেই স্বীকার করা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত এক ব্যবস্থাপক মহাসভা হবে সেই শাসনের মাধ্যম। এর কার্যপদ্ধতি এবং স্বরূপ সম্পর্কে লেখকের অভিমত—

"এই সভার দ্বারা রাজ্যসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব বিষয়ে বিচার হইবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে যাঁহার যে কোনো নিয়ম প্রচলিত করিবার ইচ্ছা হইবে, এই সভায় তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া বিচারিত হইবে। এই সভা হইতে ব্যবস্থাপিত এবং প্রচারিত হইয়া না গেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রাহ্য হইবে না। যেমন ভগবানের বিরাট মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক তেমনি সম্রাটের শরীরও ভারতবর্ষ-ব্যাপক। কৃষ্যুপজীবী এবং শিল্পব্যবসায়ী শ্রমশীল প্রজাব্যূহ সেই শরীরের নিম্নভাগ, বণিক

সম্প্রদায এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, যোদ্ধৃগণ এবং রাজকর্মচারিগণ তাহাব হস্ত, পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার শিরোদেশ—এই সভা তাহাব মুখ।'[২]

ভূদেব পরিকল্পিত এই শাসনব্যবস্থায় প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে ভূদেব অন্য দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা সেই দেশের প্রজাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা বা অভিমত প্রকাশ করা অনুচিত। কারণ 'দেশভেদে মনুষ্যের আচারভেদ, ব্যবহারভেদ, ধর্মভেদ এবং শাসনপ্রণালীর ভেদ হইবে। যাহারা নিতান্ত অবিবেচক এবং অপ্রকৃতদর্শী তাহারাই সকলকে এক করিতে চায়। সকলেই একরূপ হইতে পারে না। একরূপ হইলেও ভালো হয় না ভালো দেখায়ও না।'[৩] এ অনেকটা আজকালকার সুপরিচিত এবং স্বাধীন ভারত অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অনুরূপ।

ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের এবং শিল্পজাত বস্তুর উন্নতিই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য। সেজন্য বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুল্ক ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে বাণিজ্য করতে গিয়ে পরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করা অনুচিত।

স্বপ্নলব্ধ এই কাহিনীতে ভূদেব যে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক এবং দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা।

হিন্দুমুসলমানের বিরোধকে 'জ্ঞাতিবিরোধ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দু যে মাতার গর্ভজাত সন্তান, মুসলমান তারই স্তন্যপালিত সন্তান। সুতরাং হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। 'ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

'...অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়।'[৪] তাই লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—'আর আমাদের মধ্যে কি পূর্বের মতো বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতি বিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদরপূরণ করিব?'[৫] বক্তার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে চারিদিক থেকে না না না না এই ধ্বনি উঠলো। তখন 'কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল।

আমার কর্ণে ?—আমি কে ?—ভারত ভূমির কর্ণে—এ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ—তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল—মুখমণ্ডলের হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন এবং পূর্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।'[৬] এই বর্ণনায় অন্তর্বিবাদানলে বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর সম্মিলন সম্পর্কে লেখকের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর উদার ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিও ফুটে উঠেছে। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ইংরেজ শাসনের কূট-কৌশল হিসেবে এই হিন্দু মুসলমান বিরোধকে বাড়িয়ে তোলা সম্পর্কে তিনি ভারতবাসীদের আবারও সতর্ক করেছেন। পরবর্তীকালে ভূদেবের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে। ইংরেজের কূটনীতি জয়ী হয়েছে। হিন্দুমুসলমান দুই-জাতিত্বের ভিত্তিতে ভারতবিভাগের মধ্য দিযে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে।

শিক্ষাবিদ হিসেবে ভূদেব একথা জানতেন যে পারস্পরিক আদানপ্রদানেই প্রকৃত শিক্ষার বিস্তৃতি সম্ভব হবে। 'কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠি' এবং 'বারাণসীর বিদ্যালয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুটিতে তার স্বাক্ষর আছে। কান্যকুব্জের চতুষ্পাঠীর কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে—'এখানে পৃথিবীর যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষার সমগ্র চর্চা হইতেছে। নগরের ঠিক মধ্যভাগে একটি চতুষ্পাঠী। তাহার সর্বপ্রধান অধ্যাপক সর্বপ্রধান সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অধ্যাপক গ্রীক ভাষা শিক্ষা করান—তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাষার শিক্ষা দিয়া থাকেন—চতুর্থ অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা দেন। এই সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহকারী অধ্যাপক অনেকগুলি করিয়া আছেন। ছাত্রেরা ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে, কতকগুলি আরব পারস্য এবং তুর্কস্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষতঃ জর্মনি, রুশিয়া হইতে এখানে আসিয়া পাঠ সমাপন করিতেছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ধারিত আছে। উল্লিখিত কয়েক ভাষার প্রাচীন এবং নব্য, মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রায় সকল পুস্তকই ঐ চতুষ্পাঠীতে সংগৃহীত হইয়া আছে।'[৭]

আর 'বারাণসীর বিদ্যালয়' হলো বহু শাস্ত্রের চর্চার কেন্দ্র। 'বিশেষতঃ যাবতীয় নব্যভাষা ঐ স্থানে শিক্ষিত হয়, ফরাসী, জর্মন, ইটালীয়, ইংরাজী, ফারসী, হিন্দি—এই কয়েকটি ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইয়া আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ধারিত আছে। ঐ সকল এবং অপরাপর চলিত ভাষার যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাগারে সংরক্ষিত

হইতেছে। ঐ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আর একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে। তাহাতে জ্যোতিষ গণিত, পদার্থতত্ত্বাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে।'[৮]

এইভাবে প্রাচীন এবং নবীন, স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় বিদ্যার সর্বাত্মক সম্মিলনের মধ্য দিয়েই যে প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব এই বক্তব্যই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পরিকল্পনাতেও এই আকাঙ্ক্ষারই রূপায়ণ দেখি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে ভূদেব দুটি বিশেষ মূল্যবান কথা বলেছেন। একটি কথা স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি জাতিভেদ বিষয়ে। প্রথমটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—'স্ত্রী-নিরোধটি শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা মোচন হইলেই স্ত্রী-নিরোধও রহিত হইয়া যায়।'[৯]

জাতিভেদ সম্পর্কে বলছেন—'ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটি প্রাকৃতিক মূল আছে, উহা নিতান্ত কৃত্রিম বস্তু নহে, এইজন্য উহা অদ্যাপি চলিতেছে, আরও কিছুকাল চলিবে। তদ্‌ভিন্ন তখন আমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের বিশেষ আঁটাআঁটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন ছিল না, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। সাহিত্যশাস্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই। আমাদিগের জাতিত্বই বিনাশ দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল, সে সময় যদি বিশেষ যত্ন করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালীসমুদায় রক্ষা না করিতাম, তবে এতদিন আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন,—ধর্ম সজীব—সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে, এখন আর কেহ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি। আমরা পূর্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদিগের আর সে ভয় নাই।'[১০] প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে গোরার একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। স্বদেশীয় সকল আচার রক্ষা করে চলা সম্পর্কে গোরা বলছে—

'এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া।'[১১]

অর্থাৎ পরাধীন দেশে স্বভাবতই দেশবাসীর মনে যে হীনমন্যতাবোধ জাগে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন তা দূর করা ও স্বদেশীয় সবকিছু সম্পর্কে গৌরববোধ জাগিয়ে

তোলা ; বিচার—তার পরের প্রশ্ন। এ বিষয়ে ভূদেব আর রবীন্দ্রনাথের মতের প্রাথমিক মিলটুকু লক্ষণীয়।

ভূদেব হিন্দুকলেজের ছাত্র — তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিদেশীয়ানার বিশেষ অনুরাগী, পরবর্তীকালে দেশে ইংরেজী শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অন্ধ ইংরেজভক্তদেরও আধিক্য ঘটে। আজীবন শিক্ষাব্রতী ভূদেব তাঁর সারাজীবনের সাধনায় ইংরেজী শিক্ষার সেই মোহময় অন্ধতাকে দূর করতে চেষ্টা করেছেন। ভূদেবের রচনায় রাজনৈতিক মুক্তিসাধনার চাইতে আত্মিক মুক্তি-সাধনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। স্বদেশকে জানা, স্বদেশকে ভালোবাসা এবং স্বদেশকে শ্রদ্ধা করা—রাজনৈতিক স্বাধীনতার চাইতে মূল্যবান। কারণ তাহলেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং তা রক্ষা করার প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেবের এ মনোভাব আরও পরিস্ফুট হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাই তাঁকে একটি অখণ্ড ভারতবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর সমস্ত রচনাতেই এই ভারতবোধ কখনো-না-কখনো অনুভূত হয়েছে। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তারই একটি প্রকৃষ্ট রূপ দেখা দিয়েছে।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হলো ভারতবর্ষের গ্রামকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। 'মূল ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপক সভা'শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাজস্ব সম্বন্ধীয় যে বিধি-বিধান কল্পিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে :

'প্রতি গ্রামের ভূমি কতো এবং তাহার উৎপন্ন কতো, তাহা অবধারিত করিতে হইবে, অনন্তর ঐ উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ রাজকোষে প্রেরিত হইবে। যাহা থাকিবে, তাহার দ্বিষড়্‌ভাগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ করিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সমুদায় গ্রামিকদিগেরই থাকিবে। ভূমির উৎপন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে নিয়ম অপর সর্বপ্রকার রাজস্বের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম চলিবে।

'শান্তিরক্ষার ভার গ্রামবাসীদের উপর অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

'ধর্মাধিকরণের ভারও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অর্পিত থাকিবে। তবে ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ফলত প্রতি গ্রাম যেন একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া থাকিবে। ভূম্যধিকারীগণ এবং প্রদেশাধিকারীগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবেন—গ্রামগুলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্মাধিকরণ

এবং রাজস্বপ্রধান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারতভূমির চিরপ্রচলিত ব্যবহার এই এবং এই ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসংগত।'[১৩]

'আভ্যন্তরিক অবস্থা' শীর্ষক দশম ও শেষ পরিচ্ছেদে একজন রুশীয় পর্যটকের কল্পিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামই যেন একটি প্রজাতন্ত্র স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্য গ্রামের লোকেরাই স্বয়ং নির্বাহ করে। রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। প্রতি গ্রামেই এক একটি দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীদিগের সভা হয়। গ্রামে প্রতি পল্লী হইতে ঐ সভায় এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, পরে বিচার্য বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে তদনুযায়ীই কায করে। আমাদিগের রুশিয়াতেও ঐ প্রণালী প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে কতকগুলি করিয়া লোকে দাস্যে নিযুক্ত থাকে। ভারতবর্ষে সেরূপ নাই। আর একটি প্রভেদ এই—রুশিয়ার গ্রামসকলের ভূমিতে প্রজাবর্গের সাধারণ স্বত্ব আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই। এখানে গ্রামের প্রতি ভূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অসাধারণ স্বত্ব আছে। কিন্তু রাজস্বদান প্রতি ভূমিখণ্ডের জন্য পৃথক না হইয়া সাধারণত গ্রামের জন্যই একবারে হইয়া থাকে। এক কালে গ্রীকদের মধ্যে যেমন এথিনীয়েরা প্রথমত ব্যক্তিনিষ্ঠ অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বে স্পার্টার লোকেরা সেরূপ স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুশীয়েরাও সেইরূপ আছেন। রুশিয়ার গ্রামিকদিগের অধিকার স্পার্টার ন্যায়, ভারতবর্ষে এথিনীয়দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ স্বত্বের চিহ্ন এখানেও বিদ্যমান আছে। গ্রামরক্ষক, নাপিত, গ্রাম্য যাজক এবং গুরু মহাশয়—এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক ভূমির সাধারণ স্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী। এদেশে ঐ সকল ভূমির নাম চাকরাণ, দেবোত্তর এবং মহোত্তর ইত্যাদি।

'প্রতি গ্রামে যেমন এক একটি দেবালয় আছে, তেমনি এক একটি ব্যায়াম শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয়ও আছে। ছেলে পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যালয়ে যায়, এবং ৮ বৎসরের হইলেই ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করে। ওরূপ করিতে হইবে বলিয়া যে কোনো রাজনিয়ম আছে এমন নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ। ...সেখানকার লোকসকল স্বতঃই সৎকার্যে প্রবৃত্ত হয়, আইনের বলের অপেক্ষা করে না।'[১৪]

এই গ্রামকেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র কল্পনা ভূদেবের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একটি

উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৮৮২ সালে যখন ইংরেজ সরকার বঙ্গদেশে শিক্ষাকর প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হলেন তখন বাঙালীর অন্যতম শিক্ষাগুরু ভূদেব দ্বিধাহীন ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে ছোটলাট ইডেনকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন,

'এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূরণ করিয়াছে। এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষাকর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত।'[১৫]

এইসঙ্গে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিজের প্রস্তাবটিও উত্থাপন করে এই পত্রে বললেন,

'গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটি করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের যেরূপ ভাবে নিয়োগ ও বেতন প্রাপ্তি হয়, সেইভাবে উক্ত পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিয়োগ এবং বেতন প্রাপ্তি চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত দিয়া হইবে। এই আইন প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিদারী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে।

'এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সুচারুরূপে অনেকদূর পর্যন্ত হইতে পারে। কোনোরূপ শিক্ষাকরের অধীনে তাহা হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয়।

'পূর্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন —এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা সেই অবস্থার নিকটবর্তী আনিয়া দেওয়ায় সেইরূপ শুভফল প্রসূত করা সম্ভব।'[১৬]

মোট কথা, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ভূদেবের দিবাস্বপ্ন-প্রসূত এক অবাস্তব কল্পকথা মাত্রই নয়, এটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত প্রৌঢ়চিন্তার পরিপক্ব ফসল।

পুষ্পাঞ্জলি

১

বাংলার প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রবন্ধসাহিত্যে 'সামাজিক প্রবন্ধ' যদি মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হয়, তাহলে বাংলার কল্পনাভূয়িষ্ঠ সৃজনীসাহিত্যে 'পুষ্পাঞ্জলি' ভূদেব-প্রতিভার মহত্তম সারস্বতকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' কিংবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মতোই ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' বাংলা সাহিত্যে অ-ভূতপূর্ব, অ-দ্বিতীয় রচনা।

'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার ইতিহাস সম্পর্কে 'ভূদেব চরিত প্রথমভাগে' বলা হয়েছে, '১২৭৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৬৯) উনবিংশ পুরাণ (স্বয়ম্বরাভাসপর্ব) নামে একখানি পুস্তক বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ভূদেববাবুর কোনো প্রিয় শিষ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া এবং তাঁহারই নিকটে বসিয়া ঐ পুস্তকখানি রচনা করেন। কাটকুট করিতে করিতে রচনা একরূপ ভূদেববাবুরই দাঁড়াইয়া যায়। (ভূদেববাবুর 'পুষ্পাঞ্জলি' পুস্তকখানি ঐ উনবিংশ পুরাণেরই তীর্থদর্শন-পর্ব স্বরূপে প্রথম লেখা হইয়াছিল।) শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণই ভূদেববাবুর নিজের লেখা। উহাতে ভূদেববাবুর কবিত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং যোগীজনসুলভ ভবিষ্যৎদৃষ্টি সুপ্রকাশিত। প্রাকৃতিক শক্তিতে যাহা ঘটে, মহাত্মারা তাহা পূর্ব হইতে দেখিতে পান এবং সেইদিকে লোকের মন ফিবাইয়া রাখেন। ভূদেববাবুকে বৈধ স্বদেশীযুগের প্রবর্তক বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।'[১]

আমরা উনবিংশ পুরাণ দেখেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গ্রন্থটি রক্ষিত আছে। ভূদেব-চরিত প্রথমভাগেও ৪০৬ পৃষ্ঠা থেকে ৪১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই গ্রন্থের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। চরিতকার ভূদেবপুত্র মুকুন্দদেব বলেছেন, 'উনবিংশ পুরাণের 'শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণই ভূদেববাবুর নিজের লেখা'। এই অধ্যায়টির সাম 'ব্রহ্মসংবাদ'। ব্রহ্মসংবাদের উপসংহারে আছে—

এ পুরাণ-গীতগাথা করিলে শ্রবণ।
ভবিষ্যবিষয়ে হয় সূক্ষ্ম-দরশন ॥
মাতৃহীন করে লাভ জননী ধরায়।
সোদর সহায়হীন ভাই বন্ধু পায় ॥

উনবিংশ পুরাণের মাহাত্ম্যখ্যাপক এই পংক্তিচতুষ্টয় থেকে উক্ত পুরাণের বক্তব্য আভাসিত হচ্ছে। ভারতীয় পুরাণশাস্ত্র দেবদেবীগণের মহিমা ও মাহাত্ম্য-প্রচারক

অলৌকিক উপাখ্যানমালা। অষ্টাদশ পুরাণে দেব-দেবী মহিমাই প্রচারিত। আলোচ্য 'ঊনবিংশ পুরাণ' শ্রবণের ফল হলো—'মাতৃহীন করে লাভ জননী ধরায়'। এই বাক্যের 'ধরায়' পদটি সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ধরলে অর্থ হবে মাতৃহীন জন পৃথিবীতে জননী লাভ করবে। আর 'ধরায়' যদি দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত হয়েছে বলে ধরা যায় তাহলে তার অর্থ হবে, মাতৃহীন জন পৃথিবীকে জননীরূপে পাবে। শেষোক্ত অর্থই ঊনবিংশ পুরাণের ব্যঙ্গ্যার্থ। অর্থাৎ ঊনবিংশ পুরাণকে বলা যেতে পারে 'স্বদেশপুরাণ'।

ঊনবিংশ পুরাণের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি থেকে আমাদের এই ধারণা হয়েছে যে, গ্রন্থের শুধু শেষ অধ্যায়টি নয়, সমগ্র গ্রন্থখানিই ভূদেব কর্তৃক পরিকল্পিত। চরিতকার লিখেছেন—'কাটকুট করিতে করিতে রচনা একরূপ ভূদেববাবুরই দাঁড়াইয়া যায়'। ঊনবিংশ পুরাণের 'অধিভারতীর ভাবান্তর' শীর্ষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় অধ্যায়টিও ভূদেবেরই লেখনী-প্রসূত। বস্তুত ঊনবিংশ পুরাণ, পুষ্পাঞ্জলি, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সামাজিক প্রবন্ধ সমবেতভাবে ভূদেবের স্বদেশচিন্তার চারটি স্তম্ভ। ঊনবিংশ পুরাণ ও পুষ্পাঞ্জলি পুরাণকথার আকারে রচিত, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বদেশভক্তের দৃষ্টিতে স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য ইতিহাস-কথা এবং সামাজিক প্রবন্ধ প্রবন্ধাকারে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত।

চরিতকার বলেছেন 'ভূদেববাবুর কোনো প্রিয় শিষ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া এবং তাঁহারই নিকট বসিয়া ঐ পুস্তকখানি রচনা করেন।' মুদ্রিত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নেই। মুদ্রক হিসেবে বুধোদয় প্রেসের শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। ঊনবিংশ পুরাণের কল্পনামূলে যে উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেম সোচ্চার হয়ে উঠেছে তা অজ্ঞাতনামা কোনো সাধারণ লেখকের রচনা হতেই পারে না। যে রূপকাশ্রয়ী পৌরাণিক রীতি পুষ্পাঞ্জলিতে অনুসৃত হয়েছে, ঊনবিংশ পুরাণেও সেই রীতিই অবলম্বিত। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে—'অধিভারতীর ভাবান্তর' শীর্ষক ঊনবিংশ পুরাণের যে তৃতীয় অধ্যায়টি উদ্ধৃত হয়েছে, চিন্তা কল্পনা ও ভাষারূপের দিক দিয়ে তা ভূদেবের অন্যান্য রচনার সঙ্গে অনেকাংশে অভিন্ন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারি না যে, ঊনবিংশ পুরাণ গ্রন্থখানি ভূদেবেরই রচনা। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। সে সময় ভূদেব সরকারের উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি এই স্বদেশ-প্রেমাত্মক গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নাম প্রকাশ করেননি। এই প্রসঙ্গে আরো

উল্লেখযোগ্য যে ভূদেবচরিত ১ম ভাগ সমাপ্ত হয়েছে উনবিংশ পুরাণের বিস্তৃত আলোচনা দিয়ে। শেষ অধ্যায়টি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। এ থেকেও অনুমিত হয় যে চরিতকার এই গ্রন্থখানিকে ভূদেব-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। (সামাজিক প্রবন্ধ এবং উনবিংশ পুরাণ গ্রন্থ দুটি মিলিয়ে পড়লে আমাদের বক্তব্য সহজেই উপলব্ধ হবে।) উনবিংশ পুরাণ প্রকাশের (১৮৬৯) প্রায় সাতবৎসর পরে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। চরিতকার উনবিংশ পুরাণের আলোচনা প্রসঙ্গে তৃতীয় বন্ধনীতে বলেছেন. 'পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকখানি উনবিংশ পুরাণেরই তীর্থদর্শন পর্ব হিসাবে প্রথমে রচিত' হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'পুষ্পাঞ্জলি'কে স্বদেশপুরাণ আখ্যা দেওয়াই সমীচীন হবে।

ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির সূচনায় গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বলেছেন, 'কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্যকথন।' এই সঙ্গে তিনি মহাকবি গ্যেটের উক্তি উদ্ধার করেছেন :

Ordinary history is traditional, higher history mythical and highest mystical.

গ্যেটের এই উক্তি উদ্ধার করার তাৎপর্য এই যে ভূদেব সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে পুরাণকথাকে জাতির মহত্তর ইতিহাস বলে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাঁর দৃষ্টিতে পুরাণকথার গূঢ়ার্থব্যঞ্জক তাৎপর্য ব্যাখ্যানই মহত্তম ইতিহাস। এই অনুমান-সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে পুষ্পাঞ্জলির উৎসর্গপত্রে। পিতৃদেবকে 'জন্মদাতা ও শিক্ষাগুরু' বলে উল্লেখ করে তাঁরই নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে ভূদেব লিখেছেন 'তোমার চরণ প্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইত—যাবতীয় গূঢ়ার্থ উদ্‌ভিন্ন হইয়া রূপকমালার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল প্রকাশ করিত—আপাতবিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহারপ্রণালী জন্মিত এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্বরতা সম্পাদিত হইত। ভরসা করি, তোমার মুখনিঃসৃত কোনো কোনো কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে হিন্দুকলেজে পঠনকালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রভাবে ভূদেবের মনে কিছুদিনের জন্য হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা দেখা দিয়েছিল। মনের সেই অবস্থায় তিনি গৃহদেবতার পূজার্চনার প্রতি বীতরাগ হন। একদিন তর্কভূষণ মহাশয় অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে শুনতে পান, ঠাকুরের আরতি হয়নি। কাউকে কিছু না বলে তিনি নিজেই আরতি করলেন। পরদিন পুত্র ভূদেবকে

জিজ্ঞাসা করলেন 'কাল রাত্রিতে ঠাকুরকে আরতি কর নাই কেন ?' পুত্র উত্তর করলেন, 'উহা পৌত্তলিকতা। উহা করিলে পাপ হয়।' তর্কভূষণ মহাশয় বুঝতে পারলেন পুত্রের চিত্ত বিষাক্ত হয়েছে। তিনি বললেন 'বিশ্বাস না হয় করিও না, ভক্তি ব্যতিত অশুচিমনে ঠাকুরঘরে যাইতে নাই।'২

এই ঘটনার পর থেকে তর্কভূষণ পুত্রের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য যত্নবান হলেন। প্রতিদিন একসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাতায়াতের সময় হিন্দুধর্মের তাৎপর্যাদি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বস্তুত ভূদেবের ধর্মবোধের মূলে তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব অপরিসীম। 'পুষ্পাঞ্জলি'র উৎসর্গপত্রের প্রথমেই তিনি একথা স্বীকার করে বলেছেন, 'আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই।'

পুষ্পাঞ্জলির সূচনায় ভূদেব বলেছেন, 'কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথনই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।' উৎসর্গপত্রে বলেছেন 'ধর্মবিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যাই' তাঁর লক্ষ্য। 'ধর্মবিশ্বাসের মূল' বলতে ভূদেব কি বুঝেছেন তা গ্রন্থের 'আভাস'-এ ব্যাখ্যাত আছে।

পুরাণশাস্ত্রকে তিনি বলেছেন 'আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির প্রতিবিম্বস্বরূপ।' এই পুরাণশাস্ত্রের বক্তব্য মুখ্যত রূপক ও অতিশয়োক্তি অলংকারের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত। রূপকে বিষয় ও বিষয়ীর অভেদ আরোপিত হয়। বিষয় অর্থাৎ উপমেয়ের অপহ্নব না করে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের অভেদ আরোপের অর্থ হলো একটি বস্তুর উপর অন্য একটিকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে রূপায়িত করে তুলতে পারে। অতিশয়োক্তি অলংকারে বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের দ্বারা উপমেয়ের সঙ্গে অভেদ প্রতিপাদিত হয়।

ভূদেব বলেছেন, 'পুরাণশাস্ত্রে কথিত নায়ক-নায়িকা এবং দেবাসুরগণ বহুক্ষেত্রেই রূপকালংকারে বিভূষিত।' অর্থাৎ হয় তারা 'আভ্যন্তরিক মনোভাবস্বরূপ' নয় 'বাহ্যপ্রকৃতির শক্তিবিশেষ'।

পুষ্পাঞ্জলিতে আছে মুখ্যত তিনটি চরিত্র। বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয় এবং দেবী।

গ্রন্থকার বলেছেন, 'বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপস্বরূপ' বর্ণিত হয়েছেন।

তীর্থদর্শনের ফলে ধর্মের তাৎপর্য নির্ণয় কিভাবে সম্ভব তার 'আভাস' দিয়ে ভূদেব বলেছেন, 'বিনাশমাত্রে সংসারের পর্যবসান, এই প্রতীতি-সমুদভূত নাস্তিকতার প্রভাবে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয় এবং ইচ্ছাবৃত্তির স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হইয়া চেষ্টাশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। তারপর 'দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশা এবং প্রজ্ঞার' সংস্কারসাধনের উপায় উদ্ভাবিত হয় এবং 'প্রীতির উদারতা অনুভূত' হয়। এই পর্যন্ত হলেই 'সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধি' বিলুপ্ত হয়ে 'প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধি'র উদয় হয়ে থাকে। 'অভেদজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়া সহিষ্ণুতার সর্বপ্রাধান্য প্রতীত' হয়। এইভাবে 'নিজসমাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মূল নিরূপিত হইলে অপর কোনো বিভীষিকার উপদ্রব থাকিতে পারে না।' তখন 'স্বজাতীয়ানুরাগ তাহার প্রীতিভাজন পদার্থের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে সংগোপিত কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে।'

ভূদেবের এই বস্তুনির্দেশ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রজ্ঞার সংস্কারসাধন বলতে তিনি 'সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধি' পরিহার করে 'প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধি'র বিকাশসাধনই বুঝেছেন।

প্রজ্ঞার এই বিকাশসাধনে ভূদেব নিসর্গপ্রকৃতির প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, 'তরুণবয়সে সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় কোনো গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে দেখিতেছি যে, প্রকৃতিপুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ।… যিনি প্রকৃতি-পুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণে যতদূর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানলাভেও কৃতকার্য।'

প্রকৃতপক্ষে পুষ্পাঞ্জলির তীর্থপরিক্রমার প্রেরণামূলে রয়েছে প্রকৃতিপুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণের প্রয়াস। জন্মভূমির নৈসর্গিক রূপই স্বদেশভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে দেবীরূপে ধরা দিয়েছে। সমগ্র বেদের বিস্তারকর্তা বেদব্যাস মূর্তিমান মহাজ্ঞান মার্কণ্ডেয়কে বলেছেন,

'আমি ধ্যানে কি অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য— অঙ্গের কি জাজ্জ্বল্যমান, প্রভা মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্বতরাজপুত্রী

পার্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইঁহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইঁহাকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইঁহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে—কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন।'[৩]

ভূদেবকল্পিত এই মাতৃমূর্তির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ধ্যানলব্ধ মাতৃমূর্তির তুলনা করা চলে। ভূদেবের মাতৃমূর্তি 'নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন'। 'কমলাকান্তের মাতৃমূর্তিও অসংখ্যসন্তানকুল পালিকা।' তফাৎ এই যে কমলাকান্ত সপ্তমীপূজার দিন শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমা দেখতে গিয়ে দুর্গাপ্রতিমার মধ্যেই তার জননী জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষ করেছিল। কমলাকান্ত বলছে,

'চিনিলাম এই আমার জননী—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দিত, বীরজনকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'[৪]

শুধু কমলাকান্তই নন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানগণও দেবী দুর্গার সঙ্গে দেশজননীকে অভিন্ন করে দেখেছেন। আনন্দমঠের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'. সংগীতেও এই অভেদতত্ত্ব উদ্গীত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্,
অমলাং অতুলাম্,

সুজলাং সুফলাম্

মাতরম্,

অর্থাৎ স্বদেশভক্তের দৃষ্টিতে সুজলাসুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা জন্মভূমিই তার পরমারাধ্যা দেবী। তিনিই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, তিনিই কমলদল-বিহারিণী কমলা। তিনিই বিদ্যাদায়িনী বাণী। আনন্দমঠের সন্তানগণের অন্য দেবতা নেই। দেশজননীই তাঁদের সর্বদেবতা। তাই সন্তান বলেন,

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

এখানেই ভূদেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে দুর্গাপ্রতিমাই বঙ্গপ্রতিমা। ভূদেবের দৃষ্টিতে জননী জন্মভূমি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তাই ব্যাস-দেবের ধ্যানলব্ধ দেবী-প্রতিমা পর্বতরাজপুত্রী পার্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নন, রক্তাম্বরা মাধবপ্রিয়াও তিনি নন, ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় তাঁর সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব সত্ত্বেও তিনি বীণাপাণি নন। ব্যাসদেব বলছেন, অন্য সকল দেবদেবী থেকে তাঁর বৈচিত্র্য এই যে তিনি নিরন্তর মাতৃভাবে অপত্যবর্গকে অন্ন পান প্রদান করছেন। আনন্দমঠের সন্তান বলেছেন 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। ব্যাসদেব তাঁর ধ্যানলব্ধ স্বদেশজননীর দেবীমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মার্কণ্ডেয়কে নিয়ে ভারততীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হয়েছেন। মন্দিরে মন্দিরে নয়, ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্র সমাজ ধর্মের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় যে জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে তারই তাৎপর্য ও রহস্যসন্ধানের মধ্য দিয়ে স্বদেশের 'মহিমময়ী মাতৃমূর্তিকে আবিষ্কার করাই এই তীর্থপরিক্রমার লক্ষ্য। ভূদেব তাকেই বলেছেন—'প্রকৃতিপুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণ'। এই অর্থেই ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলির অন্য নাম হতে পারত 'ভারততীর্থ-পরিক্রমা'। সে তীর্থ শুধু হিন্দুরই তীর্থ নয়। মহাপ্রকৃতির বিচিত্রলীলায় সমুৎপন্ন ও সমাগত বহু ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলন-বিচ্ছেদ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যে পুরাণেতিহাস রচিত হয়েছে তাই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বদেশের মহাতীর্থ।

৩

এই মহাতীর্থপরিক্রমা শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্র থেকে। ভূদেব বলছেন, 'কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থান। ·· এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও নিহত, মহারাষ্ট্রসেনা বিনষ্ট এবং হিন্দুজাতির উদয়োন্মুখ আশা বহুকালের নিমিত্ত অস্তমিত।'

কিন্তু এই হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি যে সত্যদৃষ্টি নয়, তা গ্রন্থের আভাসেই গ্রন্থকার বলেছেন। 'বিনাশমাত্রে সংসারের পর্যবসান, এই প্রতীতি সমুদ্ভূত নাস্তিকতার প্রভাবে স্বজাতি বাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়।' তাই কুরুক্ষেত্রকে বলা হয়েছে 'শান্তরসাস্পদস্থান'। কেননা 'এখানে কুরুপাণ্ডব, হিন্দুমুসলমান, শত্রুমিত্র সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে।' কোনো বিবাদ বিসম্বাদ বা বৈরিতার নামগন্ধও নাই। ভয়, বিদ্বেষ, ঈর্ষাদিভাব একেবারে বিসর্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতন।'

এই ভাবেই পতন-অভ্যুদয়কে এক মহাজীবন-সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ করার সম্যক্‌ বা দিব্যদৃষ্টিই পুষ্পাঞ্জলিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের আভাসে ভূদেব বলেছেন, 'মনে কর বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃমূর্তির প্রতিরূপস্বরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না—তাহা হইলে বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্রু বিসর্জনে সঙ্কুচিতা সরস্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাহার ক্রোধোদ্দীপ্তিতে জ্বালা দেবীর আবির্ভাব আর অলৌকিক ব্যাপার থাকিবে না।'[৫]

বস্তুত পুষ্পাঞ্জলিতে 'অলৌকিক' বলে কিছু নেই। পুরাণ যে অর্থে জাতির ইতিবৃত্ত, পুষ্পাঞ্জলি তার চেয়ে ব্যাপক ও বাস্তব অর্থে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত। কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরস্বতী এককালে বেগবতী স্রোতস্বিনী ছিল। সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণই ভারতীয় সভ্যতার প্রবৃদ্ধিসাধন করেন। সেই জীবন-প্রবাহরূপিণী সরস্বতী আজ জীর্ণা ও সংকীর্ণা। তাই দেখে স্বজাতি-অনুরক্ত বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্রু নির্গত হলো। সেই অশ্রুধারায় সরস্বতী পুনরায় বেগবতী হলেন। মার্কণ্ডেয় বলছেন 'সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকল্মষ প্রক্ষালনের অমোঘ উপায়, মহামনাদিগের অশ্রুবারিই প্রকৃত সরস্বতীজল।'[৬]

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তসীমায় অম্বালয় অর্থাৎ একালের অম্বালা। অম্বালার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে বেদব্যাস দেখলেন 'বহুসহস্র সৈন্যের স্কন্ধাবার'। সৈন্যদলের প্রতি রাজপুরুষগণের সন্দেহ হওয়ায় তাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে। প্রধান রাজপুরুষ রাজদ্রোহের অপরাধে নির্বিচারে তাদের হত্যা করলেন।

রাজকীয় অশ্বারোহী সেনানীরা নারীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করতে লাগলো। তাই দেখে বেদব্যাস ক্রুদ্ধ হলেন। জ্বালামুখী কুণ্ড ধকধক করে জ্বলে উঠলো। স্বদেশভক্ত বেদব্যাসের ক্রোধের প্রতিচ্ছবি হিসাবে জ্বালামুখীর প্রজ্বলন-বর্ণনায় ভূদেব বলছেন, 'নিমেষমধ্যে গিরিগর্ভ হইতে গভীর গর্জন ধ্বনিত হইল এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চতুষ্পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড সমস্ত হইতে প্রভূত ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইল এবং জ্বালামুখী মুখব্যাদান করিয়া সুদীর্ঘ জিহ্বাগ্রদ্বারা পর্বতের শিরোদেশ লেহন করিলেন।' মার্কণ্ডেয় জ্বালামুখী দেবীকে সম্বোধন করে বলছেন, ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশসাধনের জন্য যেমন তিনি পূর্বেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবারও তিনি তেমনি নিজের রুদ্রমূর্তি দেখালেন। 'কেবল মূর্তি প্রদর্শন মাত্র করো নাই—স্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে পরিষিক্ত করিয়াছ।' বেদব্যাসের দিকে তাকিয়ে মার্কণ্ডেয় লক্ষ্য করলেন, জ্বালাদেবী তাঁতে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। স্বদেশ ও স্বজাতির এই দীনহীন দশা দেখে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ব্যাসদেব শুরু করলেন ভারত-ইতিহাস-পরিক্রমা।

৪

ভূদেব এই ইতিহাস-পরিক্রমাকে বলেছেন 'ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ।' এই প্রদক্ষিণ শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রে। সেখান থেকে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নদীর সম্মিলনস্থল ত্রিকোণাকার প্রদেশ ত্রিপুষ্কর। সেখান থেকে প্রভাস দ্বারাবতী। তারপর অর্বলী পর্বতের পশ্চিমদিকে মাড়বার। মাড়বার উত্তীর্ণ হয়ে আরো পশ্চিমদিকে সিন্ধুপ্রদেশ। মাড়বার ও সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করে সমুদ্র তীরবর্তী একটি বাণিজ্যবন্দর। সেখান থেকে বোম্বাই। সেখান থেকে আরো দক্ষিণে কুমারিকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর। রামেশ্বর থেকে অর্ণবপোতে উত্তরপূর্ব প্রান্তসীমা ধরে উৎকল ও বঙ্গভূমি। তারপরে পূর্বদিকে চন্দ্রশেখর এবং সর্বশেষে গুপ্তসাধনের মহাতীর্থ কামাখ্যা।

এই ভারতপ্রদক্ষিণের ভৌগোলিক রেখা অনুসরণ করলে একটি বিস্ময়কর সাদৃশ্যের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জনগণমন-অধিনায়ক' সংগীতেও ভূদেবের এই ভৌগোলিক ক্রমটিই অনুসরণ করে গেয়েছেন 'পঞ্জাব

সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'। ভূদেব-রবীন্দ্রনাথের এই ভারত-পরিক্রমার সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক না পারম্পরিক প্রভাবসঞ্জাত তা পরে আলোচিত হবে।

আপাতত আমরা ভূদেবের ভারত প্রদক্ষিণের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা করি। চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিপুষ্করের বর্ণনায় যে 'সুবিস্তীর্ণ, জীবসমৃদ্ধিপরিশূন্য, অতি ভয়াবহ, বালুকাময় মরুভূমি'র তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে তা ভূদেবের কল্পনাভূয়িষ্ঠ কবিত্বশক্তির এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মরুস্থলে বেদব্যাস ও মার্কণ্ডেয় দুটি ভয়ংকর মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন। একটি স্ত্রী, অপরটি পুরুষ। 'পুরুষের নাসাবিনির্গত নিশ্বাসবায়ু শরীরে স্পর্শ করায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি পদরজোদ্বারা তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া গেল।' পুরুষটি ওই মরুদেশের রাজা, তার নাম নৈরাশ্য। স্ত্রীলোকটি তার রমণী, নাম স্বেচ্ছাচারিতা। ভূদেব ব্যাখ্যা করে বলছেন, 'লোকে বিশেষ না জানিয়া ইহাদিগকেই 'লু' বলিয়া অভিহিত করে। এই দম্পতি চিরকাল একত্র অবস্থান করে এবং সর্বত্র একযোগে বিচরণ করে। সরস ক্ষেত্রেও ইহাদিগের সন্দর্শন হইলে কোনো ক্রমেই রক্ষা থাকে না। সকলকেই ইহাদিগের প্রভাবে সঙ্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয়।'

কলিযুগোচিত শরীর ধারণের ফলে ব্যাসদেবও আত্মবিস্মৃত হলেন। তাঁর আত্মহত্যার ইচ্ছা হলো। কিন্তু দৈবযোগে পুনরায় আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন, এবং এক অদৃশ্য-শক্তি-চালিত হয়ে তিনটি অপূর্ব প্রাসাদ দেখতে পেলেন। প্রথমটির নাম রত্নপুর, দ্বিতীয়টি হরিতপুর, তৃতীয়টি প্রাণিপুর। আসলে এই প্রাসাদত্রয় ত্রিপুষ্করতীর্থেরই নবভাষ্য। মার্কণ্ডেয় বলছেন, 'তুমি বিধাতৃসৃষ্ট ত্রিবিধ সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য অবগত হইয়াছ। তুমি অচ্ছেদ্য অভেদ্য সর্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খল দেখিলে। তুমি ভয় শোক সন্দেহাদির অতীত হইলে। যে অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়া আদ্যার প্রসাদে ভগবান ব্রহ্মা এই মরুদেশে এই মহাতীর্থত্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাময়ীও তোমাকে আপন বিভূতি পরিদর্শন করাইয়া তোমার হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ভ্রম, প্রমাদ, নাস্তিক্যাদি পিশাচগণ আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তুমি সর্ব সিদ্ধিলাভের পথে পদার্পণ করিলে, তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য থাকিল না, তুমি স্বয়ং সৃষ্টিকার্যে সক্ষম হইলে।'

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রভাসক্ষেত্রে যাদববংশের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। যাদবকুলের রাজ্যাপহারজনিত শোকান্ধকার তিরোহিত এবং আশামহাদেবীর আবির্ভাবে আলোকমালা প্রভাসিত হওয়ায় বেদব্যাসের অন্তরে প্রজ্ঞা মহাদেবী অধিষ্ঠিতা

হলেন। তিনি অনুভব করলেন 'ধীশক্তি এবং স্মৃতিশক্তির বিষয়সমস্ত যেমন সত্যপুত এবং সসার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপুত এবং সারবান।'[৭]

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'নৈরাশ্য' ও 'স্বেচ্ছাচারিতা'র বিগ্রহরচনা এবং রত্নপুর হরিতপুর এবং প্রাণিপুরের বর্ণনায় ভূদেবের পরিকল্পনা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবিত্বকল্পনার অনুরূপ। গ্রন্থরচনা ও প্রকাশের বিচারে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলির পূর্বগামী। 'পুষ্পাঞ্জলি'-প্রণেতা অজ্ঞাতসারে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে অনুমান করা অসংগত হবে না।

৫

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতের আদিবাসী বিভিন্ন অনার্যজাতি কিভাবে আর্যসমাজে গৃহীত হলো, রূপকাকারে তাই বিবৃত হয়েছে। অর্বলী পর্বতমালার অভ্রু নামক শিখরদেশে চারটি কুণ্ড। চারটি কুণ্ডের পাশে চারজন মহর্ষি দণ্ডায়মান। মার্কণ্ডেয় বলছেন তাঁরা জমদগ্নি, পরাশর, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কুল থেকে স্বয়ম্ভূত। এদের শিষ্যেরা আগে খস, ভিল্ল, পুলিন্দ ও কোল নামে অভিহিত ছিল। অগ্নিশুদ্ধ দীক্ষায় পবিত্র হয়ে তারা প্রমার, প্রতীহার, রথোড এবং চৌহান নাম প্রাপ্ত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেবকে বলছেন, 'কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় না। যাহা আছে তাহা দ্রবীভূত-পরিবর্তিত-সংস্কৃত করা বই কার্যান্তর নাই। তোমার জ্ঞানাগ্নি তৎকার্যে সক্ষম হইল। স্বাহাদেবী যেমন পুর্বাচার্যদিগের আবাহনে আবির্ভূতা হইয়া অনাচার বর্বর, পিশাচ সন্তানদিগকে বিশোধিত এবং রাজ-চক্রবর্তীর পদযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন। তোমার অগ্নিসংস্পর্শেও অনাচার আচারপূত হইবে, অসংস্কৃত সংস্কারবিশিষ্ট হইবে এবং বিভেদ অভেদ হইবে।'

সপ্তম অধ্যায়ে মাড়বার উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিম দিকে সিন্ধুপ্রদেশ। এখানকার 'নাগরিকেরা অনেকেই অহিফেনসেবী এবং মুসলমান ধর্মাক্রান্ত'। এই অধ্যায়েই ভারতে নানাধর্মাবলম্বী নানাজাতীয় মানুষের একত্র বসতির কথা আলোচিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় বলেছেন, 'নানাজাতীয় মনুষ্যগণের একত্র সমাগম দর্শনে অতি গভীরতর আনন্দ অনুভব হয়। অনেকের মধ্যে একত্বের প্রতীতি হইতে থাকে। এই বিভিন্নদেশীয় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বেশধারী,

বিভিন্নকার্যব্যাপৃত নরগণ পরস্পর এতো পৃথগ্‌ভূত হইয়াও একপ্রকৃতিক জীব। সকলেরই তলভাগ ভিত্তিমূল, গঠনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলত দেশভেদই সকল ভেদের কারণ। ধর্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাভেদ, একমাত্র দেশভেদ হইতেই জন্মে। সুতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া গেলে কালে আবার একতা জন্মিবে, সন্দেহ নাই। বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে, নারায়ণেরও বাস।'

ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং পরস্পর বিদ্বেষভাব-সম্পন্ন নরগণ কি কখনও একমতাবলম্বী ছিল? আবার কখনও কি একমতাবলম্বী হইতে পারে?' উত্তরে মার্কণ্ডেয় বললেন, 'মনুষ্যমাত্রেই পিতৃঔরসে এবং মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই মূল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন শিশুগণের মধ্যে ধর্মভেদের কোনো চিহ্নই থাকে না। প্রকৃত আদিমাবস্থাতেও সেইরূপ। ধর্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফলমাত্র।'

কিভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে এই সম্পর্কে ভূদেবের তত্ত্বচিন্তা উদার সূক্ষ্মদর্শিতায় অনবদ্য। মার্কণ্ডেয়ের কণ্ঠে তিনি বলছেন,

'আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা—পুরুষ এবং প্রকৃতি - ইঁহারা যে দেশে যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশের মনুষ্যেরা সেইরূপ ধর্মতত্ত্বগ্রহণ করে। যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহ্বায়ত ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রকূলবর্তী সুতরাং আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্বতময় সুতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে স্বর্গারূঢ় হইতে পারেন, এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান তথায় ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুষ্যের স্বর্গারোহণ করা এই উভয়প্রকার ধর্মতত্ত্বই লোকের হৃদ্‌গত হইয়া থাকে।'

মহাজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়ের এই অপূর্ববিশ্লেষণে ব্যাসদেব বলছেন, 'এই মহাদেশ মধ্যে নানা ধর্মভেদদর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে প্রগাঢ় চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনার বাক্যাবলী শ্রবণে তিরোহিত হইল। আমি বুঝিলাম যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা—একদেশবাসী হইলে ক্রমশ একধর্মাবলম্বী হইতে পারে।'

এই প্রতীতি দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে ব্যাসমার্কণ্ডেয় ঋষিদ্বয় অর্ণবপোতে দ্বারাবতীকূলে উপনীত হলেন। দ্বারাবতী ধামে রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে তাঁদের এক অভিনব

অভিজ্ঞতা হলো। গুণত্রিতয় সম্মিলনকারিণী মহাদেবী যেন সেই মন্দিরে নিত্য অধিষ্ঠিতা। তাই সেই মন্দিরে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলতত্ত্ব উদ্ভাসিত হলো। ব্যাসদেবের মনে হলো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সঙ্কুচিত হয়ে মন্দিরে পরিণত হলো। তিনি দেখলেন, 'তাঁহার সম্মুখে একটি মহাদেশ। নদী ভূধর বন প্রস্তরাদি পরিব্যাপ্ত ভূমণ্ডলের প্রতিরূপ স্বরূপ ঐ ভূভাগের নানাস্থানে নানাজাতীয় বিকটাকার নরপশু বাস করিতেছে। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্বাবয়ব, কোটরচক্ষু, অবনতনাসিক ও স্থূলশীর্ষ, এমনকি পুচ্ছমাত্রবিহীন দ্বিভুজ বানরবিশেষ। দেখিতে দেখিতে ঐ মহাদেশের পশ্চিম সীমাবর্তী মহাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শুভ্রকান্তি, দীর্ঘকায়, আয়তলোচন, প্রশস্তললাট, উন্নতনাসা ও সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি-পরিশোভিত মুখমণ্ডল কতকগুলি নরদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে ঐ নরপশুগণ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ধর্মজ্ঞানের উপদেশগ্রহণে সমর্থ হইল, পরস্পর হিংসাদ্বেষাদি-বর্জিত হইয়া একতাপ্রাপ্তির উপযোগী হইয়া উঠিল। ফলতঃ ঐ মহাদেশের স্থানে স্থানে যে ধর্মভিন্নতা ছিল তাহা সম্প্রদায়ভেদ রূপে, যে জাতিভিন্নতা ছিল তাহা বর্ণভেদ রূপে—যে ভাষাভিন্নতা ছিল তাহা অপভ্রষ্টতা ভেদরূপে পরিণত হইল। আর কিছুদিন এইভাবে চলিলেই যেন সম্মিলনকার্য সর্বতোভাবে সম্পন্ন হয় এমনি হইয়া দাঁড়াইল।'

অষ্টম অধ্যায়ে বোম্বাই-এর নিকটবর্তী অধুনালুপ্ত হস্তিদ্বীপে একটি কৃত্রিম পর্বত গুহাভিতরে তিনটি প্রকোষ্ঠে যে দেবদেবীগণের পাষাণবিগ্রহের বর্ণনা আছে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। ভূদেব-রচনাসম্ভারের সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সত্যই বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলি আর আনন্দমঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্জলি ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।' বিশেষ উদাহরণ হিসাবে বিশী মহাশয় বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলির অষ্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পরিচ্ছেদ পাশাপাশি পড়িলেই বাকি সন্দেহটুকু লোপ পাইবে।'

আমরা এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 'ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র'-শীর্ষক আলোচনায় ঐ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

পুষ্পাঞ্জলির নবম অধ্যায়ে আছে মহারাষ্ট্রীয়গণের কথা। মারাঠা জাতি এবং মারাঠা শৌর্য ভূদেবের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' ভারতের প্রথম সম্রাট হলেন শিবাজীর বংশসম্ভূত রাজা রামচন্দ্র।

মারাঠা জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সহিষ্ণুতা। মারাঠার এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন মারাঠী বীরের মুখে ভূদেব বলছেন,—

'আমরা সহ্য পর্বতনিবাসী। আমরা মহাতপাঃ ভগবান পরশুরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত। আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের অবস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব। সহ্য, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশ স্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না, তপশ্চারী হইয়া বিলাস-কামী হইব না, যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

'কষ্ট স্বীকার সবধর্মের মূলধর্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধান শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির-তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।'

মারাঠা দেশেই মহাদেবী সঞ্জীবনীমূর্তি ধারণ করেছেন, কেননা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখমণ্ডলে একান্ত দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। তাই মার্কণ্ডেয় বলছেন,

'মহাদেবী এইজন্যই এখানে সঞ্জীবনীমূর্তি ধারণ করিয়া আছেন, সহিষ্ণুতাই শক্তির প্রকৃত অনুরূপ। সহিষ্ণুতাপরিহীন কত কত লোক স্বধর্মপরিভ্রষ্ট স্বজাতিচ্যুত হইয়া আপনাদিগের নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের হৃদয়-পাষাণে পূর্বপুরুষদিগের প্রতিমা ক্ষোদিত রহিয়াছে। এখানে সঞ্জীবনী মহাদেবী স্ব-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।'

দশম অধ্যায়ে কুমারিকা-সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পরিক্রমা। এখানে ভূদেবের দার্শনিক মননশীলতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের শিরোনাম 'ধর্মজ্ঞানলাভের পথ—মৃত্যুর স্বরূপদর্শন।'

মহাভারতে বনপর্বে বক-যুধিষ্ঠির সংবাদে বকরূপী ধর্মরাজের শেষ প্রশ্নচতুষ্টয় ছিল—'কা চ বার্তা, কিমাশ্চর্যং, ক পন্থা? কশ্চ মোদতে?' 'পৃথিবীর বার্তা কি, আশ্চর্য কি, পথ কি এবং সুখী কে? উত্তরে জ্যেষ্ঠপাণ্ডবের কণ্ঠে মহাকবি বলেছিলেন,

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন
মাসর্তু দর্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ প্রচতীতি বার্তা ॥

ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলিতে মৃত্যুর কণ্ঠে পুনরায় সেই প্রশ্নচতুষ্টয় উত্থাপিত হলো। মৃত্যু বলছেন, যুধিষ্ঠির কালোচিত প্রকৃত উত্তর প্রদান করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। যুগে যুগে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তার প্রকৃত উত্তর না দিতে পারলে পূর্ণমনোরথ হওয়া যায় না। তাই 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ভূদেবের বেদব্যাস প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে বলছেন,

'সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যুরূপধারী বিধাতা তাহাতে নিত্যনূতন সৃষ্টির বিধান করিতেছেন। জগতের প্রকৃত বার্তা এই।

'পঞ্চভূত পরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে, এবং সেই জীব ক্রমশ পরিণত হইয়া ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃত্যুপতির পালনগুণে এতাদৃশ সমূহ মঙ্গলসাধন হইতেছে, লোকে তাঁহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গল বলিয়া বোধ করে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চয আর কি?

'সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য এই জগতের মধ্যেই নির্বাহিত হয়। মৃত্যুপতি শিবরূপ ধারণ করিয়া মণ্ডলীভূত নাগরাজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতএব বিশ্বকাণ্ড সমুদয়ই বৃত্তাকার পথে নির্বাহিত হইতেছে।

'যে ব্যক্তি, আপনার পূর্বজন্ম ছিল—পরজন্মও হইবে, ইহা নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া, আপনাকে অংশরূপী বলিয়া জানে, এবং অভিমানশূন্য হইয়া অংশধর্ম প্রতিপালন করে, সেই সুখী।'

এই অংশে ব্যাসকণ্ঠে তত্ত্বদর্শী ভূদেব বলছেন, নিত্যনূতন সৃষ্টিই পৃথিবীর বার্তা। মৃত্যুপতি নারায়ণের পালনগুণে জীব ক্রমশ ঈশ্বরত্বের অধিকারী হচ্ছে, অথচ মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে? সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই বৃত্তাকার পথেই বিশ্বকাণ্ড নির্বাহিত। যে ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে বিশ্বাসী হয়ে অভিমানশূন্য হয়ে নিজের ধর্মপালন করে সেই সুখী। জগদ্ব্যাপার সম্পর্কে ভূদেবের এই নবব্যাখ্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার এক সার্থক উদাহরণ।

৬

দশম অধ্যায়ে ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত কুমারিকা পরিক্রমা শেষ করে ব্যাস-মার্কণ্ডেয় ঋষিদ্বয় পূর্ব উপকূল ধরে উৎকলরাজ্যের জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে গঙ্গাসাগর সংগম দিয়ে পূর্বাভিমুখে বঙ্গভূমিতে উপনীত হলেন। বঙ্গভূমির নিসর্গপ্রকৃতি এবং বঙ্গবাসীর চারিত্রধর্মের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভূদেবের স্বদেশচেতনা তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছে। মার্কণ্ডেয় এই পুণ্যভূমির বর্ণনায় বলছেন,

'এই দেশ সিন্ধুগঙ্গা-সংগমজাত।...দেখো দেখো, স্বর্ণদী কেমন আনন্দোৎফুল্লা হইয়া সাগরসংগমে প্রধাবিতা হইয়াছেন এবং অগাধসত্ত্ব মহাসাগর কেমন বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া ভগবতীকে আপনবক্ষে ধারণ করিতেছেন। মহাজ্ঞান ও মহতী-প্রীতির এই সম্মিলনভূমি।'

বঙ্গভূমির অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে মার্কণ্ডেয় বলছেন,

'এই মহাতীর্থবাসের সমস্ত শুভফল এখানকার মনুজগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও চিত্তভূমি মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির সংগমস্থল। সাংখ্যসূত্রপ্রণেতা কপিলদেব অন্যসকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়। কিন্তু অন্য কথায় প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরমপবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের এবং প্রকৃত জ্ঞানমার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

'ফলকথা, সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইঁহাদিগের দেশে পূর্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।'

'এই বঙ্গভূমি সমুদয়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরবিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মবারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল-মূল-শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা ভূলোকের নন্দনকানন। এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্মবশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগর সন্তানদিগকে উদ্ধার করেন নাই?

'কপিলদেবপ্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্র শাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরত থাকিবেন?'

এই জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। 'ইঁহাদিগেরই দেশে পূর্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।' এই প্রসঙ্গে ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনার পরিধি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বঙ্গভূমি। তাই বন্দেমাতরম্ সংগীতে তিনি বলেছেন,

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,
অবলা কেন মা এতো বলে।

এখানে জননী জন্মভূমির সন্তান সপ্তকোটী। বলাই বাহুল্য ইনি বঙ্গজননী। বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় বঙ্গভূমিই তাঁর জন্মভূমি। পক্ষান্তরে ভূদেবের স্বদেশচেতনা সমগ্র ভারতভূমিতে পরিব্যাপ্ত। তাই ভারতপরিক্রমাই তাঁর জন্মভূমি পরিক্রমা। তবে তিনি যেমন এই ভারতভূমির মারাঠার শৌর্যবীর্যকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে তাঁর স্বপ্নলব্ধ স্বাধীনভারতে শিবাজী বংশীয় রামচন্দ্রকেই ভারতের প্রথম সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তেমনি তাঁর দৃষ্টিতে 'বঙ্গভূমি সমুদয়ই মহাতীর্থ। ...ইহা ভূলোকের নন্দনকানন', বঙ্গবাসীর 'চিত্তভূমি মহাজ্ঞান ও মহতী প্রীতির সঙ্গমস্থল।' তাই সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, এই যুগে ভাগীরথীসন্তানগণ তাই করবেন। ভারতমহিমার পুনরুদ্ধার সাধন এঁদের দ্বারাই সম্ভব হবে। বাঙালী ভূদেবের এই বাঙালীপ্রীতি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার পরিচায়ক নয়, পরবর্তীকালে (১৯০৬) গোপালকৃষ্ণ গোখলে যেকথা বলেছিলেন—What Bengal thinks today, India thinks tomorrow—এই সত্যই ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভূদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।

৭

পুষ্পাঞ্জলির তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে কামাখ্যাতীর্থে। ঋষিদ্বয় বঙ্গভূমির পূর্ব প্রান্তে নৌকাযোগে যে নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার নাম কর্ণফুলি। সেখান থেকে তাঁরা পৌছলেন চন্দ্রশেখরে-সীতাকুণ্ডে। তারপর তাঁরা উপনীত হলেন সর্বপ্রধান মহাতীর্থ 'সর্বফলপ্রদ' কামাখ্যাক্ষেত্রে। কামাখ্যাকে ভূদেব বলেছেন মন্ত্রসাধনের তীর্থ। 'এখানে অতি কঠোর তপস্যা করিতে হয়, ইষ্টমন্ত্রের মানসজপ করিতে হয়।' অর্থাৎ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনই কামাখ্যা তীর্থের ইষ্টসাধন। এই ইষ্টসাধনেরই অন্য নাম শক্তিসাধন। 'ইষ্টসাধন করিব—সর্বস্ব বিনষ্ট হয়—হউক, শরীর যায়—যাউক, নাম ডুবে—ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারূঢ় বীরপুরুষেরাই এই মহাসাধনে রত হইতে পারে। ইহা সাক্ষাৎ শক্তিসাধন।'

শরীরপাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বীরপুরুষেরা কিভাবে এই শক্তিসাধন

করবেন সে সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় বলেছেন 'সাধকভেদে অভিষ্ট দেবতার রূপভেদ হয়। বিভিন্ন রূপ দেবতার পূজা পদ্ধতিও বিভিন্ন। তোমার (ব্যাসদেবের) ধ্যানগম্য যে মূর্তি, তাহা এ পর্যন্ত অপর কাহারও ধ্যানগম্য হয় নাই। সুতরাং সেই মূর্তির পূজা এবং সাধনবিধি তোমাকেই স্বয়ং তপস্যাবলে জানিয়া লইতে হইবে।'

এখানেই 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের উপসংহার রচিত হয়েছে। ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির আরেকটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিছু কিছু খসড়াও প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পিত গ্রন্থখানি ভূমিকাতেই অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমাদের মনে হয়, পুষ্পাঞ্জলিতে ভারতপরিক্রমা যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতেই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে। গ্রন্থারম্ভে দেশভক্ত ব্যাসদেব ধ্যানে যে অপূর্ব মূর্তি দর্শন করেছিলেন ভারততীর্থ পরিক্রমা করে তিনি সেই ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির 'প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ' করলেন। এই দেবীর পূজা এবং সাধনবিধি কি হবে দেশভক্ত তাঁর মনোগুহায় প্রবেশ করেই তা অবগত হবেন। কিন্তু সর্বস্বপণ শক্তিসাধনই যে সেই ইষ্টসাধন, এবং তা হবে গুপ্তসাধন, এই ইঙ্গিত করেই ভূদেব তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে ধৃত বন্দেমাতরম্ সংগীতকে বলেছেন মাতৃস্তোত্র। পুষ্পাঞ্জলিও ভূদেবের মাতৃস্তোত্র।

উল্লেখপঞ্জী

ক. স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

১.	ভূমিকা—ভূদেব-রচনাসম্ভার (২য় সং)	পৃ. ৩৪৮
২.	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৫৭
৩.	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৬২
৪.	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৫২
৫.	তদেব	পৃ. ৩৫২
৬.	তদেব	পৃ. ৩৫২
৭.	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৬৪-৬৫
৮.	সপ্তম পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৬৬
৯.	দশম পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৭৯
১০.	তদেব	পৃ. ৩৭৮
১১.	শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড	পৃ. ১৮
১২.	তদেব—ত্রয়োদশ খণ্ড	পৃ. ৩৪২
১৩.	স্বপ্নলব্ধ—তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পৃ. ৩৫৬

১৪. দশম পরিচ্ছেদ পৃ. ৩৭৫-৭৬
১৫. ভূদেবচরিত ২ পৃ ২৮০
১৬. তদেব পৃ ২৮০ ৮১

খ. পুষ্পাঞ্জলি

১ ভূদেবচরিত, প্রথম ভাগ, পৃ ৪০৫
২. তদেব, পৃ ৯০ ৯১
৩. পুষ্পাঞ্জলি, প্রথম অধ্যায, ভূদেব রচনাসম্ভার (২য সং) পৃ ৩৮৮ ৮৯
৪ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কমলাকান্ত, পৃ ৬২
৫. গ্রন্থের আভাস, পুষ্পাঞ্জলি। ভূদেব-রচনাসম্ভার, পৃ. ৩৭৮
৬. দ্বিতীয় অধ্যায, পুষ্পাঞ্জলি। রচনাসম্ভার, পৃ ৩৮৩
৭ ৫ম অধ্যায়, পুষ্পাঞ্জলি। রচনাসম্ভার, পৃ ৪০১

সপ্তম অধ্যায়

ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য

১

বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের স্থাননির্ণয় সহজসাধ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ তাঁর সৃষ্টিমূলক ও মননমূলক রচনাবলীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ভূদেবকে মুখ্যত প্রবন্ধকার এবং প্রবন্ধের আদর্শ গদ্যরীতির স্রষ্টা বলেই সচরাচর বিচার করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথিকৃৎ হিসাবেও তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু সত্ত্বগুণান্বিত চারিত্রধর্ম থেকে অস্খলিত জীবনচর্যায় এই পুরুষপ্রবর তাঁর সমকালীন বাঙালী মনীষিগণের কী গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, বিষয়বস্তু ও শিল্পধর্মে তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকৃতি সমকালীন ও পববর্তী সাহিত্যে কী নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার কবেছিল সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গভীব আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। পরিবার সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে এই স্থিতধী পুরুষের প্রজ্ঞা-প্রসূত চিন্তারাজি সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্যসাধকগণকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তারও পুনর্মূল্যায়ন অসমাপ্ত রয়েছে। তাঁর সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে'র রচনাবলী শুধু সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্রই ছিল না। ভাবীকালের গতিপথ নির্ণয়েও সেগুলি আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। ভূদেব ছিলেন জাতির শিক্ষাগুরু। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ জীবনচর্যার তিনি ছিলেন অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক। তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্য-চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী মনীষার উজ্জ্বল উদাহরণ। হিন্দুমুসলমানের মিলিত অখণ্ড ও সমগ্র ভারতের উন্নয়ন ও উজ্জীবনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বলা অন্যায় হবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূদেবই ছিলেন উদারতম ভারতপথিক। অথচ ভূদেব সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, তিনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল হিন্দু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূদেব সর্বেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ফরাসী দার্শনিক কোঁতের ধ্রুবদর্শন বা Positivism-এর সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'মনুষ্যসমাজের প্রতি সহানুভূতিমূলক যে ধর্ম তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ, যথা বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বসৌন্দর্য প্রভৃতি অত্যুদার ভাবসকল মনুষ্যহৃদয়ে অধিষ্ঠিত এবং যখন দেখা যাইতেছে যে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, অপাপবিদ্ধত্ব প্রভৃতি

গুণলক্ষণে লক্ষিত মনুষ্যের উপাস্যবস্তু সর্বময়রূপেই বিদ্যমান, তখন পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ-বিচুর্ষিতাঙ্গ আংশিক এবং কাল্পনিক একটি নরদেব পূজায় মানববুদ্ধি এবং মানবহৃদয়ের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমার বোধ হয় যে সর্বেশ্বরবাদই পৃথিবীতে ক্রমশ বিস্তৃত হইবে।'[১] মনুষ্যসমাজের প্রতি সহানুভূতিমূলক এই ধর্মকেই ভূদেব সমাজরক্ষার প্রধান সহায় বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 'মনুষ্যশিশুর পক্ষে পিতামাতাও যাহা, মনুষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি ও পুষ্টি হয়।...যে সকল লোকের ধর্ম ও ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।'[২]

ভূদেব বিশ্বাস করতেন, 'স্বদেশ-চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত বিভেদও ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একদেশবাসী হইলে ক্রমশ একধর্মাবলম্বী হইতে পারে।'[৩] ধর্মের মতো ভাষাগত সম্মিলনও সম্ভব ও শুভংকর বলে ভূদেব মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষীয় চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি—হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোনো দূরবর্তী ভাবীকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত হইবে।'[৪]

স্বদেশ সম্পর্কে ভূদেবের গর্বের অন্ত ছিল না। তিনি বলেছেন, 'পূর্বকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে।'[৫] 'ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা। ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল।'[৬]

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'কর্তব্য নির্ণয়' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ভারতসমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ দুইটি উপস্থিত হইয়াছে। এক, বিদ্যাহীনতা। অপর ধনহীনতা।'[৭]

বিদ্যাহীনতার আলোচনায় তিনি বলেছেন—'শিক্ষা দুই প্রকারের। এক প্রাথমিক শিক্ষা, অপর উচ্চশিক্ষা, তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই যে, এদেশে বহু পূর্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলৎ ছিল, উহা এখন তাহা হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই।' 'প্রাথমিক শিক্ষা তো বিস্তারে বাড়ে নাই, গভীরতায় কিছু ন্যূন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।' 'দেশের শিক্ষকবর্গ

তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহাদিগের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য এবং উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করাই এক্ষণকার একটি প্রধান কর্তব্য। ভারতসমাজ রক্ষার উপযোগী অপর কোনো কার্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না।'

'বিদ্যাহীনতার পরিহারার্থে সমাজের করণীয়' সম্পর্কে ভূদেব-নির্দেশিত কৃত্য হলো : (১) দেশীয় শাস্ত্র শিল্পাদির প্রগাঢ় চর্চা, (২) ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, (৩) শাস্ত্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন, এবং (৪) রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন।'[৮]

ভারতের ধনহীনতার হেতুনির্দেশে ভূদেব বলেছেন 'দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে।' অতএব ধনহীনতা পরিহারের উপায় সম্পর্কে ভূদেবের মত হলো : (১) বিলাসিতার পরিহার, (২) অকার্যে অর্থব্যয় পরিহার, (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব, (৪) দেশীয় সালিসের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, (৫) যৌথ কারবারের দ্বারা শিল্পের বাণিজ্যের উন্নতি।'[৯]

শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে ভূদেবের এই চিন্তা শুধু পরিচ্ছন্নই নয়, অভ্রান্তও বটে। ভূদেবের এই চিন্তারাজি পরবর্তী চিন্তানায়কগণকে কিভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তা বিশেষভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের প্রধান কীর্তি তাঁর পরিশীলিত গদ্যরীতি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবকে বলেছেন—One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style. আমরা এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব সম্পর্কে যখন এই প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন তখনও ভূদেবের সাহিত্যসাধনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পরে দুই দশকের অধিককাল ধরে ভূদেব নিরলস সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। এই দীর্ঘকালের সাধনায় তাঁর গদ্যরীতি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা একান্ত কর্তব্য যে, ভূদেবের সৃষ্টিমূলক রচনার গদ্যরীতি আর তাঁর চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলীর গদ্যরীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ ধরে বিবর্তিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা প্রথমে ভূদেবের সৃষ্টিমূলক রচনাবলীর গদ্যরীতির বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করব।

সফল স্বপ্ন (১৮৫৭)

'একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর-বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ বল্গামুক্ত করিয়া দিলেন, এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্যকিরণ প্রায় সর্বতোভাবেই আচ্ছাদিত, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন উহারা উপরিস্থ পূর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বনহস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তিসুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলত, বিধাতা নিভৃত নির্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন।' এই গদ্যরীতি যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে অনুসৃত হয়েছে তার প্রমাণ দুর্গেশনন্দিনীর প্রারম্ভ অনুচ্ছেদেই পাওয়া যাবে।

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।'

'সফল স্বপ্ন' থেকে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ভূদেবের মৌলিক সৃষ্টিপ্রতিভা আরেক পদ অগ্রসর হয়েছে। ভাষাও হয়েছে অধিকতর রসাত্মক।

অঙ্গুরীয় বিনিময়। (১৮৫৭)

'দিল্লীশ্বরের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্‌খাস্‌। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত। ··একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপবিভাগে আরঙ্গজেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদশাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিনবস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ স্বর্ণময়, তন্নিম্নে অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে।· আরঙ্গজেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল, দান্তস্বভাব, কুটিল বুদ্ধি এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্তী কতকটা ভাগ রজত-বেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওম্রা ও রাজা এবং রাজপ্রতিভূগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া নতশিরা হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চন্দ্রাতপ স্বর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে। বেইলের বহির্ভাগে আব যাবৎ স্থান, তাহাতে মনসবদার প্রভৃতি যোদ্ধকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদমর্যাদানুসারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আম্‌খাসের বহির্দেশে এবং রাজ-তক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাম্বু উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম। চতুর্দিক যেন ফল ফুল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নানা কার্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসম্ভাষণের কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

—অষ্টম অধ্যায়।

ভূদেব-রচনাসম্ভারের সম্পাদক বলেছেন, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে বর্ণিত আরঙ্গজেবের রঙমহলের বর্ণনা রাজসিংহের বর্ণিত ঐ প্রসঙ্গকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াও মনে হয়।'

এই প্রসঙ্গে মহাকবি মধুসূদন বর্ণিত রাবণের রাজসভার বর্ণনার কথাও মনে পড়ে।

সফল স্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয় বিনিময় কথাসাহিত্য। সুতরাং গল্পরসই সেখানে মুখ্যরস। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' কল্পনাভূয়িষ্ঠ রচনা হলেও তা ইতিবৃত্তের এলাকাভুক্ত। কিন্তু ভূদেব তাঁর প্রবন্ধমালা রচনায় যে প্রাঞ্জল গদ্যরীতি অবলম্বন

করেছেন 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র গদ্যরীতি তা থেকে স্বতন্ত্র। গ্রন্থের উপসংহারের কয়েকটি অংশ উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত হলো :

'নিশান্ধকার অপগত, পূর্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মর্ত্যভূমিতে অবস্থিতি করিতে পারি না। কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া যাই। কালপুরুষ, সূর্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময় পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য হই।

'আমার নাম আশা। ঊষা আমার ভগিনী, আমি ঊষাসহ মিলিত হইতে চলিলাম।'

বলাই বাহুল্য, এই অলংকৃত ভাষা ইতিবৃত্তের ভাষা নয়। ভূদেব 'আশার' মুখে ভারতের যে স্বপ্নোপম ইতিহাস রচনা করেছেন তাতে প্রজ্ঞার চেয়ে কল্পনার স্থানই বেশি। ভাষাও তাই অলংকৃত এবং কল্পনাসমৃদ্ধ।

এই অলংকৃত ও কল্পনাসমৃদ্ধ ভাষা পুষ্পাঞ্জলিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। পুষ্পাঞ্জলির মতো কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া অন্য কোনো গদ্যসন্দর্ভ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। পুষ্পাঞ্জলিকে আমরা বলেছি ভূদেবের স্বদেশপুরাণ। ভূদেব তাঁর সামাজিক প্রবন্ধে বলেছেন, 'পুরাণগুলিকে অলীক কাব্যরচনামাত্র মনে করা ভুল। উহারা কাব্য বটে কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্য।' পুষ্পাঞ্জলিও 'ঐতিহাসিক কাব্য', তাই গদ্যে রচিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভাষা পুষ্পিত ও কাব্যসুরভিত। নিম্নে পুষ্পাঞ্জলির কবিত্ব-সমৃদ্ধ ভাষার কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত হলো।

১. ব্রাহ্মণেরা মাড়বার ও সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরবর্তী একটি বাণিজ্যবন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বন্দরে নানাদেশীয় লোক সমাগত হইয়া নানাকার্যে ব্যাপৃত। রাজপথ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ। গৃহসমস্ত যেন মধুচক্রের ন্যায় অবিরত অস্ফুটস্বরে স্বনিত। নীলাভ সমুদ্রজল বহুদূর পর্যন্ত অর্ণবযান এবং নৌকাবৃন্দে পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল অর্ণবযানকে কূল হইতে দেখিলে বিহগকুল বলিয়া অনুভূত হয়—কতকগুলি যেন পক্ষবিস্তার করিয়া নীড়াভিমুখে আসিতেছে, কতকগুলি যেন নীড়ত্যাগ করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইতেছে। কোনো কোনোটি যেন উড্ডয়নারম্ভে পাখঝাড়া দিতেছে। কোনো

কোনোটি গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া পক্ষসঙ্কোচপূর্বক আপন স্থান খুঁজিয়া বসিতেছে এবং নৌকাবৃন্দ তাহাদিগের শাবকসমূহের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া বেড়াইতেছে।'

—সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

২. 'বৃদ্ধ কহিলেন 'আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা—পুরুষ এবং প্রকৃতি ইহারা যে দেশে যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশে মনুষ্যেরা সেইরূপ ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করে। যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহ্বায়ত ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রকূলবর্তী সুতরাং আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্বতময়, সুতরাং পৃথিবী-বক্ষ উল্লসিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে স্বর্গারূঢ় হইতে পারেন, এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান তথায় ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুষ্যের স্বর্গারোহণ করা, এই উভয়প্রকার ধর্মতত্ত্বই লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে।'

—সপ্তম অধ্যায়, একাদশ অনুচ্ছেদ।

৩. 'মধ্যবয়া কহিলেন—'এখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিতেছি। পশ্চিমদিকে অতি প্রশস্ত মূর্তি। বীচিসকল ধীরে ধীরে আসিয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। সমুদ্র যেন সুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। শংখ শম্বুকাদি বিচিত্রবর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণী কেমন ধীরে ধীরে তীর বাহিয়া উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্র যেন চিত্রময় বস্ত্রাবরণের দ্বারা পৃথিবীকে আবৃতা করিতেছেন। দক্ষিণে ওরূপ ভাব নহে। পৃথিবী সুপ্তোত্থিতা যুবতীর ন্যায় উন্নতমুখী হইয়া বসিয়াছেন এবং সমুদ্র তাঁহার গলদেশে যে তরঙ্গমালা পরাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন। কত প্রকার মৎস্য মকরাদি সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কত উড্ডীন মৎস্য পক্ষবিস্তার পূর্বক ঝাঁকে ঝাঁকে জল হইতে লম্ফ দিয়া উঠিতেছে এবং শতাধিক ধনু দূরে গিয়া আবার জলমগ্ন হইতেছে। পূর্বদিকে কি ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে! সমুদ্রোর্মিসমস্ত পিনাকপাণির অনুচর পিশাচবর্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতেছে, যেন প্রতি উল্লম্ফনেই পৃথিবীকে প্লাবিতা এবং রসাতলগামিনী করিবে।"

—দশম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

ভূদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অভাব নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিপরম্পরাগ্রথিত প্রসাদগুণান্বিত প্রাঞ্জল প্রবন্ধের আদর্শ ভাষা হিসাবে ভূদেবের গদ্যরীতি সর্বজনস্বীকৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধু-গদ্যরীতির উদ্ভব ও বিবর্তনে ভূদেবের গদ্যরীতিই যেন বিবর্তনের শেষসীমা। আর সেই রীতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে সামাজিক প্রবন্ধে। তাই সামাজিক প্রবন্ধ থেকেই দুটি দৃষ্টান্ত সংকলন করে আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার রচনা করতে চাই।

'উপসংহারে বলি। সমাজ মনুষ্যের সম্মিলনজাত। সুতরাং অন্তঃসম্মিলন যত দৃঢ় হইবে, সমাজ ততই সবল হইবে, এবং উহার ক্রিয়াশক্তিও ততই বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহানুভূতির বৃদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্মের বৃদ্ধি হইতে। অতএব যেখানে যতদিন যতদূর ধর্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজেরও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাকে। সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ কল কৌশলের সৃষ্টিতে হয় না, শুদ্ধ সস্তা দরে উপভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারিলেও হয় না, আর ধনের অতিশয় বৃদ্ধিতেও হয় না, মৌখিক সাম্যভাবের বিস্তারেও হয় না, আর আত্মমুখে আত্মগরিমা স্থাপন করিলেও হয় না। যে সমাজে মনুষ্যের চিন্তাদর্শ যত উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎসাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত চেষ্টা, সে সমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থ, ধর্মনিষ্ঠ এবং উন্নতিশীল'
—পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা।

২. 'মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে অপরটি অগ্রসর হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্বেরটি অগ্রবর্তী হয়। অতএব গমনরূপ একটি কার্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটিই বিদ্যমান থাকে। জীবনবর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তিপ্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তিপ্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্তপ্রবহণ ব্যাপারে সঙ্কোচন এবং প্রসারণরূপ বিপরীত উভয় কার্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষাও ঐ প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্মরূপে বহির্ভাগে

আইসে। ফলত জগতের সকল বস্তুতেই দুইটি পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে।'

—পাশ্চাত্যভাব—ঐহিকতা

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে, ভূদেবের গদ্য শুধু যুক্তি-পরম্পরা-গ্রথিতই নয় এবং প্রাঞ্জলতাই তার প্রধান গুণ নয়, গতিশীলতা অর্থাৎ চিন্তাভাবনাকে পদে পদে এগিয়ে দেওয়াই তার ধর্ম। ভূদেবের মুক্তমানসেরই যথার্থ বাহন তাঁর ঋজু, শুভ্র, সবল ও সুন্দর গদ্যরীতি।

ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র

ভূদেব বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পথিকৃৎ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা করেই তাঁর অপূর্বসুন্দর কথাসাহিত্যের সূত্রপাত করেন। স্বভাবতই ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কি না এ জিজ্ঞাসা মনে উদিত হয়। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূদেব সম্পর্কে বলেছেন,

১. অঙ্গুরীয় বিনিময় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস-জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূল সুর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী।'

২. এই উপন্যাসে 'ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা এবং কল্পনারসের সিদ্ধি যুগপৎ সম্পাদিত হইয়াছে।'

৩. গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ আকর্ষণ রোসিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবজী-রোসিনারার প্রণয়সঞ্চার, দিল্লীতে বন্দী-অবস্থায় অবস্থান কালে শিবজীর তাঁহার নিকট বিবাহপ্রস্তাব ও রোসিনারার মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় এই প্রেমের প্রত্যাখ্যান—এই সমস্ত আবেগপ্রধান ও গৌরবময় দৃশ্য লেখকের কল্পনা-উদ্ভাবিত। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ সৃষ্টি ও চরিত্রচিত্রণ এবং গার্হস্থ্য জীবনের তথ্যবন্ধনমুক্ত অথচ ভাবসত্য নিয়মিত, রসসিক্ত ও মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ, সংযোজক ঘটনাবলীর সুষ্ঠু বিন্যাস ও সমন্বয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা।'

৪. 'ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই প্রাণরহস্যটি নিজ সহজ ঔচিত্যবোধ ও ইতিহাস জ্ঞানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন।'

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে প্রাণরহস্য ধরা পড়েছে এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস', তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' এবং তাই শিল্পরূপে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে।

দুর্গেশনন্দিনী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের 'আইভান হো'র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ ঘটবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন একথাও অস্বীকার করা যায় না। ভূদেব-রচনাসম্ভারের সম্পাদক বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয়কাহিনীর চিত্রমূল শিবাজী ও রোশিনারার প্রণয়কাহিনী। শিবাজী ও জগৎসিংহের মধ্যে মিল অধিক না হইতে পারে কিন্তু রোশিনারা ও আয়েষার মিল স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।'

ভূদেব অবশ্য বাদশাহ-দুহিতা ও শিবাজীর প্রণয়কাহিনী 'রোমান্স অব হিস্টরি' থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু একজন বিদেশী লেখকের পক্ষে তার বর্ণাঢ্য আলেখ্য রচনা যতটা সহজসাধ্য ছিল, ভূদেবের পক্ষে নিশ্চয়ই ততটা ছিল না। তাই তিনি মূল ইংরেজী কাহিনীকে এদেশীয় সমাজমানসের অনুকূল করেই পুনর্বিন্যস্ত করেছেন। তবু ভূদেব এই প্রেমের মহিমা বর্ণনায় যে উদারভাব পরিচয় দিয়েছেন তা বোধ হয় বঙ্কিমের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা জগৎসিংহকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু উভয়ের মিলনের পথে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। তাদের মাঝখানে তিলোত্তমা ছিল বলেই যে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়, ধর্ম ও সমাজের অলঙ্ঘনীয় বাধাও সেখানে ছিল। তাই আয়েষার অঙ্গুলিতে যে অঙ্গুরীয় ছিল তার মধ্যে প্রেমের সঞ্জীবনীসুধা ছিল না, ছিল প্রাণহন্তারক গরল। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহে উপস্থিত হয়ে আয়েষা তিলোত্তমাকে শুধু রত্নাভরণই পরিয়ে দেয়নি, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্নও উপহার দিয়ে এসেছে। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তার মনে হয়েছিল হীরক-অঙ্গুরীয়ের আধারে রক্ষিত বিষ পান করে জীবনের সকল তৃষা নিবারণ করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে হল 'যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?' সারাজীবন-ব্যাপী এই বিরহযন্ত্রণা বক্ষে ধারণ করেই আয়েষা সাহিত্যসংসারে শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন। দুর্গেশনন্দিনীর এই উপসংহার অবশ্যই শিল্পসম্মত। কিন্তু ভূদেব শিবাজী-রোশিনারার আপাত বিচ্ছেদময় প্রেমকে পরলোকে পুনর্মিলনের প্রত্যাশায়

বেদনামুক্ত করে তুলেছেন। শিবাজী যখন বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন তখন রোশিনারার দিক দিয়ে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রেম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার বশীভূত ছিল না। প্রিয়তমের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই ছিল তাঁর ঈপ্সিত। ভূদেব প্রেয়োবোধের চেয়ে শ্রেয়োবোধকে প্রাধান্য দিয়ে প্রেমকে রোমান্সের কুসুমিত রাজ্য থেকে এক মঙ্গলময় আদর্শলোকে উন্নীত করেছেন। ভূদেব শিবাজীর গুরু রামদাসের কণ্ঠে এই প্রেমের মহিমা বর্ণনা করে বলেছেন 'যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণা নহেন। মহারাজ! আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহকন্যাই আপনকার সহধর্মিণী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই।'

উপন্যাসের এই অন্তিমবাক্যে ভূদেবের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রামদাস স্বামী হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলছেন, 'যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তাহলে পরজন্মে এই বাদসাহকন্যাই হিন্দুকুলতিলক শিবাজীর সহধর্মিণী' হবেন। এখানে ভূদেবের দৃষ্টিতে কল্যাণময় প্রেমের মিলনে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সংস্কার কোনো বাধাই সৃষ্টি করেনি। বরং এই মিলন শাস্ত্রসম্মত বলেই বিঘোষিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে অচলপ্রতিষ্ঠ ভূদেব যদি রক্ষণশীল হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে এই মিলনের কল্পনা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। এখানে সমাজচেতনায় ভূদেবকে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও প্রগতিশীল বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ভূদেবের প্রভাব অবিসংবাদিত ভাবে ধরা পড়েছে আনন্দমঠে। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের যে উদাত্ত স্তোত্র রচনা করেছেন তার প্রেরণামূলে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' যে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। ভূদেব-রচনাসম্ভারে সম্পাদক যে সাদৃশ্যের কথা বলেছেন, আমরা প্রথমেই সেই সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

পুষ্পাঞ্জলির অষ্টম অধ্যায়ে ভূদেব লুপ্ততীর্থ হস্তিদ্বীপে দেবমূর্তির বর্ণনায় বলছেন: 'এই বলিতে বলিতে তাঁহারা একটি পর্বতগুহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, গুহাটি কৃত্রিম একটি প্রকাণ্ড পাষাণ কাটিয়া নির্মিত। উহার তিনটি প্রকোষ্ঠ।

'প্রথম প্রকোষ্ঠে একটি প্রকাণ্ড পাষাণমূর্তি। মূর্তিটি ত্রিশিরস্ক—চতুর্হস্ত সমন্বিত।

'বৃদ্ধ কহিলেন—'শিল্পকার কেমন নৈপুণ্য সহকারে সত্ত্বরজস্তম স্বরূপ গুণত্রয়ের সম্মিলন-জাত মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্য মুখটি ব্রহ্মার। তাঁহার দক্ষিণে এবং বামে বিষ্ণু এবং শিবের মুখ।'

'মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হাত চারটির অধিক নাই কেন ?

'বৃদ্ধ উত্তর কবিলেন—বিশ্বরূপ ভগবানের কোটি কোটি মুখ ও কোটি কোটি হস্ত। কিন্তু মনুষ্যেব যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মূর্তিমান করিয়া দেখাইতে হইলে চাবিহস্ত সমন্বিত কবিযাই দেখাইতে হয। মনুষ্যবুদ্ধিতে ভগবান আবাশ কাল, জ্ঞান, জীবনের আধাব বলিযাই প্রতীযমান হযেন। এইজন্য তাঁহাকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধাবী চতুর্ভুজরূপী কবিযাই প্রকাশিত করিযা থাকে।

ব্রাহ্মণেবা মন্দিবেব দ্বিতীয প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কবিলেন। সেখানে তিনটি প্রস্তরময মূর্তি দৃষ্ট হইল। একটি শিবেব একটি পার্বতীব এবং একটি কামদেবের।

'বৃদ্ধ কহিলেন—'এ স্থলে কামদেবরূপী গাঢ়তমপ্রেম শিবরূপী পুরুষকে পার্বতীরূপা প্রকৃতিব সহিত উদ্বাহবন্ধনে সম্বদ্ধ কবিতেছেন। ত্রিগুণময পুরুষ হইতেই সৃষ্টি হয না। সৃষ্টিকাযেব এই দ্বিতীয প্রকবণ।'

'ব্রাহ্মণেবা গুহাব তৃতীয প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায পাষাণময অর্ধনাবীশ্বরমূর্তি—তাহাব দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্ষ্মীসেবিত কার্তিকেয।

'বৃদ্ধ কহিলেন—'প্রকৃতি এবং পুরুষের—শক্তি এবং শিবেব গতি এবং জড়েব সম্মিলনসাধন হইযা সৃষ্টিকায সম্পন্ন হইযাছে। শিল্পকাব গণেশরূপী ব্রহ্মাকে স্থূলদেহ, পশুমুখ এবং লম্বোদব কবিযা তিনি যে সর্বাগ্রপূজ্য ভক্ষ্যগ্রহণেব অধিষ্ঠাতা, তাহা কেমন সুস্পষ্ট প্রদর্শন কবিযাছেন। কার্তিকেয মূর্তিকেও সুন্দবীসেবিত অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং বিক্রমশালী যুদ্ধবিশারদরূপ মূর্তিমান কবিযা তিনি যে স্ত্রীসংসর্গাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, তাহাও কেমন মূর্তিমান করিযাছেন। বাস্তবিক স্পন্দনশক্তিসম্পন্ন জড়ের প্রথমজাত ধর্ম ভক্ষ্যগ্রহণ এবং দ্বিতীযজাত ধর্ম দাম্পত্য। এইজন্য গণেশ এবং কার্তিকেয হবগৌবীব সন্তান।'

'এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ঐ প্রকোষ্ঠেব প্রান্তভাগে গমন কবিলেন, এবং তথায অপব একটি পাষাণমূর্তিব প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক কহিলেন—'সৃষ্টিকায দেখিলে, এক্ষণে সংহাবকার্য কেমন সুকৌশলে মূর্তিমৎ হইযাছে দেখ। রুদ্ররূপী মহাদেব যজ্ঞোপবীত পবিত্যাগ কবিযা অস্থিমালা ভূষণ কবিযাছেন, যে হস্তে বরদান ছিল তাহা শৃঙ্গ ধারণ করিযাছে। যে ত্রিশূলের অগ্রভাগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহা বক্র হইয়া খড়্গরূপ হইযাছে, যে হস্তে অভযদান ছিল, তাহা ত্রিপুরাসুবের কেশে বদ্ধমুষ্টি হইযাছে। ত্রিপুরবধ হইতেছে, সত্বরজস্তমোগুণের সম্মিলন ভঙ্গ হইতেছে। বার্ধক্যমূর্তিই প্রচণ্ড মহাকালমূর্তি।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে ভূদেবের এই বিগ্রহবর্ণনার দ্বারা যে অনুপ্রাণিত

হয়ে‌ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিগ্রহদর্শন করলেন—

'ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভ শোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শন-চক্র, ঘূর্ণমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটব স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মীসরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মীসরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষরক্ষ, তাঁহাকে পূজা করিতেছে।'

বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এই মোহিনী মূর্তিপ্রদর্শনের পর সত্যানন্দ ত্রিকালবর্তী মায়ের ত্রিমূর্তি দেখালেন। প্রথমে তাঁর জগদ্ধাত্রী মূর্তি—মা যা ছিলেন। তারপর মায়ের কালিকামূর্তি—মা যা হয়েছেন, এবং সবশেষে দশভূজা দুর্গামূর্তি—মা যা হবেন। ভূদেব তাঁর পুষ্পাঞ্জলিতে দেশজননীর এবং ত্রিকালবর্তী মূর্তিরও পরিচয় দিয়ে ছিলেন। মাতৃমূর্তির ধ্যানে উভয়ের বৈষম্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃস্তোত্র রচনা করেছেন তিনি হিন্দুর উপাস্য দেবী দশভূজার সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু ভূদেবের মাতৃমূর্তি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী।' ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির প্রথম অধ্যায়েই জন্মভূমির যে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর সৌন্দর্যের পরিসীমা নেই। 'তাঁর পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য—অঙ্গের কি জাজ্জ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি।' 'অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন।'

'পুষ্পাঞ্জলি আর আনন্দমঠে পার্থক্য এই যে পুষ্পাঞ্জলি স্বদেশপ্রেমাত্মক আধুনিক পুরাণ, আর আনন্দমঠ স্বদেশপ্রেমাত্মক আধুনিক উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিমমানসে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি'র পরিকল্পনা যে গভীরভাবে মুদ্রিত ছিল তার আরেকটি প্রমাণ রয়েছে গ্রন্থদ্বয়ের উপসংহারে।

পুষ্পাঞ্জলির উপসংহারে মহাজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় দেশভক্ত মহাকবি বেদব্যাসকে বলেছেন 'এই ব্রহ্মপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পর্বতোপরি আরোহণ করিবে।

উহার শিরোভাগে ঐ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে। কামাখ্যা মন্দির দূর হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভাব-গুহামধ্যস্থিত।'

আনন্দমঠের উপসংহারেও মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বলছেন, 'চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয় শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব।'

এই মাতৃমূর্তি রচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যের মহত্তম কীর্তি। আর, স্বীকার করতেই হবে যে এই সারস্বত কীর্তি রচনায় ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরি।

ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথ

১

ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস বা পুষ্পাঞ্জলির প্রভাব বঙ্কিমমানসকে কিভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল তার আলোচনা করা হয়েছে। ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম এক অভিন্ন প্রেরণামন্ত্রে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে শিষ্য গুরুর কাছে কি শিক্ষাগ্রহণ করলেন তার সারতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে বলছেন, মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। তাদের নাম বৃত্তি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাই মানুষের ধর্ম। সে ধর্ম নিরীশ্বর নয়। কেননা মানুষের বৃত্তিনিচয়ের উপযুক্ত অনুশীলন হলে তারা ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, তাই সর্বভূতে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নেই, মনুষ্যত্ব নেই, ধর্ম নেই। এই প্রীতি সোপান-পরম্পরায় ক্রমোন্নীত হয়ে ঈশ্বরপ্রীতিতে পর্যবসিত হয়। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। তার মধ্যে মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করে ধর্মতত্ত্বের অন্তিমবাক্যে বলেছেন, 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'

ভূদেব প্রায় একই ভাষায় তাঁর সামাজিক প্রবন্ধের উপসংহারে বলছেন, 'জাতীয়-ভাব সম্বন্ধে আমাদের বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রসকলের প্রকৃত ধর্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতি সোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়।

'জাতীয় ভাবটি হৃদয়োন্নতি সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি

অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূলকথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এত পর্যন্ত। আবার, পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগষ্ট কোমটির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—সরলমনা যীশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহা আর্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যেরা তাহারও উপরে অবাঙমনসোগোচরে, আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।

'ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়া তাহার নিম্নতন যে জাতীয় ভাব সেটি আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইয়াছে। · ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন ...। ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাহার স্বজাতিবাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর তৎপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি এসব মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব প্রায় সমকালেই বিরচিত। গ্রন্থাকারে অবশ্য ধর্মতত্ত্ব আগে (১৮৮৮) এবং সামাজিক প্রবন্ধ পরে (১৮৯২) প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভূদেব পুষ্পাঞ্জলিতে পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

পরবর্তীকালের সমাজ ও স্বদেশচিন্তা ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ ও স্বদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। সামাজিক প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ ও স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনাবলী অভিনিবেশ-সহকারে পড়লে সাহিত্যের ঐতিহাসিককে বলতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশভাবনায় অনেকাংশেই ভূদেবের সার্থক উত্তরসূরি।

আমরা প্রস্তাবনাতেই দেখেছি যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ভূদেবের যোগাযোগ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূদেবকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভূদেবের আত্মিক যোগাযোগ কিভাবে ঘটেছিল তা নির্ণয় করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে ভূদেবের নামোচ্চারণ একাধিকবার করেন নি। কিন্তু এডুকেশন গেজেটের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা ভূদেব করেছেন। প্রভাতসংগীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রভৃতি গ্রন্থের বিশদ আলোচনা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। পরিশিষ্টে ভূদেবের রবীন্দ্র-আলোচনার এই সব উদাহরণ সংকলিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ভূদেবই প্রথম কবি-রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন 'প্রভাতসংগীত' প্রসঙ্গে। ভূদেব রবীন্দ্রনাথকে 'আর্য কবি' বলে উল্লেখ করে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।

ভূদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যোগাযোগ কত অন্তরঙ্গ ছিল তা জানার আর উপায় নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, এবং পুষ্পাঞ্জলি অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন তার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁর গদ্য ও কাব্যরচনায় ছড়িয়ে আছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভূদেবেরই অনুরূপ। ভূদেব 'জাতীয় ভাব—ঐতিহাসিক প্রকৃতিভেদ' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জাতিভেদে সর্বপ্রকার সাহিত্যরচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়।'

'ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলিতে গ্রীকদিগের এবং তদনুকারী রোমীয়দিগের ইতিহাসই বুঝেন,…গ্রীক এবং রোমীয়েরা বিশিষ্টরূপেই স্বদেশবৎসল ছিল। স্বদেশবাৎসল্যই তাহাদিগের মুখ্য ধর্ম। তাহারা ঐ সূত্রে আপনাদিগের ইতিহাস-মালিকা সমস্ত অতি সুন্দররূপেই গ্রথিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা।

'ভারতবাসীদিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় গ্রীক বা ইউরোপীয়দিগের ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, একথাও অসঙ্গত। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থ না থাকিলেও যে জাতীয় ভাবের অসদ্ভাব বুঝায় সে কথা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাস আছে।'

'পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়া চলে

না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তরতা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বিজাতীয়ের অনুকরণ মাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন সমাজের সম্যক্‌ শুভসাধন হইতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। ...ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিকস নাই, সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।'

'য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক।'

'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।'

'বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।·· ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরাদন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।'

ভূদেব তাঁর সামাজিক প্রবন্ধের প্রথমেই এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্বত, উষর ভূমি এবং উর্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা, জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্বাকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে—ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। ফলত এইটিই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অনন্যদেশসাধারণ একটি বিশিষ্ট ভাবের অনুষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না। ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটি চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে।'

ভারতবাসীরা 'পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার

করিয়া লইতে পারে'—ভূদেবের এই ভারতচেতনাই রবীন্দ্রনাথের কবিভাষায় অনবদ্য রূপ লাভ করেছে।

ভূদেব তাঁর সামাজিক প্রবন্ধের উপান্ত অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন—'কর্তব্যনির্ণয়—নেতৃপরীক্ষা।' তিনি বলেছেন, 'যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাঁহার কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়। (১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি-প্রয়াসী হইবেন। (২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলনসাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্যদিগের প্রদত্ত সমুদয় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। (৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণ-গুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা, এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরই সম্মিলন থাকিবে।'

রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে অনুরূপ এক মহাপুরুষেরই ধ্যান করেছিলেন। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন,

'শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুঝিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম সেইটাই পতনের উপত্যকা।

'আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই, তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরেজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন, আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিকরে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন, এব বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ দেশের যিনি উন্নতি করিবেন এই অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।'

২

ভূদেবের স্বদেশচিন্তা পরবর্তীকালে কী নিগূঢ় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে তার আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু শুধু চিন্তামূলক সাহিত্যেই নয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সারস্বত সৃষ্টি—তাঁর কবিতা ও গানের ভাব ও ভাষা কিভাবে ভূদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তা লক্ষ্য করলেও বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' শিবাজীর বংশধর রামচন্দ্রের রাজসভার প্রথম-অধিবেশনের ঘোষণাবাণীতে বলা হয়েছে, 'আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।'

স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি মনে পড়বে। এই কবিতার পূর্বনাম ছিল 'মাতৃ-অভিষেক'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,

সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

ভূদেব বলেছিলেন 'আমাদের জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ' হয়ে এসেছে। আজ 'ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত' হয়ে সেই বিবাদানল 'শান্তিজলে অভিষিক্ত' করবেন। রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেকে'র উপান্ত স্তবকে ভূদেবের 'অন্তর্বিবাদানল'ই 'হোমানলে' পরিণত হয়েছে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্ত-শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।

বলাই বাহুল্য, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘোষণাবাণীর স্থানে অনায়াসেই রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতাটিকে বসিয়ে দেওয়া যায়।

৩

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস কিভাবে ভূদেবের কাব্যসুরভিত গদ্যের রূপকে-রূপকল্পে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে তারই নমুনা হিসাবে দুটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

এক॥ 'পুষ্পাঞ্জলি'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজস্থানের অন্তর্গত অর্বলী পর্বতশ্রেণীর অভু নামক সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে চারিদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ঋষিদ্বয় যা দেখলেন তার বর্ণনায় বেদব্যাস বলছেন,

'আমার বোধ হইতেছে যে, প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধীভূতা পৃথিবী পুনরুজ্জীবিতা হইলে তাঁহাকে ঐরূপ দেখায়। ধরিত্রী যেন অম্বরমণ্ডলের প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিপাতপূর্বক সদ্যোজাতা কুমারীর ন্যায় বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিমাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।'

এই অসামান্য গদ্যকাব্যাংশে ভূদেব 'দগ্ধীভূতা পৃথিবীর পুনরুজ্জীবিতা' রূপের যে উৎপ্রেক্ষা রচনা করেছেন তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অহল্যার প্রতি' (মানসী) কবিতার বাক্‌প্রতিমাটি গড়ে তুলেছেন। ভূদেব বলছেন, ধরিত্রী যেন, (১) 'অম্বরমণ্ডলের প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিপাতপূর্বক' (২) 'সদ্যোজাতা কুমারীর ন্যায়' (৩) 'বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিমাস্বরূপ' হয়ে রয়েছেন। 'অহল্যার প্রতি' কবিতার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—,

দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ।...
সমস্ত সংসার...বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়,
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চিরপরিচয়মাঝে নব পরিচয়।

এই ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য থেকে অনায়াসেই বলা যায় যে, অভ্রভেদী শিখরে ভূদেবের বেদব্যাস যে বিস্ময়-প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই বিস্ময়-প্রতিমাই সদ্যোজাত কুমারীমূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নবজন্ম লাভ করেছে।

দুই ॥ পুষ্পাঞ্জলির দশম অধ্যায়ে কুমারিকার সমুদ্র-উপকূলে পৌঁছে সমুদ্রের বর্ণনায় ভূদেবের বেদব্যাস বলছেন, 'এখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিতেছি। পশ্চিমদিকে অতি প্রশান্ত মূর্তি। বীচিসকল ধীরে ধীরে আসিয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। সমুদ্র যেন সুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন।'

ভূদেব-বর্ণিত সমুদ্রের এই মাতৃমূর্তিই রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী) কবিতায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। ভূদেবের বর্ণনায় বীচিসকল 'ধীরে ধীরে' এসে কূল সংলগ্ন হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সমুদ্র যেন সুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। সমুদ্রের এই বাৎসল্যলীলার চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিশদীভূত হয়েছে—

এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও · আবার আনন্দপূর্ণ সুরে,
উল্লাসে ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি অট্টহাস্যে...

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির উপসংহারে 'সুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়ানো'র ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি,
সর্বাঙ্গে সহস্র বার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বলো তারে, 'শান্তি, শান্তি', বলো তারে, 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা'।

৪

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় ভূদেবের সারস্বত কল্পনা সার্থকতম প্রভাব বিস্তার করেছে কবির 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে বলেছেন, মাতৃস্তোত্র। আমরা পুষ্পাঞ্জলিকে বলেছি ভূদেবের মাতৃস্তোত্র। ভূদেব 'হিন্দুকণ্ঠহার' গ্রন্থে অধিভারতী দেবীর বন্দনায় সেই মাতৃস্তোত্রকে দেবভাষায় সংহত করেছেন—

মাতর্নমামি ভবতী হি সতীদেহরূপা'
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থ'।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতা সমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাং।

ভূদেব-ধ্যান-লব্ধ এই 'হিমগৌর-কিরীট-ভূষা' জননীই রবীন্দ্রনাথের গানে 'শুভ্রতুষার-কিরীটিনী' ভুবনমনোমোহিনী জননীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মাতৃবন্দনার প্রথম অন্তরাটি সমগ্রভাবেই ভূদেবের সারস্বতলোক থেকে সংগৃহীত। সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব বলেছেন,

'ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয়শিখর—ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রসদৃশ শুভ্রসলিল স্বর্ণদী,—ইহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু-প্রস্রুত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত।'

এই উদ্ধৃতির 'ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রসদৃশ শুভ্রসলিলা স্বর্ণদী'র রূপকল্পটি রবীন্দ্রনাথের ভারতাত্মা হিমালয়ের সন্ন্যাসী-মূর্তি রচনায় ক্রিয়াশীল হয়েছে—

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে।

কিন্তু সমগ্রভাবে ভূদেবের অপূর্ব কল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমনোমোহিনী গানেই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—

নীলসিন্ধুজল-ধৌতচরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।

'ইহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু-প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত''—ভূদেবের এই বাক্যই রবীন্দ্রনাথের গানে হয়েছে 'নীলসিন্ধুজল-ধৌতচরণতল' আর ভূদেবের 'ভারতবর্ষের শিরোদেশে হিমগিরি উচ্চ উষ্ণীষ'ই রবীন্দ্রনাথের গানে হয়েছে 'শুভ্রতুষারকিরীটিনী'।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম কবিপ্রতিভার কল্পনা ও কবিভাষাকে নিগূঢ় সঞ্চারে যাঁর ভাব ও ভাষা অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর সারস্বত সাধনা যে কালজয়ী কীর্তির অধিকারী, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

উল্লেখপঞ্জী

১. সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, ভবিষ্যৎবিচার, দ্রষ্টব্য ভূদেব রচনাসম্ভার, পৃ. ১৫৪।
২. সামাজিক প্রবন্ধ, দ্রষ্টব্য ভূদেব-রচনাসম্ভার, পৃ ১৮৩-৮৪।
৩ পুষ্পাঞ্জলি, সপ্তম অধ্যায়, ভূদেব-রচনাসম্ভার, পৃ ৪১১।
৪. সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অধ্যায় ভূদেব রচনাসম্ভার, পৃ ১৯০।
৫. তদেব, পৃ. ২০০।
৬. তদেব, পৃ ২০৮।
৭. তদেব, পৃ ২৪৭।
৮. তদেব, পৃ. ২৫১।
৯. তদেব, পৃ. ২৫৫।

পরিশিষ্ট-১

উ ন বিং শ পু রা ণ

তৃতীয় অধ্যায

অধিভাবতীব ভাবান্তব ॥

কালান্তব যমবাজ দাডাহযে দুর্জয
সম্মুখে সাবিত্রী সতী নাহি কোনো ভয।

অষ্টাদশ পব

পবদিন চিন্তাশীল কহিতে লাগিলেন, মহাবাজ! মাযা অসৎ পদার্থ কদাপি চিবকাল এইভাবে স্থাযী হইতে পাবে না। মাযাবী দৈত্যেবা যে প্রকাব ববেশ কবিযা আসিযাছিল তাহা পবস্পব নিন্দাবাদজনিত ক্রোধেব উদ্দীপন হওযাতেই একেবারে বিনষ্ট হইযা যায।

এদিকে মধ্যোপবনে ব্রহ্মচাবিণী অধিভাবতী বৈধব্যোচিত আহ্নিক পূজাবিধিব উপযুক্ত পুষ্পাদি সংগ্রহ কবিতে কবিতে ঐস্থানে আগমন কবিয। অন্তবাল হইতে সেন্টদিগেব তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন শ্রবণ এব তাহাদিগেব ভীষণ কুৎসিত মূর্তি অবলোকন কবিযাছিলেন। তাহাদিগেব কথাবার্তায এবং মূর্তি দর্শনে দেবীর মনঃ শোক ক্ষোভ এবং ভযে একান্ত আকুল হইযাছিল। তিনি আব স্থিব থাকিতে না পাবিয়া সেই ব্রহ্মচাবিণী বেশেই দৈত্যদিগেব সম্মুখীনা হইলেন। আশ্চযেব বিষয় এই তাঁহাব আন্তবিক প্রসিদ্ধ কোমলতাব হঠাৎ তেজস্বিতা ভস্মোদ্ভেদী অনল-সদৃশ প্রতিভাত হইল। ওদিকে সেন্টেবা তাঁহাব হস্তস্থ কুসুমমাল্যকে ববমালা বলিয়া স্থিব কবিযা লইল। তাহাবা দেবীকে দেখিযা ব্যস্তসমস্ত হইযা স্রস্ত ও বিকৃত নিবেশ বসনাদি যথাযোগ্য বিন্যাস কবতঃ পুনর্বার ছদ্মবেশ পরিগ্রহপূর্বক মাল্যদানেব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল। তন্মধ্যে সেন্ট জর্জ আশঙ্কা করিল পাছে ডেভিস ও নিকোলাসের গলদেশ কমনীয ববমালিকায সুশোভিত হয়। চতুর-প্রবর এই মনে করিয়া মানসিকভাব গোপনপূর্বক দেবীকে একবারে স্ত্রীভাবে সম্ভাষণ করা স্থিব করিয়া কহিল,

'প্রিয়ে, মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, এখনও পুষ্পাহরণে ব্যাপৃত। কুসুমপ্রিয়তা এমনই প্রবল যে আহারাদি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। অবিলম্বে অন্তঃপুরে গমন করুন।'

ক্ষীণকলেবরা ব্রহ্মচারিণী অন্তর্গূঢ় ভয় ও চিন্তাসহ কহিতে লাগিলেন—এ আবার কি। পরিনেতার সম্বোধন কাহার প্রতি হইল ?'

জর্জ।—প্রিয়ে! লজ্জার বিষয় কি ? ইহারা আমার পরম আত্মীয় এবং আমাদের পরিণয়ের বিষয়ও সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। বিধবাবিবাহের জন্য আপনকার লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমাদের সুসভ্য দৈত্যদেশসকলে তাহা লজ্জার বিষয় নহে। যাহা হউক, আপনি অন্তর্বাটিকায় গমন করুন, সূর্যদেব মধ্যাকাশ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এই সকল চাতুর্যমিশ্র গালি কথাবলী সতীর পক্ষে যদিও বজ্রাঘাত সদৃশ, কিন্তু দেবীর অপূর্ব ভাবান্তর হওয়াতে তিনি আকুলতা প্রকাশ না করিয়াই উত্তর করিতে লাগিলেন—

'ধিক! তোমরা আপনাদিগকে কৃষ্ণশিষ্য ও পরমধার্মিক বলিয়া ঘোষণা কর, আমাকে ওই পাপ সম্বোধন দ্বারা মর্মান্তিক যাতনা দিয়োনা। এতোদিন যদিও স্বামিরূপ রত্নোত্তম স্পর্শমণি হারা হইয়া আছি, কিন্তু তৎসংস্পর্শে সন্তানরূপ যে অপর সুশোভন হৃদয়নন্দন রত্নসকল লাভ করিয়াছি তৎসমুদায়ের দর্শনে ও রক্ষণাবেক্ষণে, সেই জগদ্দুর্লভ স্পর্শমণির শোক একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমার সেই বিলুপ্তজ্বাল শোকানল অদ্য ইন্ধনদানে প্রজ্বলিত করিলে। ঈশ্বরই পতিহীন শিশুপুত্রদিগের রক্ষয়িতা ও তাহাদিগের নিপীড়কগণের শাস্তা। যাহারা পতিব্যতীত পুরুষান্তরের কথোপকথনকেও ঘৃণ্য ও পাপজনক বিবেচনা করে, তাহাদিগের প্রতি নিদারুণ পুনর্ভূ অপবাদ। সতীত্ব যে দেশের রমণীকুলেরা হৃদয়মধ্যে নিরুপম ভূষণ বলিয়া ধারণ করে না, বিধবাবিবাহ সেই দেশেই লজ্জাকর নহে। পাপ কথার অধিক আন্দোলন করাই অন্যায়।'

এই বলিয়া দেবী একবার থামিলেন। সেণ্ট ডেভিস ও নিকোলাস দেবীর ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া দেবীর ও জর্জের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে লাগিলেন।

জর্জ।—পুনর্ভূ,—পুনর্ভূ অপবাদ কিরূপ ? আমি এতকাল স্বামিধর্মে সন্তানদিগের সহিত তোমাকে প্রতিপালন ও তোমার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। তুমি আমাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতেছ না ?

অধিভারতী। আমার অবোধ সন্তানেরা যাবনিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ করে। তোমাকে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষবৎ দেখিয়া ক্রমে আমার দেওয়ানী পর্যন্ত দেওয়া হয়। তুমি যে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবে, তাহা আমার পুত্রগণ বুঝিতে পারে নাই। পৃথিবীর সকলেই

বলিবে, তুমি আমার দেওয়ান ও আমার পুত্রগণেরও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র, একথা স্বয়ংও স্বীকার করিয়া থাকো। মনে ভাবিয়া দেখো, তুমি কিরূপে আর্যপুরের দেওয়ান হইয়াছ, এই বলিয়া তুমি কি কয়েকভাগের দেওয়ানী বা অধ্যক্ষতা লও নাই যে, 'অমুকস্থানের বর্তমান পল্লীপালক পল্লীর কেবল অমঙ্গল করিতেছেন, অধ্যক্ষতার উপযুক্ত গুণগ্রাম তাঁহার কিছুই নাই, এদিকে ঈশ্বর আমাদিগকে সুপালন কার্যে সক্ষম করিয়াছেন, অতএব বর্তমান পল্লীপালকের হস্ত হইতে অধিকার লইয়া তাহার সুপালন করা আমাদিগের কর্তব্য। বস্তুত দেওয়ানী ব্যতীত তোমার পরিণয় ব্যাপারের কোনো নামগন্ধও নাই। তুমি যে বলিলে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, তাহাই দেখো দেখি—

বলিতে পারো নগরীর শস্যক্ষেত্রসকলের উন্নতিসাধন করিয়াছ, অনেক বনজঙ্গল সাফ করাইয়া তাহাতে অর্থকর কৃষিব্যাপার সম্পন্ন করাইতেছ, একথা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার আমলে বাছাদের কায়ক্লেশে যে সকল অতিরিক্ত কৃষিলব্ধ দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে, সে সমুদায় কি আমার সন্তানেরা ভোগ করিতে পাইতেছে?—না, তাহাদিগকে ভুলাইয়া তোমার নিজের পরিবারেরা লইয়া ভোগ করিতেছ? যদি আমার বাছারাই তাহা ভোগ করিতে পাইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দারুণ যমদণ্ডে পীড়া দিতে পারিত না। বলিবে ঐ অতিরিক্ত শস্যভাগের পরিবর্তে তোমার পরিবারেরা কত শিল্পজাত ও কত অর্থ-প্রদান করিতেছে। তাহা সত্য বটে;—কিন্তু সে শিল্পজাত কতকগুলা মাটি ও বালিক্ষারের বাসনকোসন, ছুয়ার ছুরি কাঁচি এবং ভালোর মধ্যে স্থতার কাপড় বই তো নয়! তুমি কাপড় আনাইয়া দিতেছ। অমনি আমার পুত্রগণের প্রস্তুত বস্ত্র ন্যূনতর হইয়া যাইতেছে, তাহারা ক্রমে বস্ত্রবয়ন ভুলিতেও আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমার পরিবারেরা শস্য লইয়া যে অর্থ প্রদান করিতেছে, তাহার কতক তোমার অত্রত্য কর্মচারীরা বেতনস্বরূপে তোমার স্বপুরে লইয়া যাইতেছে; আর ভবিষ্যতে এখানকার কর্ম করিতে পারে—এই বলিয়া তোমার বাটীর কতকগুলি কর্মচারীকে বেতন দিবার জন্য অবশিষ্ট মবলগ টাকা বাটী পাঠাইতেছে। মনে কর তুমি একটি খনিতে প্রত্যহ কিছু সময় স্বর্ণ উত্তোলন করিতে এবং অবশিষ্ট সময় গৃহকার্যে যাপন করিতে। পরে কোনো ব্যক্তি আসিয়া কৌশলপূর্বক তোমার গৃহকার্যের ভার লইয়া তোমাকে দিবারাত্র কেবল স্বর্ণখনিতেই খাটাইতে লাগিল। দিবারাত্র উত্তোলন করাতে তুমি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণও পাইতে লাগিলে। কিন্তু সেই আগন্তুক অর্থবিনিময়ে তোমার ঐ অতিরিক্ত

স্বর্ণ ক্রয় এবং পরে নানা কৌশলে সেই অর্থও গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতে লাগিল। বল দেখি ঐ আগন্তুক তোমার কত উপকারী? তুমি তাহার নিকট তজ্জন্য কতদূর কৃতজ্ঞ হইতে পারো? গৃহকার্য নির্বাহের রীতিনীতি ক্রমে ভুলিয়া গিয়া, সুতরাং তৎকার্যে অক্ষম হইয়া আগন্তুকের একান্ত অধীন হইয়া পড়িলে। কৃষিবিষয়ে তুমি ঐ আগন্তুকের ন্যায় আমার উপকারী। আমার সন্তানেরা তোমাকর্তৃক ক্রমশ কৃষিকার্যেই প্রবর্তিত হইয়া শিল্পাদি কার্যে অপটু হইয়া যাইতেছে। অথচ পূর্বাপেক্ষা অধিক বিষয়ও ভোগ করিতে পাইতেছে না।

তোমার আমলেই বাণিজ্য ব্যাপারও আমার সন্তানগণের মঙ্গলজনক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। পূর্বে পূর্বে এখনকার পণ্যদ্রব্যের যেরূপ আমদানী রপ্তানি হইত তাহাতে এখানে বেশী পরিমাণে অর্থ প্রবেশ করিত। এখন আমদানী পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মূল্যরূপে অর্থও বহুগুণে বাহির হইয়া তোমার দেশস্থ পরিবারের সৌভাগ্যসাধন করিতেছে, আর এখন রপ্তানী বহুগুণে কমিযাছে, সুতরাং এদেশে ধনপ্রবেশ ন্যূনতর হওয়াতে এই পুরীও ক্রমে ক্রমে অন্তঃসার পরিশূন্য হইয়া বৎসগণের ভাগ অমঙ্গলের আধার হইয়া রহিয়াছে।

ঠুনকো কাচের বাসন আসিতেছে। যাহাতে জীবন রক্ষার কোনো সাহায্য হয় না, আর চাউল বাহির হইয়া যাইতেছে যাহা নরের সাক্ষাৎজীবন,…লোকে কথায় বলে 'ধান্যধনাৎ ন চ অন্যধনং'। আমায় অবোধ পুত্রেরা খাবার চাউল বাহির করিয়া দিয়া শাকপাত ভুসী খাইয়া ক্ষীণজীবী ও মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের হস্তে যমদণ্ডে নিপীড়িত হইতেছে। তাহারা ছেলেমানুষ, তাহাদেরই বা কি দোষ দিব? তোমার যে চকচকে নানারকম নকসাকাটা জিনিসপত্র, তাহাতে বিজ্ঞ প্রৌঢ়দিগেরও উপবাস করিয়া ঐ সকল কিনিতে ইচ্ছা হয়।

জর্জ। আচ্ছা, বিচার, শান্তিরক্ষা, শিক্ষাদান এ সকল বিষয়ে যে কোনো কথাই তুলিতেছ না? সামান্য কথা ধরিয়াই গলগল করিয়া বকিয়া যাইতেছ।

অধি—বড়ো সামান্য কথা লইয়া বকি নাই। সে যাহা হউক, তোমার বিচারাদির বিষয়ই বিবেচনা কর। পূর্বে যাবনিক দলের কেহ কেহ বিচার ও শান্তিরক্ষা বিষয়ে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার আমলে শ্রীবৃদ্ধিকারী করেরা সে অত্যাচারকেও চাপা দিয়াছে। পূর্বে যাবনিক বিচার-বিষয়ে অনেক সময়ে স্বগণের প্রতি পক্ষপাত করিত, তুমি এখন তাহা কোন না করিতেছ? বিশেষ এই, তুমি স্বীয় অন্যায়কারিতা স্বমুখে স্বীকার কর না, একটা না একটা ছল অবলম্বন কর।

তোমার পরিবারের কেহ, আমার কোনো সন্তানকে বধ করিলে অমনি বলিয়া উঠ তাহার পেটে পিলে ছিল, তাহাতেই সামান্য আঘাতে মরিয়া গিয়াছে। তোমার পরিবারদিগের হস্তে আমার যতগুলি সন্তান হত হইবে, তাহাদিগের সকলেরই প্লীহা রোগ থাকিতে হইবে, এটি একটি বিধাতাপুরুষের নিয়ম না হইলে আর তোমার চলে না। একি সামান্য পক্ষপাতিতা যে তোমার ছেলেরা শাদা বলিয়া সকল আদালতে তাহার বিচার হইবে না। তুমি অনেক স্থলে চক্ষুর্লজ্জায় পক্ষপাত করিতে পারো না, পূর্বে যাবনিকের আমলেও অনেক সময় পক্ষপাত হইত না। একজন যাবনিক নগরাধ্যক্ষ আপনার একমাত্র বাছাকে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আর এক সময় অপর একজন যাবনিক নগরপাল কোনো অপরাধে আপন বিচারক কর্তৃক আসামী নির্দিষ্ট হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় বিচারালয়ে গমনপূর্বক বিচারকের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। অপরাপর অনেক সময় যাবনিকদলের অনেকেই বিনা পক্ষপাতে বিচারকার্য নির্বাহ করিয়া গিয়াছে।

তুমি গর্ব করিয়া থাকো, এখন কত বিচারালয় হইয়াছে। সুতরাং বিচারকার্যও উত্তমরূপে নির্বাহিত হইতেছে, তখন বিচারালয়ই ছিল না, তা বিচার হইবে কি? এটি তোমার বড়ো ভ্রম। পূর্বে পল্লীর দশজনে মিলিয়া বিচার করিত, কাজেই তাহাদের মধ্যে তত অবিচার হইতে পারিত না। তাহারা আইন কানুন খাটাইত না বটে, কিন্তু দশের বুদ্ধিতে প্রকৃত বিচারের অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প ছিল। তখন তখন আসামী ফরিয়াদীর প্রতিবেশী মুখ্য মোড়লেরা বিচারক হইত, সুতরাং কূট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেবী, জুয়াচুরি, প্রভৃতি দারুণ দুরাচরণ সমস্ত ঘটিতে পারিত না। আর তখন অনেক মকদ্দমাই রফা হইয়া যাইত, তাহাতে মকদ্দমার খরচে ও কষ্টে অর্থী প্রত্যর্থী এরূপ উচ্ছিন্ন হইত না। অপর, পূর্বে, এক্ষণকার ন্যায় নীচপ্রকৃতি পিয়াদার ঘুসি ঘাড়ধাক্কাদি অপমানাচরণ ও অশ্রাব্য কটূক্তি সহিতে হইত না, বিশেষত নির্দয় পরের মায়ের বেটাদিগের কাছে আমার বাছাদিগকে করযোড়ে হুজুর হুজুর করিয়া সভয়ে সেলাম বাজাইতেও হইত না। যাহা স্বপ্নের চিন্তাপথে উপস্থিত হয় নাই, তাহা এখন দৈববিড়ম্বনায় দিবারাত্র সম্মুখে সংঘটিত হইতেছে দেখিতেছি।

এখন তোমার আমলের বিচারকার্য কেবল কূট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেববাজি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি ও উকীল মোক্তারেরা জুটিয়া কত শত অর্থী প্রত্যর্থীকে নিঃস্বলীকৃত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছ। তোমার বিচারালয়গুলি

তো জয়ের বিপণিমাত্র, টাকা ঢালিলেই জয় কেনা যায়। অবিচার তখন যদি শতকরা দশটা, তবে এখন ৭০ টাব কম নয়। তখনকার অপেক্ষা এখন উৎকর্ষ এই যে, তখন ধুতিচাদর পরা, চাটাইয়ে বসা, হীনবেশী মুখ্য মণ্ডলগণ বিচার করিত, এক্ষণে তোমার চাপকান পেণ্টুলুন-আটা চেয়ারে বসা, জাঁকজমুকে পরিবারেরা বিচারকার্য নির্বাহ করিতেছে। ভালো কাপড় পরিয়া লাঙ্গল ধরিলে জিয়াদা কবিয়া ধান ফলে না।

তোমার পুলিসের কাজও ঐরূপ, তাহাবও বড়ো বড়ো পদে কতকগুলি নির্বোধ ষণ্ডাকে নিয়োজিত কবিযা অত্যাচার ও বিশৃংখলা বর্ধিত করিতেছ।

অন্তরঙ্গ বলিয়া কেবল দেশীয় লোকেরাই বিচাব ও শান্তিবক্ষা বিষয়ে নিপুণতব হইয়া থাকে। অন্যস্থানের লোকদিগের দ্বাবা উক্তকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। তুমি ঐ দুই বিষয়েব শিরোদেশে আপনাব পরিবাবদিগকে বসাইয়াছ বলিয়া আমার নগরীতে অধিকতব অবিচার ও শান্তিভঙ্গ হইতেছে।

আমাব সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাদান কবিতেছ বলিয়া থাকো। কিন্তু ভাবিয়া দেখো তাহারা তোমাব নিকটে কি কতকগুলি গ্যাড ম্যাড ফিস ফাস শিখিতেছে যে আমাকে আর মা বলিয়াও মনে কবে না—তাহাবা আমার দুববস্থার বিষয় আব চিন্তা কবে না, কেহ কেহ পবেব মাকে মা বলিতেও বাসনা করিয়া থাকে। হায় তুমি আমাকে এমনি দুর্ভাগিনী করিলে যে পেটের ছেলে, যাহাদিগকে কত করে মানুষ কবিলাম, খাবার সময়েও যাহাদের মলমূত্রে ঘৃণা করি নাই, তাহারা আমাকে মা বলিতে লজ্জা বোধ করিল। তাহাদের মা মা শব্দে আমার কান জুড়াইত তাহাও বন্ধ করিলে। তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া তোমারই কাজ করিতেছে, এবং তোমাবই একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া পড়িতেছে। তোমাব শিক্ষাদান নয় তো, যাদুমন্ত্রে বশীকরণ। সন্তানগণের ভক্তিময় ব্যবহারে জননীর সকল দুঃখই চাপা পড়ে। সেই সর্বদুঃখহর ভক্তি হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিলে আর বাকী কি?

এই কথা বলিতে বলিতে অধিভারতীর আন্ত রক দুঃখপ্রবাহ হৃদয়স্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুরূপে পরিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের তৎকালীন শোকাকুল করুণভাব অবলোকন করিলে পাষাণের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। যাহা হউক, অনন্তর দেবী আপন শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংযমিত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

ভালো, এবিষয়ে আমাকেই দুঃখিনী করিতেছে, কর। আমার সন্তানগণের উন্নতিই বা কোথায়? তোমার প্রদত্ত শিক্ষা স্ববৃত্তি চাকরের উপযুক্ত বৈতো নয়। যে

দুটি একটি ছেলে ট টা টি টি করিয়া কিছু শিখিয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকে কৌশল-পূর্বক উচ্চপদলাভে বঞ্চিত করিয়া এমনি মুখচাপা দিতেছ যে তাহাদের সহোদরেরা উচ্চতর শিক্ষার চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতেছে। সেদিন আমার সেই মনোমোহন পুত্রটিকে কি বঞ্চনাটাই না করিলে। বাছা আমার প্রবাসে ভাইদিগের ও আমা হইতে অন্তরে থাকিয়া কত কষ্টে লেখাপড়া অভ্যাস করিল, অবশেষে তুমি বিনা দোষে তাহাকে কাঁদাইয়া ফিরাইয়া দিলে। কিন্তু ঘোষণা দিতেছ জাতিভেদ ও পক্ষপাত না করিয়া আর্যপুরের উচ্চ উচ্চ পদে লোক নিয়োগ করা যাইবে। আমার অবোধ ছেলেরা—তাহাতে বিশ্বাসও করিতেছে। ওদিকে ঐ সকল পদলাভের উপায়, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার তোমাদের দূরতর বায়ব্য প্রদেশের উচ্চস্থানে সংস্থাপিত করিয়া প্রথমে এই ভাবিয়া ক্ষান্ত ছিলে যে তথায় আমার যান-সাধনহীন বামনপুত্রেরা গমন করিতে পারিবে না। ক্রমে আমার দুই একটি দীর্ঘকায় পুত্র যখন কষ্টেসৃষ্টে সেই উপায় লাভ কবিল, তখন দেখিলে যে, তারা তোমার পুত্রদিগের হইতে বামন নহে, প্রত্যুত যানসাধন ও ভিন্ন অধিরোহণী ব্যতিরেকেও উপায় স্থানে উঠিতে পারে, তখন অমনি বয়সের এমনি ব্যবস্থা করিয়া দিলে যে আমার পুত্রেরা তত ছেলেবেলায় আর কোনোক্রমেই সেই উপায় ভবনে অধিরোহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এখনও উল্লিখিত ঘোষণা দেওয়াটি ছাড়া হয় নাই—ধন্য ! ধন্য !

কোনো অতি দয়ালু লক্ষ্মীবন্ত পুরুষ কোনো দরিদ্রের পা ভাঙিয়া দিয়া, তাহাকে আপনার দূরস্থ ভাণ্ডার প্রদর্শনপূর্বক কহিল—'তুমি ঐ ভাণ্ডারে গমন করিয়া তোমার পরিবার নির্বিশেষে আসন, বসন, ও রত্নাদি গ্রহণ করিয়া ভোগ কর। দরিদ্র প্রলোভিত হইয়া বহুতর ক্লেশকর চেষ্টায় পা ভাঙা কিঞ্চিৎ সারিয়া হাতে বুকে ভর দিয়া ভাণ্ডারে কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিল। পরে সে যেই একটি রত্ন গ্রহণ করিল, দয়ালু অমনি তাহার হস্তদ্বয় বন্ধনপূর্বক তাহাতে চাবি আঁটিয়া দিলেন। কিন্তু বদান্যবর তখনও রত্ন গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া পরিত্যাগ করিলেন না। বল দেখি তাহার কেমন দয়া—আমার সন্তানগণকে বিচারকাদির পদ প্রদান করিতে করিতে তুমিও ঠিক এইরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছ না ?

আমার সন্তানেরা উচ্চপদলাভে বঞ্চিত হওয়াতে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। প্রথমত তাহার পরিণাম বিবেচনা করিয়া আপন আপন উন্নতিসাধন চেষ্টা হইতে বিমুখ হইতেছে। দ্বিতীয়ত, অন্যস্থানের লোক প্রধান পদে নিযুক্ত হওয়াতে যাবতীয় কার্যালয়ের কার্যে গোলযোগ ও অত্যাচার ঘটিতেছে।

অন্যান্য পদ দাও না দাও তাহা তত গায়ে লাগে না, কিন্তু আমার ছেলেদিগকে যে সৈনিকপদ প্রদান করিতেছ না, তাহাতেই তাহাদের সর্বনাশ হইতেছে, এবং তাহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়াছে। যাবনিকও এবিষয়ে বিলক্ষণ প্রশংসনীয় ছিল, তাহার আমলে আমার ছেলেরা সকল পদেই নিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তখন তাহারা দিন দিন এমন হীনবীর্য হয় নাই। পরাধীন কিন্তু সুশাসিত সভ্যদেশে সৈনিকপদের আশা না থাকিলে লোকে ক্রমে দুর্বল হইয়া প্রায় বিনাশ দশায় পতিত হয়। তুমি ইহা জানিয়া শুনিয়াও যখন আমার পুত্রগণের সৈনিক-পদ লাভের পথ রুদ্ধ রাখিয়াছ তখন তোমাকে আমাদের হিতৈষী বলিয়া কিরূপে নির্দেশ করিব, বল? হায় সেদিন আমার সেই চন্দ্রসদৃশ সুন্দর ও কুমারসদৃশ বীর কলেবর পুত্রটি তোমার কাছে সৈনিকপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল আর তুমি কি নির্দয়টাই না প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরাশ করিলে। হায় এসকল দেখিয়া শুনিয়া কি স্থির থাকা যায়?

জর্জ—শিক্ষাদানের কথা বলিতে কি বিষয় ফেলা হইল দেখো। অপক্ষপাতে তুমিই তদ্বিষয় ভালো করিয়া বলো দেখি। কুসংস্কারের অপনয়ন না হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই জন্মে না। আমার শিক্ষাদানে তোমার সন্তানগণের সেই কুসংস্কার অপনীত হইতেছে সুতরাং তাহারা শিক্ষার প্রধান ফলই আমা হইতে লাভ করিতেছে।

অধি—তোমার শিক্ষাদানাদিতে আমার সন্তানগণের কুসংস্কার গিয়াছে, একথা তুমিই সর্বদা কহিয়া থাকো এবং আমার অবোধ সন্তানেরাও বলিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কি কি কুসংস্কার গিয়াছে, তাহা একবার দেখা উচিত। তোমার স্কুলে পড়িয়া, আমার ছেলেরা এখন হাঁচি টিকটিকি দিনক্ষণ এই কতকগুলি মানে না বটে। কিন্তু হাঁচি টিকটিকি না মানাতে এমন বেশি লাভটা কি? দিনক্ষণ মানাতেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না যেহেতু আমাদের দিনক্ষণ মানিবার প্রণালী কার্যবাধক নহে। প্রয়োজন হইলে সেই প্রণালীর মতবিশেষে সকল সময়েই যাত্রাদি করা যায়। ভূতপ্রেতের কথায় বলিবে তাহা মানায় ক্ষতি আছে। কিন্তু আমার ছেলেরা যেমন দেশীয় ভূতপ্রেতকে অগ্রাহ্য করিতেছে তেমনি আবার কতকগুলি বিদেশীয় ভূত তাহাদের মনে অধিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং তাহাদের ভূতপ্রেত সম্বন্ধীয় কুসংস্কার গিয়াছে কিরূপে বলা যাইতে পারে? তবে এইমাত্র বলিতে পারি তাহাদের মনে ভূতের পরিবর্তন হইয়াছে।

তোমার প্রদত্ত শিক্ষার গুণে আমার ছেলেদের উপধর্ম ঘুচিতেছে, বলিয়া থাকো। কিন্তু এ বিষয়ে যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা আমার সন্তানেরাই

করিয়া লইতেছে। তোমার তো মনে আছে, তোমার শিক্ষাদান প্রণালী প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই আমার সন্তানবিশেষ প্রকৃত ধর্মতত্ত্বের পথ পরিষ্কৃত করিয়া যান ; এ বিষয়ে বরং বলিতে পারি তোমার পরিবারবর্গই আমার বাছাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতেছে—পরে বিশেষরূপেই করিবে। দেশীয় ঠাকুর সকল বদলাইয়া বিদেশীয় করিয়া দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য তুমি আমার চিরারাধ্য পরম পিতার পরিবর্তে অপর কৃষ্ণাদি ত্রিদেবের উপাসনার উপদেশ দিয়া থাকো। আমার বাছাদের মধ্যে যাহাদের মনে বিদেশীয় ধর্ম লব্ধপদ হয়, তাহারাই আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। হায়! তাহারা যেন আমার পেটের ছেলে নয়—তাহাদিগকে কি আমি স্তন্যপান করাই নাই ?

অপর, তুমি এমত মনে করিও না যে পূর্বে আমার যাবতীয় সন্তানেরাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। পূর্বে তাহাদিগের অনেকেই ন্যায়াদি শাস্ত্র পাঠ করিত। যাহারা ন্যায়াদি দর্শন-শাস্ত্রসকল পাঠ করে, তাহাদের মধ্যে কুসংস্কার থাকিতে পারে না।

তবে তাহারা সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন ও লোকের সন্তোষ সাধনার্থ কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না। কিন্তু তোমার প্রদত্ত ধর্মশিক্ষা তো এই পর্যন্ত যে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতে হয় ? তাহা হইলেই হইল। যাবনিকের আমলে আমার পুত্রেরা প্রায় সকলেই দর্শনাদিপাঠে বিমুখীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু যাবনিকের বিনাশের তো বাকী ছিল না, ক্রমে সংস্কৃত ভাষার সহিত নানাবিধ তত্ত্বনির্ণায়ক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তিত হইবার উপক্রমও হইয়াছিল। এই সময়ে আমার কয়েকটি ছেলে পূর্ব মধ্য বিশেষত পশ্চিমোত্তর বিভাগে ধর্ম সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই ধর্ম সংস্কারের সহিত সংস্কৃত দর্শনাদি অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার অবশ্যই দূরীভূত হইয়া যাইত।

ফলত তোমার কুসংস্কার দূরীকরণ প্রণালীও নূতন নহে, তাহাও দেশীয় পরিবর্তে বিদেশীয় করা মাত্র।

আমার পুত্রগণের কুসংস্কার দূরীকরণ তো এই পর্যন্ত। তদ্‌ভিন্ন পূর্বে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানপূর্বক সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলন করিত, তাহারা এমন ক্ষীণজীবী হইত না। যাহাদিগকে এখন তোমার স্কুল কালেজে পড়াইতেছ, তাহাদিগের অনেকেই তোমার ব্যবস্থা কৌশলে পড়িতে পড়িতে বা কালেজ হইতে বাহির হইয়া দুমাস ছমাস কাজকর্ম করিতে করিতে চক্ষুরত্নহীন অন্ধ, ধৈর্যহর শিরোরোগে আক্রান্ত, যমদূতোপম শ্বাসকাশ যক্ষ্মা পীড়িত, কিম্বা বিষময় যন্ত্রণাকর শূল উদরাময়াদিগ্রস্ত

হইয়া যাইতেছে। আবার তোমার কুহকজালে পড়িয়া বাছারা সুরাপান দোষে দিন দিন আরও ভগ্নদেহ ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমার সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আমার উপকার না অপকারই করিতেছ ? যে সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করা যায়, সে যদি শিক্ষান্তে লোকান্তরিত বা চিররোগী হয়, তবে তাহার অপেক্ষা সবলকায় মূর্খ পুত্রও ভালো। ওরূপ শিক্ষিত সন্তান হইতে জলপিণ্ডের আশাও বিলুপ্ত হয়। হায়! মা হইয়া সন্তানের দেহপাতের কথার আর কত আন্দোলন করিব ? আমি অতিশয় কঠিনহৃদয়া যে, এ সমুদায়ের আন্দোলন করিতেও সমর্থ হইতেছি। দুর্ভাগ্য মানুষকে সকলই সহাইতে পারে। নচেৎ তাঁহার মৃত্যুতেও কি জীবিত থাকিতে হয়।

জর্জ—এ সকল তোমার অন্যায় ভৎর্সনা, এই বুঝি কৃতজ্ঞতা ? আমি জলপানির টাকা দিয়া তোমার সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইতেছি, তুমি বল কি না তাহাদিগেব বিনাশসাধন করিতেছি ? তাহারা যদি আপন দোষে অধঃপতিত হয, তবে কি সে দোষ আমার হইবে ?

অধি—তুমি আমাব সন্তানগণের সুপালনের ভার লইয়াছ, এক্ষণে তাহারা যেরূপে বিনষ্ট হউক না কেন, তদ্বিষয়ে তোমাকেই দোষী বলিয়া সকলেই নির্দেশ কবিবে। এই যে বলিলে, জলপানি দিয়া আমার ছেলেগুলিকে লেখাপড়া শিখাইতেছ তাহা কি আমি অস্বীকার করি ? কিন্তু তোমার জলপানি দান প্রণালীই নানা অনিষ্টের হেতু। ছেলেরা জলপানির প্রলোভনে কেবল শাবীরিক গুরুতর পরিশ্রমে শরীরপাত করিতেছে। তাহাদের মুড়িমুড়কি পাটালি খাবাব কড়িগুলি সকলই ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দুচারি পয়সা জলপানি দিতেছ। বড়ো দান, বড়ো দয়া!

তোমার আমলে আমার সন্তানগণের সুপালন ও সুশিক্ষার বিষয় তো এক প্রকার বলা হইল। বাকী আমার নিজের পালন, তা তাহাতেও তোমার ত্রুটি নাই। আমার অলংকারগুলি পর্যন্তও অপহরণ করিয়াছ। তাঁহার (আর্য স্বামীর) পরলোক হইলে যাবনিক আমার মুকুটহীরক অপহরণ করে। পরে আমার কোনো রণজিৎ পুত্র বহুকষ্টে তাহা যাবনিকের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লয়। তুমি সেই হীরকরত্ন বলপূর্বক লইয়া গিয়া আপনার গিন্নীর মুকুটে পরাইলে, ইহাতেও যদি সুপালন করিতেছ বল, তবে আর কি করিয়া তোমার মুখচাপা দেওয়া যায়।

আবার আমার সন্তানগণকে আত্মরক্ষায় এমনি অক্ষম করিয়া তুলিতেছ যে পরে একদণ্ড তোমার সহায়তার অভাব হইলে তাহাদিগকে পঙ্গুবৎ হইতে হইবে।

বলো দেখি, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পকার্য, শত্রুতাড়না প্রভৃতি যাবৎ বিষয়েই তাহারা তোমার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে কিনা ? তুমি তাহাদিগের ঠেকো হইয়াছ, সুতরাং তাহাদিগের ভাবিমঙ্গলেও বিশ্বাস নাই। যে চারা ঠেকোর ভরে উন্নত হয় তাহার কি মঙ্গলের আশা করা যায় ? সহজ উই ঘুণ প্রভৃতিতে ঠেকো পাতিত বা স্থানান্তরিত হইলে চারাটিও পতিত হইবে, হয়তো সেই পতনেই তাহার বিনাশ অথবা যদি কথঞ্চিৎ বাঁচে, ভগ্নশাখ, ভগ্নমূল ও দুর্বল হইয়া থাকিবে। পতনের পর অন্য ঠেকো দিলেও তাহার মূলের আঘাত শোধরাইতে বহুকাল লাগিবে।

ফলত, আমার সন্তানগণের জীবন অশ্বজীবনের অপেক্ষাও হীনতর করিয়া তুলিয়াছ। অশ্বেরা কার্যে ত্রুটি করিলে চাবুক খায় ইহাদের তাহাতেও নিস্তার নাই। লোক আপন কার্যসাধনের জন্যও অশ্বকে বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তুমি আমার হতভাগ্য বাছাদিগকে ক্রমশ দুর্বলই করিতেছ।

ঈশ্বর তোমার হাতে জোব দিয়াছেন, আমাদের সর্বনাশ করিতেছ, কর, হাত নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অমন কবিয়া ভোগলামি দেওয়াটা কেন! প্রধানতম বিচাবালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজসকলে আমার এক একটি সন্তানকে গ্রহণ করিয়াছ। তোমার পরিবারেরা তাহার ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছে, তুমি যে আমার সন্তানদিগকে ক্রমশ উচ্চপদে নিযুক্ত করিবে উহা তাহার পূর্বলক্ষণই। আমার কতকগুলিই অবোধপুত্র ইহাতে অমনি গলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদে তাহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চতর পদ প্রদান করিতেছ তাহার মর্ম বুঝে কে ? যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন আর তুমিই জানো। প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজসকলে তোমার পাল পাল পরিবারের মধ্যে আমার এক একটি ছেলে থাকিলেও কোনক্রমেই আপনার মত চালাইতে পারিবে না। সুতরাং তথায় থাকা না থাকা সমান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর পদে তাহারা নিযুক্ত হইলেই আপনাদিগের ক্ষমতা প্রকাশ ও মত চালনা করিতে পারিবে। অপর, প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজের সংখ্যা নিতান্তই অল্প আর প্রদেশীয় বিচারক প্রভৃতির সংস্থা সুপ্রচুর ; বলো দেখি এই সকল ভাবিয়াই ওরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ কিনা। সেদিন তোমার কয়েকটি ছেলে প্রস্তাব করিল তোমার স্বপুরের মহতী সভায় আর্যপুরীয়দিগের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে আমার সুশিক্ষিত সন্তানগণও ঠিক ছিলেন তুমি ক্রমে তাহাই করিবে। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর্যপুরের এতো সংখ্যক প্রতিনিধি লইতে হইবে যে তাহাতে

তোমার পরিবারেরা জিত এবং আমার ছেলেরা জেতৃস্বরূপ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না।

যাহা হউক, তোমার আর যাচিয়া উপকার করায় কাজ নাই—তুমি চলিয়া যাও না কেন? আমার ছেলেদের আর এরূপ ক্ষীণজীবী সভ্য ও সুশিক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই, তাহারা মূর্খ হইয়া থাকিবে। পাচ সের ধান বেরুণ করিয়া মোটা ভাত খাইবে, চরকার মোটা সুতো পরিবে—চটি জুতা পায়ে দিবে। তথাপি তোমার কৃত অশ্বজীবনের মোজা ও বুট জুতা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। আমাদের এসকল মোটা ব্যবস্থা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর। তোমার বাবুয়ানা, খোরাক পোষাকে, আর কাজ নাই। আমি তোমার সুপালন আর প্রার্থনা করি না।

এই বলিতে বলিতে অধিভারতীর ক্রোধ ও শোক মনোমধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মহারাজ। দেবীর তৎকালিক অভূতপূর্ব মূর্তির উপমামূল কোথাও নাই। স্থির বিদ্যুৎ এবং উদীচ্যপ্রভা, ঐ জাজ্জ্বল্যমান দেহকান্তির নিকট মলিন হইয়া যায়—যাবতীয় দেবগণের যাবতীয় তেজঃ একত্র সংহত হইলেও ওরূপ প্রখর তেজোরাশি সমুদ্ভূত হয় না। অন্য কথা কি। দেবীর ললাট ফলকে আদিত্যদেব স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়াও নিস্প্রভবৎ প্রতীয়মান হইতেছিলেন। যদি জর্জ ওই তেজোরাশি প্রভাবে দর্শনশক্তিবিহীন না হইয়া সেই সময়ে দেবীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিত, তবে বিশ্বরূপিণী মহাদেবীর সাক্ষাৎকা। লাভ করিয়া একেবারেই অনঘ ও মুক্ত হইতে পারিত। তখন সে দেখিত যে যাহাকে সামান্যা মানবী মনে করিয়া অত্যাচাব করে দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে—বরুণদেব চরণযুগল ধৌত করিতেছেন, পবন চামর ব্যজন করিতেছেন। বিষ্ণু স্বয়ং চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিতেছেন। এবং মহাদেব আপনি তন্ত্রধারক হইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা মহাদেবীব পূজা বিধান করাইতেছেন।

কিন্তু নিমেষমধ্যেই দেবীমায়া তিরোহিত হইল, জর্জ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দেখেন সম্মুখে কতকগুলি অবগ্রাহ-মলিনা লতিকা এবং একটি শুষ্ক নির্ঝরিণী মাত্র রহিয়াছে—পৃথিবীও স্বীয় তপন-তাপিত পৃষ্ঠ শীতল করিবার জন্য পূর্বদিকে সঞ্চালিত করিয়াছেন—রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্ট জর্জের মনোমধ্যে প্রগাঢ় চিন্তা আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সে ভাবিতে লাগিল আমি বুদ্ধিবিদ্যাপ্রভাবে পৃথিবীর কি জল, কি স্থল সর্বত্রই প্রাধান্যলাভ করিয়াছি, আমার বিদ্যাকৌশলে নির্জীব জড়পদার্থসকল সজীব ভৃত্যভাব প্রাপ্ত-

হইয়া কার্য সম্পাদন করিতেছে, আমার সংকল্পসকল বার্তা ও রাজনীতি শাস্ত্রের দুরবগম্য সুজটিল কুহকজালে সমাবৃত ও গোপিত হইয়া নিষ্পাদিত হয়, অধিভারতী এক সামান্য মূর্খ স্ত্রীলোকমাত্র, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, কেবল বামায়ণ মহাভারতের উপন্যাস-শ্রবণ তাহাব জ্ঞানের উপাদান শাস্ত্রেব বচনমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের প্রমাণ, অন্তঃপুরমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র এবং কেবল পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তির আচাব ব্যবহার দর্শনই মানবপ্রকৃতিবোধের উপায়, সেই মেয়ে-মানুষ আজি আমার তথাবিধ সুগূঢ় অভিসন্ধি সকলের অন্তর্ভেদে সমর্থ হইল, জগতে ইহার অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আব কি আছে? মৃদুল শিরীষ কেশর দ্বারা কি সুকঠিন হীরকমণি বিদাবিত হইল? অথবা জল যে এতো কোমল কোমলতাব প্রধান আধার, তাহাও তো কতশত পর্বতশরীর বিদীর্ণ করিয়া থাকে। কিন্তু জলের অন্তর্গত গুরুত্বই ঐ ভেদকতার কারণ, ইহার ঐ অন্তর্ভেদকতা শক্তি কোথা হইতে আসিল? কোন চিন্তাশীল নীতিবিদেব শিক্ষাপ্রদানের ফলে কি ভারতী নীতিভেদে এরূপ নৈপুণ্যলাভ কবিল? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? বর্ণমালার উপদেশ এবং বিষয়কর্মেব বহুদর্শিতা-পবিহীনা বমণীকে হঠাৎ এরূপ নীতিনৈপুণ্য প্রদান করা কি মানবীয় ক্ষমতায় সাধ্য? তবে কি যে শক্তি উপধর্মের ঘোরতব অন্ধকারে সমাবৃত মহম্মদ ও খৃষ্টদেবেব মানসে প্রকৃত ধর্মতত্ত্বের শিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিল তাহাই আজি ভাবতীকে শিক্ষাপ্রদান করিল? যে অদ্বিতীয় শক্তি আমাকে দুর্ভেদ্য করিয়াছেন, তাহা কি ইহাকে ভেদকতা প্রদান করিতে পারেন না? আমিই এমন কি বিশেষ গুণাস্পদ ছিলাম? এখনও আমার সেই নিষাদ-জীবনের চিহ্নসকল বর্তমান রহিয়াছে, সেই পশুচারণ-ঘটিত পায়ের আঁচড়সকল আজিও অপনীত হয় নাই, ভূগর্ভ-বাস সকল আমার অচিরসভ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেই হীনদশাপন্ন অসভ্যতম আমাকেও যে শক্তি জগতে ঐশ্বয ও প্রাধান্য প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছে, তাহা এমন ধর্মপরায়ণা পূর্বশ্রেষ্ঠাকে যে কিছু বোধশক্তি দান করিবেন, তাহাতে অসম্ভবতা কি? আবার তাঁহার অনুগ্রহ প্রসাদ তো চঞ্চল, আজি ভারতীর প্রতি তাহা কি সুপ্রসন্ন অনুগ্রহ দৃষ্টি ফিরাইল?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জর্জ হঠাৎ কম্পিত-কলেবর হইল, তাহার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশিত হইল এবং সমস্ত বাহ্যাকৃতি অন্তরোদিত গুরুতর ভয়ের সূচনা করিতে লাগিল।

চিন্তাশীল সে দিবসের কথা সমাপন করিলেন।

পরিশিষ্ট-২

রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনায় ভূদেব

প্রভাত সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যের প্রণেতা। রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রকৃত 'আর্য কবি' তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 'আর্য কবি' বলিলাম এইজন্য যে তাঁহার হৃদয় প্রকৃতিশোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে যাহা প্রাচীন আর্য কবিদিগেরই করিত। আর্য কবির ভাব, 'আমি প্রকৃতির'। ইউরোপীয় কবির ভাব, আজি কালি যদিও একটু পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু আদৌ 'প্রকৃতি আমার'। আর্য এবং ইউরোপীয় কবির এই মৌলিক প্রভেদের একটি সুন্দর প্রমাণ এই পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফরাসী কবি ভিকটর হিউগো হইতে রবীন্দ্রবাবুর অনুবাদিত 'কবি' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখ।

কবি

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক, কভু ভকতি বিহ্বল হিয়া,
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া!
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙ্গা টুকটুক।
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি তুলি
হাবভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি,
বলাবলি করে আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান বিশাল কায়া
হেথায় জাগিছে আলো হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধ বট—
মাথায় নিবিড় জট,
ত্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল ;
কোথা বা ঋষির মত—
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে, মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতি ভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে
লতা শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি
চুপি চুপি কহে তারা ওই সেই ! ওই কবি।

অতএব ইউরোপীয় কবি বলিয়াছেন যে 'কবি' ফুলবধূর বল্লভ, বনস্পতিদিগের গুরু।

কিন্তু আমাদের কবি কি বলেন ?—

ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল।
আমি কে গো জননি গো আমারে হেরিয়ে কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল।
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পুরিল উল্লাসে।
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে ?
মোরে কেন এত ভালোবাসে ?
মরি মরি কচি হাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভাল,
প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে
না ফুটিতে প্রভাতের আলো
বায়ু ভরে ঢলি ঢলি করিবি রে গলাগলি
হেরিব তোদের হাসিমুখ

তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরাণের মুখ।

আমাদের কবি ফুলকুমারীর হাসি দেখিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

আর্যকবিতে এবং ইউরোপীয় কবিতে এই যে মৌলিক প্রভেদ, তাহা অনেক স্থলে আরও এক প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর্যকবি যেমন জগতের একটি রমণীয় বস্তু দেখেন, অমনি তাঁহার মন সমুদায় জগৎশোভার প্রতি প্রভাবিত হয় এবং তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। ইউরোপীয় কবিদিগের প্রায়ই এ ভাব হয় না। তাঁহারা আপনাদিগের 'অহং' বিন্দুতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীভূত রূপ দেখিতে পারেন এবং ইহাতে যাহা কিছু রমণীয় তাহা সেই কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রবাবু ভিকটর হিউগো হইতে অনুবাদ করিলেন—

রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল
ও মুখ দেখিতে অতি সুন্দর উজ্জ্বল,
সোনার তারকা সবে ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু 'সরগশোভা ঢাল এর শিরে।'
বলিনু আঁখিরে তব 'ওগো আঁখি-তারা
ঢাল গো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।'

রবীন্দ্রবাবু নিজে লিখিলেন—

আমার নাহি সুখ দুখ
পরের পানে চাই
যাহার পানে চেয়ে দেখি
তাহাই হয়ে যাই।

আবার লিখিলেন—

সবার সাথে আছি আমি
আমার সাথে নাই
জগৎস্রোতে দিবানিশি
ভাসিয়া চলে যাই।

ইউরোপীয় ও আর্যে এই মজ্জাগত, এই অস্থিগত প্রভেদ। ইউরোপীয় নাহংকে অহং করিতে চায়, আর্য অহংকে নাহং এমন করেন। একজনের ধর্ম আত্মসাৎ করা অপরের ধর্ম আত্ম-বিসর্জন করা। ফলে দুই এক। কারণ এক হওয়া

দুয়েরই উদ্দেশ্য। কিন্তু পথ পরস্পর বিপরীত। পথের মধ্যে দুয়ের সাক্ষাৎকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই—যদি কোথাও হইতেছে দেখা যায়, তবে দুইয়ের এক জন অবশ্যই পথ ভুলিয়াছে বলিতে হইবে, অনেক নব্য বাঙ্গালা কবিদিগের ন্যায় রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রকৃত পথ ভুলেন নাই।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতাগুলির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ পারিলাম না। তবে একথাটি বলিব যে অভিমানিনী নির্ঝরিণীর ভাবটি প্রধানতম আর্যকবির ভাব নহে। রবীন্দ্রবাবু যে বলিয়াছেন—

অবোধ ওরে কেন মিছে
করিস আমি আমি
উজানে যেতে কেন চাবি
সাগর পথগামী।

ইহাই প্রকৃত আর্যকবির ভাব।

আর একটি কথা বলিব—কিন্তু এ কথাটি কিছু ভয়ে ভয়ে বলিব। রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

সৃজনের আরম্ভ-সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার—
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্রমাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিলোচন
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

আমরা বলি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই মতে—

সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অসীম অন্ধকার
সৃজনের ধ্বংসী কালানল
পুনরায় গিলিল আপনা
অনন্ত অনলগ্রাসী আঁধার সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদিয়া নয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান

জাগতিক সুতরাং অতি-জাগতিক, যাবতীয় কার্যেরই পথ বৃত্তাকার, অতএব যাহার

অন্ধকারে আরম্ভ, অন্ধকারেই তাহার শেষ। বহ্নির 'তাপরশ্মি'গুলি তাহার আলোকরশ্মি হইতে পৃথক্‌ভূত এবং অধিকতর বলীয়ান। সুতরাং যখন 'সর্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবমানং' তখন আলোকরশ্মিগুলিকেও অতি প্রকট তাপ-রশ্মিতে হোম করিয়া ফেলিব। আরও একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। এতদিনের পর বৈদান্তিক মায়াপথের প্রকৃত অর্থ এক রবীন্দ্রবাবুর কবিতাতে দেখিতে পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। তিনি 'মহাস্বপ্ন' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন ভাঙ্গা দিন
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধসত্য হয়ে যাবে লীন?

যাহাকে এই 'আধসত্য' বলা হইল ইহারই বৈদান্তিক নাম 'মায়া'। এই মায়া লইয়া কতই তর্ক বিতর্ক, কতই গোলমাল, কত রূপকরচনার ছড়াছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে ইউরোপীয় দার্শনিক বার্কলি হইতে উহার টিপ্পনী বাহির হইতেছে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদায় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন—আর ইংবাজিনবিসেব কাছে বার্কলির গ্রন্থ হইতে মায়াবাদ শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। মায়ার অর্থ আধসত্য বা খণ্ডজ্ঞান।

১২শ খণ্ড	২রা আষাঢ়	১৫ই জুন	পৃঃ ১৪৮
১০ সংখ্যা	১২৯০ সাল	১৮৮৩ খ্রী:॥	

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

যিনি প্রকৃত কবি তিনি পদ্যই লিখুন, আর গদ্যই লিখুন, তাঁহার রচনা কবিত্বের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দ্বারা অবশ্যই ভূষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভা-সম্পন্ন প্রকৃত কবি। তাঁহার লিখিত এই গদ্যময় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' যথেষ্ট কবিত্ব আছে। এমন একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রন্থকারের রুচির ঐকান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষের সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণ সকল পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লক্ষিত না হয়। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় আজিকালি অনেকানেক প্রবন্ধ-পুস্তক প্রণীত হইতেছে দেখিতেছি। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ইংরাজি রিবিউ বা মাগাজীনের আদর্শানুযায়ী। সেগুলিতে লেখার খুব চোট—খুব আড়—খুব ভঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু সেগুলিতে লোকের মনের ভাব নিতান্ত অস্ফুট থাকে এবং পড়িবার সময়

যেন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা শব্দে গ্রথিত কি একটা ইংরাজী জিনিস পড়িতেছি এরূপ বোধ হয়। আর বিজাতীয় নামের ছড়াছড়ি এতই থাকে যে তাহা দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইতে হয়।

এই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' সেরূপ জিনিস নহে। এইটি সত্যসত্যই একটি বঙ্গীয় অতি নির্মল অবিকৃত হৃদয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করে। এই পুস্তকখানি পাঠকের মনের সহিত তাঁহার প্রকৃত মাতৃভাষায় কথা কয়। অতি সহজ সরল মাতৃভাষা বটে, কিন্তু ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, আর্য অত্যুন্নত অত্যুদার প্রাচীন পৈতৃক ভাব। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

১ কিছুতেই মানুষের অধিকার নাই এই তথ্যটি বুঝাইবার নিমিত্ত রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস করিতেছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র। একটি মন দিয়াছেন, একটি শরীর দিয়াছেন, আরো কতকগুলি ব্যবহার্য পদার্থ দিয়াছেন। তাহার একটিও আমরা ভাঙিতে পারি না, স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি তাহা করিতে চেষ্টা করি—তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি কখনো ভ্রমক্রমে আমরা মনে করি আমার শরীর আমার ও সেই মনে করিয়া তাহার প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আসিয়া তাহার শাস্তি দেয়।

২ সকলেই মানুষের অধিকার আছে—এ তথ্যটিও বুঝাইয়াছেন, যথা— তুমিও তাহার সব পাওনি, আমিও তাহার সব পাইনি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও সে আমারও সে। এইজন্যই জনক কহিয়াছিলেন কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে।

৩ প্রেমিক প্রেমাস্পদের দোষ কিভাবে দেখে—

তুমি বলিবে প্রেম যদি অন্ধ না হইবে তবে কেন সে দোষ দেখিতে পায় না? দোষ দেখিতে পায় না যে তাহা নহে। দোষকে দোষ বলিয়া মনে করে না। তাহার কারণ সে এত অধিক দেখে যে দোষের চারিদিক দেখিতে পায়, দোষের ইতিহাস পড়িতে পারে। একটা দোষবিশেষকে মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া দেখিলে তাহাকে ততটা কালো দেখায় না। (আমরা যাহাকে ভালবাসি না তাহার দোষটুকুই দেখি, আর কিছু দেখি না। দেখি না যে মনুষ্যপ্রকৃতিতে সে দোষ সম্ভব,

অবস্থাবিশেষে সে দোষ অবশ্যম্ভাবী ও সে দোষ সত্ত্বেও তাহার অন্যান্য এমন গুণ আছে যাহাতে তাহাকে ভালবাসা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে বিরাগে আমরা যতটুকু দেখিতে পাই অনুরাগে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দেখি।) অনুরাগে আমরা দোষ দেখি আবার সেই সঙ্গে তাহা মার্জনা করিবার কারণ দেখিতে পাই।

৪ প্রভাত এবং সায়াহ্নের ভেদ ব্যক্ত হইতেছে—

প্রাতঃকালের আলোকে 'আমি' মিশাইয়া যাই ও সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে জগৎ মিশাইয়া যায়। প্রাতঃকাল চারিদিক উদ্ঘাটন করিতে করিতে আমাদের নিকট হইতে অতিদূরে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যাকাল চারিদিক রুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের অতি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। এককথায়, প্রভাতে আমি জগৎরচনার কর্মকারক ও সন্ধ্যাকালে আমি জগৎরচনাব কর্তৃকারক। প্রভাতে 'আমি' নামক সর্বনাম শব্দটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাকালে সে উত্তম পুরুষ।

৫ বন্ধুত্ব এবং প্রেমের ভেদ—

মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়া যায়, তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৬ বিনয় সম্বন্ধে—

যাহার বিনয়বাক্য বলিবার প্রয়োজন পড়ে না—সেই বিনয়ী। তবে কিনা বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে ব্যাকরণ পড়িতে হয়, অভিধান মুখস্থ করিতে হয়, বিনয় যাহাদের পক্ষে বিদেশী, তাহাদিগকে বিনয়ের অভিধান মুখস্থ করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার মুখস্থ বিনয় সংসারের একজামিন পাশ করিতেই কাজে লাগে, পরীক্ষাশালার বাহিরে কোন কাজে লাগে না।

(খাঁটি বিনয়)

গ্রন্থের স্থানে স্থানে বেশ এক একটি মস্করামির কথাও আছে। সেইরূপ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল :

ইংরাজ শাসন বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন দেখ দেখি ইংরাজের কি অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া তাহার সভ্যতা, ভারতবর্ষের বিষয় পাইয়া সে ধনী, অথচ সেই ভারতবর্ষের প্রতি তাহার কি অন্যায় ব্যবহার! আমার বক্তব্য এই যে তাহারা তো ঠিক উত্তরাধিকারীর মতো কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের মুখাগ্নি করিতেছে, ভারতবর্ষের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আরও কি চাও! ভূত ভারতবর্ষ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপদ্রব করিতেছিল, তখন বড়ো

বড়ো কামান গোলায় পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে। তাহা ছাড়া শাস্ত্রে বলে নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করিয়া লোকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। চিত্রগুপ্তের ছোট আদালত হইতে এ ঋণের জন্য ইংরাজের নামে বোধ করি কোনকালে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে না। যে দেশে যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ পাইয়াছে Jane cow (John Bull এর স্ত্রীলিঙ্গ) সেইখানেই নিজের সন্তান-গুলিকে চরাইয়া ও পরের সন্তানগুলিকে গুঁতাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব উত্তরাধিকারীর ও পূর্বপুরুষের কর্তব্যসাধনে তাহাদের কোনো প্রকার শৈথিল্য লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নালিশ কি লইয়া?

১৫শ খণ্ড	১৯শে আশ্বিন	১২৯০	পৃঃ ৪০৯
২৬শ সংখ্যা	৫ই অক্টোবর	১৮৮৩	

প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্যকাব্য)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে অবস্থিতিপূর্বক মানব সুখী হইতে পারে না. প্রকৃতি দমনের পিচ্ছিল পথে মানুষ চিরকাল স্থিরপদে থাকিতে শক্ত হয় না; পদে পদে তাহার পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকে। সে পথে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহার কষ্ট। প্রকৃতিব সঙ্গে লড়াই, লড়াইয়ের অবস্থাই কষ্ট। লড়াই না থামিলে সে কষ্টের আর অবসান নাই। কিন্তু এ লড়াই আর থামে না, ইন্দ্রিয়বিহীন না হইলে এ লড়াই থামিবার সম্ভাবনা নাই। স্নেহ মমতা দয়া ধর্ম না ছাড়িতে পারিলে—ইন্দ্রিয়কে পরাজয় না করিতে পারিলে প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। জয়ী হইতে না পারিলে আবার উহাদের আয়ত্ত হইয়া পড়িতে হয়। বিচ্ছিন্ন হইবার বহু চেষ্টা করিলেও খানিক দূর যাইয়া আবার উহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে হয়—আবার জালে আসিয়া জড়াইয়া পড়িতে হয়। যেমন কুমীরের সহিত বাদ করিয়া জলে থাকা যায় না, তেমনি প্রকৃতির সহিত বাদ করিয়া পৃথিবীতে থাকা অসম্ভব। এই ভাব এই চিত্র অতিরঞ্জনের আশ্রয় ব্যতিরেকে এই কাব্যে অঙ্কিত করা হইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী এই কাব্যের নায়ক। প্রথমতঃ—বৈরাগ্যাবলম্বনের কৃতকার্যতা অনুভব করিয়া সে দম্ভী হয়, কিন্তু পরে সংসারের মোহমন্ত্রে পুনরায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শাদা কথায় এই শাদা ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ সুকবি, তাঁহার কবিতা লিখিবার প্রণালীতে একটু পৃথক ধরণ—একটু নবীনত্ব আছে বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। যে ভাবই ব্যক্ত করুন, তাঁহার কবিতাগুলি মিঠা লাগে। অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা না থাকিলেও ভাবের উদ্দীপনা ও ভাষার প্রসাদগুণে তাঁহার কবিতার সৌন্দর্যাধান হয়। এই গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে এরূপ ভাব আমরা ব্যক্ত করিতেছি না। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াও তদীয় পদ্য রচনার প্রতি এই ভাব আমাদের হৃদয়ারূঢ় হইয়া আছে।

১২শ সংখ্যা ২১শে আষাঢ় ১২৯১ সন
৪ঠা জুলাই, ১০৮৪